জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প

ড. নিতাই বসু

সম্পাদিত

সঙ্ঘমিত্রাকে

ভূমিকা

রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনো গল্প-উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করে না। তাঁর গল্পে কোনো নির্দিষ্ট সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় না। সময়হীনতাই তাঁর গল্পের চরিত্রলক্ষণ।

তাঁর গল্পে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষ আছে এবং সমাজের নিম্নকোটির মানুষই চিরকাল জ্যোতিরিন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে আলোড়িত করেছে। বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে সেই মানুষগুলো অবিরত বিব্রত হয়েও তারা সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হয় না। কী এক অধিকতর জটিল জিজ্ঞাসায় তারা নিয়ত নিয়োজিত রাখে নিজেদের জীবনকে এবং অবশ্যই তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে।

প্রকৃতি জ্যোতিরিন্দ্রের লেখায় একটা আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত বাতাবরণ রচনা করে। রৌদ্র, জ্যোৎস্না, বৃষ্টি, অন্ধকার, আকাশ, সমুদ্র, গাছ, ফুল ও পাখি তাঁর লেখায় একটি বিশেষ পরিপার্শ্ব রচনা করে। কিন্তু তাঁর চরিত্রেরা সচেতনভাবে প্রায়শই ওই পরিপার্শ্বের প্রতি উদাসীন থাকলেও অবচেতনে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি তার যাবতীয় আলোছায়ার আলপনা আঁকে। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করব, ইন্দ্রিয়সচেতন শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র কীভাবে বর্ণ, গন্ধ ও শব্দের ত্রিমুখী ব্যবহার করেছেন অথচ আপাত-দৃষ্টিতে তার চরিত্রগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে বিস্ময়মগ্ন না হয়ে তৎকালে ভিন্নতর কোনো আবেশে বা প্রতীক্ষায় লীন হয়ে থেকেছে।

এই লীন হয়ে থাকার মুখ্য উপাদান দেহগত বাসনা। বয়সের তারতম্য, অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য, তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নরনারীর ইন্দ্রিয়জ কামনার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নয়। চরিত্রগুলো যেন ফ্রয়েডীয় যৌনবাদের এক-একটি ভিন্নতর উদাহরণ। সমস্ত সমস্যা ও সংকটের গভীরে, যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার মূলে এবং স্বপ্ন ও রোমান্টিকতার শিকড়ে যেন উৎসস্বরূপে ক্রিয়াশীল থাকে অধিকল্প যৌনবাসনা যার হাতে মানুষ ক্রীড়নক মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রের এই চেতনা তাঁর লেখক-সত্তাকে এতটা প্রভাবিত করেছে যে এই বোধের বিকল্প তাঁকে কখনো কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনি। তাই, তাঁর চরিত্রেরা বিপরীতমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত নয়, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, দু'টি পরস্পরবিরোধী

আদর্শে বা বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে না। তাদের সংঘাত একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার উদ্দেশে, তাদের লড়াই ঈপ্সিত কামনা-পূরণে ন্যায়-নীতি-বিবর্জিত দৌড়ে বিজয়ী হবার জন্যে।

আলোচ্য গ্রন্থে যে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে, সেগুলো ঠিক ছোটগল্পের পর্যায়ে পড়ে না। বিদেশী সাহিত্যে নভেলেট বা নভেলা এবং বাংলা সাহিত্যে বড়ো গল্প আখ্যায় এগুলোকে ভূষিত করা যায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের লেখার গুণে প্রত্যেকটি গল্পের সমাপ্তিতে এমন একটি তাৎক্ষণিক চাঞ্চল্যকর বিস্ময় লুকিয়ে আছে, যা এই পাঁচটি গল্পেই একটি নতুন মাত্রা আরোপ করেছে, ছোটগল্পের রস-অভিধায় আমরা যাকে বলি চমৎকারিত্ব। একটি চমক সৃষ্টিতেই গোটা গল্পের নির্যাস বেরিয়ে এসেছে, কাহিনীর শেষতম পর্বেই সমগ্র গল্পটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

উপরিলিখিত মন্তব্যগুলোর ভিত্তিতে এইবার গল্পগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। 'কালো বউদি' গল্পে কালো বউদি নেপথ্যেই পড়ে থাকে। সে যে জলধর নামক এক বিশেষত্বহীন অপদার্থ লোকের 'আটটি ছাওয়ালে'র মা, এইটুকুই তার পরিচয়। হিমি ও নিমিই মূলত এই গল্পের দুই নায়িকা যারা তাদের একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দারিদ্র্যদীর্ণ সংসারে থাকে। বয়সোচিত সাধ-আহ্লাদ পূরণের কোনো সম্ভাবনা তাদের নেই, পিতৃহারা দুই যুবতী এক দায়সারা অভিভাবকের অভিভাবকত্বে বস্তির একটা ঘরে থাকে। তাদের কিছু না থাকলেও দুজনেরই পুরুষদেহের প্রতি কামনা-বিধুরতা আছে, যে-তাড়নায় একদা হিমি প্রতিবেশী শশীকে দেহদান করেছিল। হিমির এই আচরণ নিমির চোখে নিন্দনীয় নয়, পরন্তু হিমি তার অপেক্ষাকৃত যৌবনোদ্ধত শরীর নিয়ে নিমির বুকে ঈর্ষা জাগায়।

শশীর পরে শশীরই ঘরে ভাড়াটে হয়ে আসে শিবানন্দ যে 'আধপাগলা মানুষটা' নিমির চোখে ধরেছিল তার ছ' ফুট উচ্চতার জন্য, 'পুষ্ট পায়ের গোছা, ঊরুভর্তি কালো কালো লোম'-এর জন্য। তার প্রতি হিমির আকর্ষণ। নিমির মনে তাই ঘৃণা না জন্মিয়ে ঈর্ষার বীজ বোনে। ও সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে কখন হিমি শশীর মতো শিবানন্দকেও দখল করে নেয়। এই দুই প্রতিযোগিনীকে জ্যোতিরিন্দ্র এমনভাবে যৌনকাতরতায় ভুগিয়েছেন যে তারা বারবার শিবানন্দর নামটাও ভুলে গেছে অথচ ওদের চোখে শিবানন্দের সর্বাঙ্গ নিছক পৌরুষে প্রদীপ্ত। ওকে দেখার সময় হিমি-নিমির চোখের পলক পড়ে না, দম যেন বন্ধ হয়ে যায়, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেও বিরক্তিকর লাগে। 'ডাগড়া জোয়ান চেহারা মানুষটার। বেশ লম্বা চওড়া। চোখ দুটো বড় বড়। এই পুরু হাতের কবজি। আর

বোধ করি চুলটাও দেখবার মতন। ঝাঁকড়া বাবরি', 'উরুর লোমগুলি কেমন কালো কুচকুচে। তেমনি বুকের লোম,' 'এত চুল উরুর মাংসে। কিন্তু চুল থাকলেও চাকা চাকা মাংস কম কি। একেবারে ঠাসা। চর্বিটর্বি বেশি নেই। দারুণ পিটনো শরীর।' ইত্যাদি অসংখ্য উল্লেখ পাঠককে বুঝিয়ে দেয় হিমি-নিমির কাছে শিবানন্দের মূল আকর্ষণ কোথায়। এই আকর্ষণের টানে দুই বোনের মধ্যে সারাক্ষণ চলে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

শিবানন্দের চোখে পড়ার, তার মন ভোলানোর, তার সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের। ওরা দু'জনেই দু'জনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে শেষ পর্যন্ত রাতদিন গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর লেখার জাদুকরী মায়ায় পাঠককেও নিঃশ্বাস ফেলতে দেন না, তার আগ্রহ চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার গল্পের মধ্যে তেতাল্লিশটি পৃষ্ঠা পর্যন্ত টান-টান হয়ে থাকে—শেষ পর্যন্ত কে দখল করবে শিবানন্দকে? যৌবনোদ্ধতা হিমি না লীলারঙ্গিনী নিমি? কিন্তু শেষতম পৃষ্ঠায় অপেক্ষা করছিল এক চূড়ান্ত বিস্ময় যার ধাক্কায় হিমির চোখে এক নিমেষের মধ্যে পরমকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপ্রবর শিবানন্দ হয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া বেহিসেবী মানুষটা। হিমিও নয়, নিমিও নয়, কাহিনীর নায়িকা এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায় কালো বউদি, 'ভুসভুসে কুমড়োর মতো' জলধরদার 'চিচিঙের মতো ঢ্যাঙা' বউ ছাড়া সমগ্র গল্পে যার আর কোনো পরিচয়ই ছিল না। অনেক গ্রীষ্ম-বর্ষার দিন-রাত্রির প্রতীক্ষার সীমানা পেরিয়ে হিমি-নিমি শিবানন্দের এই শোচনীয় পতনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই বাড়িওয়ালাকে বলে শিবানন্দ-কালো বউদির বেলেল্লাপনা বন্ধ করার জন্য ওদের তৎপর হতেই হয়।

'আপন ভাই' গল্পটির জটিলতাও 'কালো বউদি' গল্পের দুই বোনের মতো দুই ভাইকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। আপন ভাই হলেও নীলু কিন্তু তার দাদা হিমুর মতো নয়। চেহারায় স্বাস্থ্যে রঙে সপ্রতিভতায় তৎপরতায় ও চাতুর্যে হিমু নীলুর চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়। রূঢ়তায় নিষ্ঠুরতায় এবং চালবাজিতেও সে নীলুর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। মায়ের হার চুরি করে হিমু পালিয়ে গিয়েছিল বম্বে এবং সেখানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুদক্ষ একজন আলোকচিত্রী হয়ে প্রচুর টাকার মালিক হয়ে সে দেশে ফিরে এসেছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী একজন দুঃসাহসী যোদ্ধার সম্মান পেল সে স্নেহময়ী মায়ের কাছে, পুত্রগর্বে গর্বিত পিতার কাছে। পাশাপাশি নীলু যেন তার অপদার্থতার জন্য আরও হীন হয়ে যায়, ধিক্কার ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে সে দিন কাটাতে থাকে। হিমু তার অর্থ দিয়ে সচ্ছলতা দিয়ে কীর্তিকাহিনীর রঙমশাল জ্বালিয়ে এবং সর্বোপরি তার নারীসংসর্গের

সচিত্র কাহিনী শুনিয়ে নীলুর বুকে আগুন জ্বালায়। দুই বিপরীত মেরুর দুই ভাই এইবার প্রকৃত অর্থেই আপন হয়ে ওঠে। ওদের বাবা-মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞ দুই ভাই অসম্মানজনক উক্তি করতে থাকে, একজন ভোগসর্বস্ব জীবনের কাহিনী বলতে ও অন্যজন শুনতে তৎপর হয়। 'কালো বউদি' গল্পের শিবানন্দ শুধু স্বাস্থ্য দেখিয়েই দুই যুবতীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল আর হিমুর স্বাস্থ্য ছাড়াও স্ফূর্তিতে উল্লাসে উন্মাদনায় জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য আছে দেদার টাকা। অতএব জ্যোতিরিন্দ্র ওর সান্নিধ্যে এনেছেন বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন নারী। নীলু দাদার এই বীর্যবত্তায় উৎসাহিত হয়ে তার প্রেমিকার কাছে যায়। এমনই আশ্চর্য, প্রেমিকার অনুপস্থিতিতে তার দিদি নীলুর কাছে সুলভা হলে ওর রক্তে বোনা হয়ে যায় এক নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার বীজ। সেই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অধর-নিভাননীর অপদার্থ সন্তান যে একটা দোকান বা পোলট্রিও চালাতে পারে নি, যার চোখে হিমু যেন এক রূপকথার জগতের নায়ক, যে শুধু ব্যর্থতা ও বিপন্নতা নিয়েই চিরকাল অধর চক্রবর্তীর ঘরে চালের ফুটো টিন দেখবে, নিভাননীর শূন্য গলা দেখবে আর ছুটে-ছুটে ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের পাশে মেহেদীর ঝোপের কাছে গিয়ে উমি বা শুমির শরীর সংস্পর্শ পাবার লোভে অপেক্ষা করবে সেই নীলু হঠাৎ এক লহমায়, হিমুর অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসাধুতার সঙ্গে সাধুতার নয়, অসৎ-এর সঙ্গে সৎ-এর নয়, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মায়ের হার চুরির সঙ্গে ভাইয়ের টাকা চুরির, হিমুর নোংরা মানসিকতার সঙ্গে নীলুর কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী।

সামগ্রিক নারকীয়তার প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি উদাসীন হয়েই পড়ে থাকে। 'আপন ভাই' গল্পটির প্রথম অনুচ্ছেদেই সোনার আশ্বিন মাসের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন, গল্পটির শেষতম বাক্যে বাতাসে ভোরের গন্ধের উপস্থিতি। গোটা গল্পটির মধ্যে আলপনা এঁকেছে শ্রাবণের মেঘভারাচ্ছন্ন আকাশ, গাছের ডালে বসে-থাকা নাম-না-জানা পাখি, ফণিমনসা ও বিছাপাতার ঝাড়, সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, টিক্‌টিকির আওয়াজ, পাখির ডানার ঝাপটা : কিন্তু এইসব প্রাকৃতিক আয়োজন হিমু বা নীলুর মনে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বাবা মা সংসার ও সমাজের প্রতি হিমু যেমন বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা স্বীকার করে না, তার 'আপন ভাই' নালুও স্বার্থসর্বস্ব ভোগবাদে দাদার সগোত্র—শিক্ষক পিতার শিক্ষা তাদের চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলেনি।

'ম্যাজিক' গল্পটির কাঠামো কিন্তু আগের গল্প দুটির মত ঋজু নয়। দুই জোড়া দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক রচনা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র ওদের পরস্পর-

বিরোধী চরিত্র হিসেবে যখনই রূপায়িত করতে শুরু করেছেন তখনই যেন কাহিনীর অনেকটাই বলা হয়ে যায়। ভুলো অবিনাশ আর তার হিসেবী বউ সুদীপার সঙ্গে পরিচয় হল ও ক্রমশ হৃদ্যতা গড়ে উঠল মৃদুলা ও তার স্বামীর। মৃদুলার স্বভাব অবিনাশের মতো আর সুদীপার মতো প্রতিটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলে মৃদুলার স্বামী ভোলা সেন। এই মানসিক পরস্পরবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে টানা পোড়েন। নেপথ্যে অবারিত আকাশের সুনীল নীলিমা এবং নিঃসীম সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালা এদের মনে যেন বাঞ্ছিত আবেগ সৃষ্টি করতে পারে না কারণ প্রকৃতির সঙ্গে নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্ট পুরুষেরা নারীতেই নিমজ্জিত থাকে। নারীও তখন কারো স্ত্রী বা প্রেমিকা থাকে না, সে তার দেহের পসরা নিয়ে পুরুষের চোখে আদ্যন্ত নারী হয়েই তাকে সম্মোহিত বা উত্তেজিত করে। তাই, সমুদ্র-স্নানের অছিলায় মৃদুলা যখন 'আবলুসের মতন কালো বিরাট দেহ দৈত্যের চেহারার নুলিয়াটার কাঁধ আঁকড়ে ধরে তার পাটার মতন প্রশস্ত পেশল বুকের সঙ্গে লেপটে গিয়ে খিল খিল করে হাসে' তখন ভোলা সেনের চোখের সামনে সুনীল সাগর হারিয়ে গিয়ে সেখানে জেগে ওঠে একটা ভয়ঙ্কর ঘৃণার আগ্নেয়গিরি। কিন্তু ওই আগ্নেয়গিরি কোনো অগ্ন্যুৎপাত ঘটায় না কারণ ঈর্ষা বা ঘৃণা একজন পুরুষকে একটা নারীর বিরুদ্ধে যতই উত্তপ্ত করুক, সে-উত্তাপ ক্ষণস্থায়ী হবেই যদি সেই সংশ্লিষ্ট নারী সুতনুকা হয় এবং মায়ামোহ বিস্তার করে পুরুষের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে প্রলেপ দিতে যায়। এই সংকলনের বৃহত্তম গল্প 'ম্যাজিক'-এর জাদুবিদ্যার খেলা গল্পটির মোট একশো ভাগের মাত্র সতেরো ভাগের জন্য উপসংহারে অপেক্ষা করছিল। গল্পটির কেন্দ্র-বিন্দুতে জ্যোতিরিন্দ্র ম্যাজিকওয়ালাকে সংস্থাপিত করেননি, সে শুধু তার কৌশল দিয়ে সমুদ্র সৈকতে মৃদুলার কাছাকাছি এনে দেয় অবিনাশকে এবং অবিনাশ-জায়া সুদীপাকে চরম নৈরাশ্যে স্বামীর কাছ থেকে সরে যেতে বাধ্য করে।

'ফুল ফোটার দিন' গল্পটিও প্রেমের অপবিত্রতা তথা চরিত্রহীনতার গল্প। নয়নাকে শোভনের উদ্দাম ভালোবাসার গাঢ় ও গূঢ় প্রমাণ হিসেবে যখন তার চিঠি আসে নয়নার হাতে, তখন ও জানতে পারল, ওর প্রিয়তম শোভন ওদের বন্ধু সোমেনকে সহ্য করতে পারছে না। নয়নার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ঈর্ষাকুটিলতায় ভুগছে। কিন্তু যখন ভিন্নতর এক তরুণীকে সাময়িকভাবে পেয়েও শোভন তার দেহের জালে বাঁধা পড়ে, তখন প্রত্যক্ষদর্শিনী নয়না শোভনের মুখোমুখি হয়। নয়না শোভনকে ভালোবাসত, তাই সে শোভনের পতন সহ্য করতে পারল না, বিশ্বাসহীনতার প্রমত্ত প্রবাহে আত্মঘাতী হল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নয়নাকেও

প্রেমিকের প্রতি তন্নিষ্ঠ থাকতে দেননি। বিশ্বাসহন্তার বুকে ছুরি না বসিয়ে নিজেই আত্মঘাতী হয় সে কিন্তু তার প্রতি ভিন্ন পুরুষের কামনাকুটিলতায় শান্ত থেকেছে।

গল্পটির নামকরণে প্রাকৃতিক সম্বন্ধ, গল্পটির মূল নায়িকা একটি সুন্দরী তরুণী যার বয়স সতেরো কিংবা উনিশ। বস্তুতপক্ষে দেহমনের ব্যাকুল বাসনার কাছে বয়সটা তত বিচার্য নয়। কিন্তু গল্পের প্রতিপাদ্য যেহেতু প্রেমহীনতা, তাই লেখক গল্পটির মধ্যে শোভন-কেয়া, শোভন-নয়না ও সোমেন-নয়নার পরিপ্রেক্ষিতে বারবার এক জোড়া সন্তরণশীল হাঁসের উপস্থাপনা করেছেন। ওদের ডানার ঝাপটানি দিয়ে জল ঝাড়ার অনুষঙ্গে যুবক-যুবতীর প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝানো সম্ভবত লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতিকে এই কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি তার যাবতীয় সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে চরিত্রগুলোর ওপর কোনো সম্মোহন বিস্তার করতে পারে না, তারা তাদের শরীর নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

স্টাইনবেকের গল্পের সাথে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখার অনেক সাধর্ম্য আছে। হেনরি জেমস, জেমস জয়েস, গ্রাহাম গ্রীণ, কারেল চাপেক, ফ্রানৎস কাফকা বা এইচ. ই. বেটস-এর মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলোর সঙ্গে তাঁর লেখার সাদৃশ্য থাকলেও তা মূলত আপেক্ষিক। জ্যোতিরিন্দ্র ওদের মতো দেহনিরপেক্ষ মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখতে আগ্রহবোধ করেননি। কিন্তু স্টাইনবেকের গল্পের যে ভিত্তিভূমি অর্থাৎ নর-নারীর পারস্পরিক দেহগত সম্বন্ধ, সেই ভিত্তিভূমিতে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পও দাঁড়িয়ে আছে। তাই, ওঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি সুন্দরী, সুদেহিনী, লীলাচঞ্চলা। 'কালো বউদি'র নিমির 'গায়ের চামড়া চমৎকার পালিশ,' হিমির নগ্নশরীরের সৌন্দর্য দেখে স্বয়ং নিমিই যেন তাকে চিনতে পারে না, 'আপন ভাই'য়ের উর্মি-শুমি 'পরীর মতন দুই মেয়ে', 'ম্যাজিক' গল্পের সুদীপা ও মৃদুলার সৌন্দর্য সমুদ্রস্নানের সময় আরো অনাবৃত হয়ে ভিন্নতর পুরুষের অবচেতন মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল, গল্পের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সেই আকাঙ্ক্ষা সঙ্গতিপূর্ণ এবং 'ফুল ফোটার দিন'-এর নয়নার 'এমন সাংঘাতিক জলন্ত রূপ' যা শোভন ও সোমেনকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি শিবানন্দ হিমি ও নিমির প্রতি উদাসীন থেকেছে, পরীর মত মেয়ে উর্মি উপযাচিকা হয়ে অপদার্থ নীলুকে সম্মোহিত করতে চেয়েছে, মৃদুলা অবিনাশের চেয়ে একটি মুলিয়ার বুকে নিজেকে সমর্পণ করে অধিকতম তৃপ্তি পেয়েছে, নয়নার জলন্ত রূপে শোভন সাময়িকভাবে উত্তপ্ত হলেও তাকে বিশ্বাসহন্তা করে দেয় কেয়া যার 'ভোমরার কালো চিকচিকে পাখার মতন চোখের পল্লব,' 'শাঁখের রঙের ফুটফুটে সুন্দর শরীর'।

সুতরাং 'রূপকথার রাজা' গল্পের রূপাও আকর্ষণীয়া যুবতী, সৌন্দর্যে ও প্রসাধনে, লাবণ্যে ও পারিপাট্যে সে পুরুষের নয়নমনোহরা। মোহনলালের চোখে তার শরীরটাই লোভনীয় ছিল কিন্তু সুচতুর মোহনলাল নিছক চোখের প্রশংসা করে ওর মনে সম্ভ্রম জাগায়। রূপার দারিদ্র্য ও তার মা মীনাক্ষীর আকুল আগ্রহ শুধু ওকে নয়, ঠেলে দিল মীনাক্ষীকেও মোহনলালের কাছে এবং এখানেও প্রকৃতি পুষ্পের সৌরভ, জল, জ্যোৎস্না, তারাখচিত আকাশ, বনমর্মর ও নির্জনতা নিয়ে যখন মোহনলালের কাছে রূপাকে পৌঁছে দেয় তখন সুতনুকা রূপাকে মোহনলাল পায় না, তার লাম্পট্য রূপার চোখ খুলে দেয়। রূপার মুক্তি গল্পটির চমক সৃষ্টি করেনি, মীনাক্ষীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করে। একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে মীনাক্ষী যে এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্র যেন প্রথমাবধি মীনাক্ষীকে সমান্তরালভাবে সেজন্যই গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য গল্পের তুলনায় এই গল্পটি অধিকতর বেগসম্পন্ন তার কারণ মোহনলালের কামনাবিধুর আকর্ষণ এবং মীনাক্ষীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাড়া দেওয়া—এই দুটি মানসিকতাই ছিল একই লক্ষ্যাভিমুখী।

আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত পাঁচটি গল্পেই জ্যোতিরিন্দ্রের রচনারীতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত।

নিতাই বসু

সূচীপত্র

কালো বউদি

ভয়ানক কৌতূহল দু বোনের।

হবেই।

তাগড়া জোয়ান চেহারা মানুষটার। বেশ লম্বা চওড়া। চোখ দুটো বড় বড়। এই পুরু হাতের কবজি।

আর বোধ করি চুলটাও দেখবার মতন। ঝাঁকড়া বাবরি।

কি নাম রে লোকটার? হিমি চোখ বড় করে নিমির দিকে তাকায়।

নিমি বেড়ার ফুটোর গায়ে চোখটা লাগিয়ে রেখেছে। কথা বলছে না। যেন কথা বলার সময় নেই তার।

কে জানে, নিমি বুঝি শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। হিমি ভাবে। তারপর তখনি সে আর একটা ফুটোর গায়ে চোখটা চেপে ধরে।

প্যাণ্ট ছেড়ে লোকটা লুঙ্গি পরছে।

উরুর লোমগুলি কেমন কালো কুচকুচে। তেমনি বুকের লোম।

লোকটার গায়ে চুল বেশি। হিমি চাপা গলায় বলে।

নিমি কথা বলে না। কেবল একটা ঢোক গেলে।

লোকটা লুঙ্গি পরে প্যাণ্টটা দড়ির গায়ে ঝুলিয়ে রাখল। দড়ির ওপাশ থেকে লাল্‌চে হলুদে ডোরাকাটা গামছাটা টেনে নিয়ে কেরাসিন কাঠের বাক্সটার ওপর চেপে বসল। যেন ওটাই তার চেয়ার, না কি ঘটেই কি? .

'জিনিসপত্তর ওর যেন তেমন কিছু আনেনি।' হিমি বলল।

নিমি এতক্ষণ পর ফুটো থেকে চোখ তুলল। হিমির দিকে ঘাড় ফেরাল।

'আমি নাম জেনে গেছি।'

'কি করে জানলি?' হিমির ভুরু কপালে উঠল।

এ পাশের ঘরে জলধরদার সঙ্গে তখন কথা বলছিল। জলধরদা নাম জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, আমার নাম 'শিবানন্দ।'

হিমি খুব করে হাসল।

'শিবানন্দ কেমন সাধু সাধু নামটারে।'

'জলধরদাকে বলছিল, ধরমতলার গ্যারেজে কাজ করে। মোটর মেকানিক।'

'হুঁ, কাজ তো একটা করবেই।' হিমি মাথা ঝাঁকাল। 'তা না হলে কুড়ি টাকা ঘর ভাড়া টানবে কেমন করে।'

নিমি চুপ করে রইল।

'আর কি বলল জলধরদাকে?'

'আর কিছু শুনিনি। আমি কলকাতায় ছিলাম।' নিমি আস্তে বলল।

'জলধরদা কোথায় ছিল তখন?' হিমি হুট করে প্রশ্ন করল।

'জলধরদা জলধরদার ঘরে ছিল। বাজার নিয়ে গিয়েছিল। লোকটা জলধরদাকে কাঠ কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করছিল।'

'জলধরদার বৌ কোথায় ছিল?'

'রান্নাঘরে।'

'তুই কি তখন উঠোনে ছিলি?'

'উঠোনে থাকব আমি কেন কলতলায় ছিলাম।'

'চান করছিলি?' হিমির ভুরু আবার কপালে উঠল।

'তোর মগজে যদি কিছু থাকত—' নিমি রাগের চোখে বড় বোনের দিকে তাকাল। 'একটা বেটাছেলে জলধরদার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। জলধরদাও তার ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে, আর তখন কিনা আমি খোলা কলতলায় বসে চান করি!'

হিমি চুপ।

কলতলাটা জলধরের ঠিক ঘরের পাশেই। দরজায় দাঁড়িয়েই দেখা যায়। চৌবাচ্চাটা তবু একটু আড়ালে আছে। কিন্তু কলটা একেবারে উঠোন ঘেঁষে।

'আমি বাসন মাজছিলাম।' নিমি বলল।

'আমি রান্নাঘর থেকে অবিশ্যি শুনছিলাম জলধরদার সঙ্গে কেউ যেন কথা বলছে।' হিমি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বগলের কাছের ঘামাচি চুলকোল।

দারুণ ঘামাচি বেরোয় তার। চৈত্রের গরম বাড়তেই আরম্ভ হয়। এদিক দিয়ে নিমি নিশ্চিন্ত। গায়ের চামড়া চমৎকার পালিশ। হাজার গরমেও গায়ে একটা ফুসকুড়ি বেরোয় না। তাই যেন এই মুহূর্তে হিমি খানিকটা ঈর্ষার চোখে নিমির হাত গলা ও পিঠের কাছটা দেখল।

নিমি আবার ফুটো দিয়ে ওদিকটা দেখছে। হিমিও বেড়ার গায়ে চোখ লাগাল।

লালে হলুদে ডোরাকাটা গামছাটা দলা করে লোকটা উরুর ওপর ঘষছে। এত চুল উরুর মাংসে। কিন্তু চুল থাকলেও চাকা চাকা মাংস কম কি। একেবারে ঠাসা। চর্বিটর্বি বেশি নেই। দারুণ পিটনো শরীর। ভেজা গামছাটা দিয়ে উরু দুটো মুছে বুকটা ঘষছিল এখন। বুক তো না, যেন আস্ত একটা শিল। একটা না দুটো শিল পাশাপাশি বসান। মাঝখানের ফাঁকটা লোমে ভর্তি। উরুর মতন কালো কুচকুচে লোম। ঘন লোমের জন্য বুকটাকে অসম্ভব তেজী পুরুষ মনে হয়।

'মনে হয় কুস্তিটুস্তি করত কোনো সময়।' হিমি মিনমিনে গলায় বলল। 'কেমন পালোয়ান পালোয়ান চেহারা।'

'জিজ্ঞেস করলেই পারিস!' চাপা গলায় নিমি বলল।

এবার নিমি রাগের চোখে ছোট বোনকে দেখল। তারপর জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'কেন আমি জিজ্ঞেস করতে যাব? একটা নতুন মানুষ, পরিচয় নেই, হুট করে আমি কথা বলতে যাই, কেমন না?'

'নতুন আর কি, দুদিন তো হতে চলল, দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে যাবে।' অপ্রস্তুত হতে গিয়েও নিমি নিজেকে সামলে নিল। 'ঠোঁট টিপে হাসল।' এক বাড়ীর ভাড়াটে। এক কলে চান করবে, এক পায়খানায় পায়খানা করবে—'

নিমির কথা শেষ হল না। চাপা গলায় কথা বললেও হিমির গলায় স্বরটা অসম্ভব মোটা শোনাল।

'তোর ইচ্ছে হয় তুই গিয়ে জিজ্ঞেস কর না।'

'আ রে, কথাটা বলতেই রেগে কাই হয়ে গেলি, শশীর সঙ্গে তুই আগে কথা বলেছিলি, মনে আছে ?'

'কবে আমি শশীর সঙ্গে আগে কথা বলেছি ?' আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করল হিমি।

নিমি আস্তে মাথা নেড়ে খুক্ করে হাসল।

'যেদিন এলো, ঠিক সেদিনই সন্ধ্যেবেলা কাঠ কাটতে কাটারিটা চেয়েছিল না তোর কাছে, এর মধ্যে ভুলে গেলি ?'

'বাস রে!' হিমি বড় করে একটা ঢোক গিলল। 'খুব তো মনে আছে তোর দেখছি। চৈত্র মাস এটা, তার আগের চৈত্রে শশী এসেছিল, আর কথাটা আজও মগজ থেকে নড়াতে পারছিস না দেখছি।'

নিমি চুপ। ফুটো দিয়ে পাশের ঘরের জোয়ান লোকটাকে দেখছিল। ভেজা গামছা দিয়ে বুক ডলা শেষ করে লোকটা বিড়ি ধরিয়েছে।

তা কাটারি চেয়েছিল, তখন আর আমি না বলি কেমন করে, ঘর থেকে দা-টা বের করে দিলাম, কথা তো বলিনি, শশীর সঙ্গে প্রথম দিনই কথা বলতে যাব আমি কোন্ দুঃখে। হিমি গজগজ করছিল।

'যাক গে যাক গে, নিমি নিষ্পত্তি চাইছিল। আমার ভুল হয়ে গেছে, হু, তাই—তুই পৈঠায় দাঁড়িয়েছিলি, ঠেলা থেকে মালপত্তর ঘরে তুলে শশী আমাদের পৈঠার কাছে এসে তোর কাছে কাটারিটা চেয়েছিল।'

হিমি মাথা নাড়ল, উঁহু, অচিন মানুষ, হোক না এক বাড়ির ভাড়াটে, শশী যখন মালপত্তর তুলছিল আমি মোটেই পৈঠায় ছিলাম না। ঘরে বসে বাবার পিঠে তারপিন তেল মালিশ করছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে। তুই সেদিন রাঁধছিলি। দাদা অফিস থেকে ফেরার সময় বৌবাজার থেকে কচ্ছপের মাংস এনেছিল। তুই মাংস চাপিয়েছিলি। মেঘলা মেঘলা ছিল দিনটা।'

নিমি কথা বলল না। কেননা হিমি যে মিথ্যের জাহাজ নতুন করে ভাববার কিছু নেই। দিব্যি একটা মনগড়া ছবি তৈরি করে ফেলল মেয়ে। তখন মেঘলা আকাশ ছিল। আবার বলছে দাদা কিনা অফিস ফেরত বৌবাজার থেকে কচ্ছপের মাংস আনল। কোন জন্মে যে দাদা হাতে করে কিছু এনেছিল নিমি মনে করতে পারে না, হুঁ পিঠের ব্যথায় বাবা ভুগছিল। এটা ঠিক। ঐ

ব্যথাটাই বাবাকে নিমতলা পাঠাল। ঐ পর্যন্ত সত্য কথা বলেছে হিমি। তারপিন তেলটা হিমিই মালিশ করে দিত। হিমির মতন নিমি মালিশ করতে পারত না বলে বাবা নিমিকে ডাকত না।

কিন্তু নতুন ভাড়াটে শশী গড়াই যখন ঠেলা থেকে তার ঘরে টানাটানি করে সব মালপত্তর তুলছিল তখন হিমি একেবারে পটের বিবি হয়ে সেজেগুজে, কেন না তিনটার আগেই জলধরদা বলেছিল তার পিসতুতো ভাই নিমিদের পাশের ঘরটা ভাড়া নিয়েছে, একটা ছোট বাচ্চা আর বৌকে নিয়ে শুক্রবার দিন বিকেলেই আসছে শশী, তাই এসেছিল শশীরাই, আর দুপুর থেকে হিমির সেদিন চুল বাঁধবার কী ঘটা, বাক্স থেকে একটা ধোয়া শাড়ি খুলেও পরেছিল, হুঁ যতক্ষণ শশী মালপত্তর তুলল হিমি পৈঠা থেকে নড়ল না। মালপত্তর তোলা শেষ করে শশী যখন হিমির কাছে কাটারিটা চাইল নিমি তো তখন ঘরেই, বাবার পেচ্ছাব পেয়েছিল, বোতল বাবার হাতে তুলে দিয়ে নিমি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। পড়িমরি করে হিমি ঘরে এসে কাটারিটা খুঁজে বের করে নিয়ে গেল—উঁহু, তক্ষুনি শশীর হাতে সেটা তুলে না দিয়ে, শশীর সঙ্গে তার ঘরের দরজায় চলে গেল।

ছবিটা পরিষ্কার মনে আছে নিমির।

পুটপুট করে হিমি দিব্যি শশীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল। এখন বেমালুম কেমন সব অস্বীকার করে যাচ্ছে।

'আমার মনে হয়, লোকটা বিয়ে-থা করে নি।' ফুটো থেকে চোখ তুলে হিমি এদিকে ঘাড় ফেরায়।

নিমি শব্দ করে না। বেড়ার গায়ে চোখ লাগিয়ে দেখছিল একটা কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে শিবানন্দ, তাই তো শিবানন্দই নাম, কেট্‌লি চাপিয়েছে, একটা থলের ভিতর থেকে দুটো হরলিকস্‌-এর শিশি বের করল, একটার মধ্যে চা, আর একটার মধ্যে চিনি।

'বিয়ে থা করলে বৌ সঙ্গে আসত, খুব একটা কম বয়স কি, বাচ্চাটাচ্চা খুব হতে পারত।' হিমি নিজের মনে বলছিল, 'কাজেই কটা বাচ্চাকাচ্চাও আসত এখানে।'

চায়ের জল ফুটছে। শিবানন্দ আবার ভেজা গামছা দিয়ে লোমে ঠাসা উরু দুটোর ঘাম মুছছে। পশ্চিমের ঘর। ওদিকের জানালা দিয়ে বিকেলের এক ফালি লাল রোদ ভিতরে ঢুকে চা ও চিনি ভর্তি হরলিকস্‌-এর শিশি দুটোকে কেমন ঝকমকিয়ে তুলেছে। শশীর তক্তপোশ ছিল। সারা ঘর জুড়ে তক্তপোশ। তা তো হয়েছে। এই টুকুন ঘর। তার ওপর বৌ বাচ্চা নিয়ে শোয়া। বড়

দেখে তক্তপোশটা কিনতে হয়েছিল শশীকে। উঠে যাবার সময় শশী তক্তপোশটা সঙ্গে নিয়ে গেল না? উঁহু, বেচে দিয়ে গেছে। জলধরদাই এ পাড়ার কার কাছে যেন বেচিয়ে দিয়েছিল।

এই লোকটা যার নাম শিবানন্দ, তক্তপোশে শোবে কি, সাধু সাধু ভাব, একটা বাক্স পেঁটরা পর্যন্ত সঙ্গে আনে নি। যেন পরনের কাপড়টা, সম্বল করে চলে এসেছে! তাই তো দেখছিল হিমি নিমি। কাল যখন রিক্সা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়ায় সঙ্গে একটা পুঁটলি ছিল, মাতুর জড়ান একটা বিছানা।

ফুটো দিয়ে নিমি দেখছিল উত্তর দক্ষিণদিকের খালি মেঝের উপর মাতুরটা বিছানো হয়েছে। একটা তেলচিটে বালিশ।

বিছানা বলতে এই। এর অতিরিক্ত একগাছি সুতো পর্যন্ত নেই।

অবশ্য এখন গরমকাল, ঠাণ্ডার সময় হলে কাঁথা কম্বল নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকত। থাকতই যে তার কি কথা আছে। আর থাকবেই যদি সেসব কাঁথাকম্বল ফেলে এসেছে কোথায়। দেখা যাচ্ছে পুরোনো আস্তানা ছেড়ে জলধরদার মতন, শশীর মতন বা হিমি নিমিদের মতন, প্রাণকেষ্ট নন্দীর এই বস্তি বাড়ীতে এসে মানুষটা ঘর ভাড়া নিল। একলা থাক তুকলা থাক এখন এই ঘরে থেকেই যে দিনকতক সংসারযাত্রা পালন করা হবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

হুঁ, লোকে বলে প্রাণকেষ্টর বস্তি। সামনের দিকে এই তিনখানা ঘর নিয়ে এক ফালি উঠোন একটা কল একটা পায়খানা নিয়ে একটা যেন আলাদা ফ্ল্যাটের মতন তৈরি করা হয়েছে। পিছনে আরও ঘর আছে। প্রকাণ্ড বস্তি। প্রাণকেষ্ট নন্দীর অনেক প্রজা। মানে অনেক ভাড়াটে তা সেসব ভাড়াটেদের সঙ্গে এদিকের মানুষগুলির বড় একটা দেখাও হয় না, কথাবার্তাও তেমন নেই।

তাদের আসা-যাওয়ার রাস্তা পিছনে।

রাস্তার ধারে তু তুটো ঝাঁকড়া মাথার প্রকাণ্ড কদম গাছ আছে বলে কেউ কেউ অবশ্য এটাকে কদমতলার বস্তিও বলে।

সেটাই সহজ।

বাইরের মানুষ প্রাণকেষ্টর নাম জানবে কেমন করে!

হিমি নিমিরা কিন্তু এদিকের এই তিন ঘর ভাড়াটের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো তারপর জলধর।

আর এই যে ঘর, আগে এটাতে শশীদারাই থাকত এখন এক বাবরি চুল পালোয়ান এসে ঢুকল, এই ঘরে ভাড়াটে হয়ে, কতবার যে কতজন এলো।

শশীর আগে ছিল সুধন্যরা। তার আগে ছিল যেন বুড়ো পঞ্চানন। তার আগে? হিমি-নিমির ভাল মনে নেই।

সুধন্যরা যে অনেকদিন ছিল হিমি-নিমির পরিষ্কার মনে আছে।

সুধন্যদের সময়ই দু বোন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরে। সুধন্যর ছোট ভাই মান্‌কে হিমি-নিমিদের বয়সের ছিল।

বেশি দুষ্টামী করত বলে সুধন্য কী ভীষণ মারধরই না করত মান্‌কেকে। কদিনই কাঁদতে কাঁদতে ছোঁড়া হিমি-নিমিদের ঘরে ছুটে এসেছে। হিমি নিমির মা কেন জানি মান্‌কেকে দারুণ ভালবাসত।

মনে আছে হিমি-নিমির মার যেদিন কলেরা হয়, এম্বুলেন্স এসে তাঁকে হাসপাতালে তুলে নিয়ে যায়। মান্‌কেও হাসপাতাল গিয়েছিল। প্রায় সারাদিনই হাসপাতালে ছিল সে। বিকেলের দিকে মা মারা যায়; হিমি-নিমির বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে মান্‌কে বাড়ি ফিরছিল।

এখন নাকি মান্‌কেরা উল্টাডাঙ্গার দিকে থাকে। এখন তো মান্‌কে একটু বড়সড় হয়েছে জানা কথা। এখানে থাকতেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। এদ্দিকে চাকরি-টাকরিতে ঢুকেছে কিনা কে জানে। নিশ্চয় আর হাফ্‌প্যাণ্ট পরে না, পায়জামা কি চোঙা প্যাণ্ট পরে। আজকালকার ছেলেদের যা পোশাক।

এখানে থাকতেই সুধন্য বিয়ে করেছিল। একটা ঘরে বাবা-মা ও ভাই বোনদের নিয়ে প্রায় বারো বছর কাটিয়ে গেছে। বিয়ে করেই সুধন্য উল্টাডাঙ্গার দিকে একটা বড় বাড়ি দেখে চলে গেছে। তা না হলে বৌ নিয়ে এখানে মানুষটা শুত কেমন করে।

খুব ফর্সা রঙ সুধন্যর বৌয়ের। বেশ মোটাসোটা। এর মধ্যে বাচ্চা-টাচ্চা নিশ্চয়ই হয়েছে। অবশ্য এই নিয়ে হিমি নিমি খুব একটা মাথা ঘামায় না।

কথায় বলে ভাড়াটে। সামনে থাকতেই আপন। দূরে গেলে—মানে চোখের আড়াল হলেই পর।

বেড়ার ফুটোর ভিতর দিয়ে নিমি দেখছিল কেটলির জল টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু মানুষটা হাঁ করে ওদিকের জানালাটার দিকে চেয়ে আছে। একটা ডুমুরের ডাল জানালার কাছে সরে এসেছে। হলদে রোদ লেগে ডুমুরের কচি পাতা ভয়ানক চকচক করছে।

যেন ওদিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে,—বুরুশের মতন বুক ভর্তি ঘন ঠাসা লোম নিয়ে ছ, শিবানন্দ নাম, মানুষটা ডুমুরের ডালে চড়ুইটাকেই দেখছে। জলের মনে জল ফুটছে। কেটলির ঢাকনাটা ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে নড়ছে।

'শশীর তক্তপোশ পুব পশ্চিম করে পাতা ছিল।' হিমি আস্তে বলল।

'তা না হলে অতবড় তক্তপোশ ধরত কেমন করে।' নিমি উত্তর করল। 'এই জন্যই তো ওদিকের জানালাটা ওরা একদম খুলতে পারত না।'

'হুঁ, এখন তক্তপোশের বালাই নেই, মাটিতে বিছানা পেতেছে, জানালাটা খোলা থাকলে কেমন কটকটে আলো আসে ঘরে।'

'শশী থাকতে ঘরটা এমন অন্ধকার অন্ধকার মনে হত—!' যেন নিমি শশীর এই ঘর অন্ধকার করে রাখার সঙ্গে আর একটা কথা জুড়তে গিয়েও চুপ করে গেল। হিমি গুজগুজ করে হাসছিল।

হিমি এভাবে হাসছে দেখে নিমি চমকে উঠে। তারপর বুঝল শিবানন্দর চা করার ব্যাপার নিয়ে হাসছে। তার মানে ডুমুরের ডাল থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে জোয়ান মানুষটা যখন কেটলিটা নামিয়ে ঢাকনা তুলে চায়ের পাতা ছাড়তে গেছে ;—দেখে জলটল শুকিয়ে কেটলিটা প্রায় ঠনঠন করছে।

রাগ করে কেটলিটা যখন সে উপুড় করে একটা কাপের ওপর ধরল দু এক চামচের বেশি জল পড়ল না।

কাজেই আবার নতুন করে জল দিয়ে কেটলি চাপান হল। কোণের দলা করা ভেজা গামছাটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে জোয়ান মানুষটা উঠে জানালাটার কাছে আবার গেল।

'মনে হয় একটু বোকাবোকা মানুষটা, তোর কি মনে হয়?' হিমি-নিমির দিকে তাকায়।

'আমি কি করে বলব বোকা না চালাক।' নিমি ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর করে। 'কাল এসেছে, এর মধ্যে চালাক বোকা তুই বুঝে গেছিস।'

'না তা বুঝব কেন, বলছি কি দেখলে বোকাবোকা মনে হয়।'

নিমি কথা বলল না। কথা বলল না এবং হাতে আটার হাঁড়ি ছিল, আটা মাখতে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। কাজেই হিমিও আর বেড়ার কাছে দাঁড়াল না। নিমি না থাকলে একলা একলা হিমি আবার এখন ফুটো দিয়ে নতুন ভাড়াটেকে দেখবে তা হয় না। সঙ্কোচ বোধ করছিল হিমি।

এভাবে বেড়ার ফুটো দিয়ে পাশের মানুষ দেখা নিয়ে অতীতে দু বোনের অনেক ঝগড়া-ঝাটি হয়ে গেছে। সেসব হিমির যেমন মনে আছে—নিমিরও খুব মনে আছে।

মা মারা যাবার এক বছর পরেই হিমিদের বাবা মারা যান। একমাত্র দাদা মাথার ওপর। কিন্তু দাদা তো আর এখানে বোনদের দেখাশোনা করতে বসে

থাকতে পারে না। দুর্গাপুরের কারখানায় চাকরি পেয়ে আজ বছরের ওপর সেখানে চলে গেছে।

ভাবনার অবশ্য কিছুই নেই। অনেক দিনের মানুষ তারা এখানে। পাড়ার সবাই জানাশোনা। তার ওপর বাড়িতে এতকালের একটা মানুষ—জলধরদা রয়েছে।

হুঁ, হিমি-নিমির দাদা অমূল্যও জলধরকে মান্য করে চলে। দাদা বলেই ডাকে। কেননা জলধর যখন কদমতলা বস্তির সামনের দিকের এই ঘরটা ভাড়া নেয় তখন অমূল্য বাচ্চা ছেলে ছিল। হিমি-নিমি তো প্রায় তখন দুধের শিশু। পিঠোপিঠি দু বোন—এক বছরের এমাথায় ওমাথায় জন্মেছে।

অমূল্য তাদের চেয়ে বছর চারেকের বড়।

যাই হোক, জলধর তিন ভাই বোনের কাছে একটা অভিভাবকের মতন।

অবশ্য ঘরে তাদের এক খনখনে বুড়ি পিসীও রয়েছে।

কিন্তু পিসীমার ভরসায় কি সতেরো আঠারো বছরের দুটো বোনকে ফেলে রেখে অমূল্য দুর্গাপুরের কারখানায় চাকরি করতে যেত?

গেছে—জলধর দা, জলধরদার স্ত্রী কালো বৌদির ভরসায়।

দারুণ ভালমানুষ এই জলধর। বড়বাজারে একটা মশলার দোকানে খাতা লেখে। পঞ্চাশের ওপর বয়েস হয়েছে। ঠোঁট গোলগাল ফরসা মানুষটা। মাথায় এতবড় টাক।

মাথায় টাক, অথচ জলধরদার হাতে পায়ে বুকে পিঠে চুলের কমতি নেই। অবশ্য সেই চুল অনেকটা তামাটে রঙের। এবং খুবই পাতলা, পাটের আঁশের মতন ফিনফিনে। একটা জোয়ান মরদের বুকে পিঠে যেমন ঘন কালো কুচ্‌কুচে বুরুশের মতন গোছা গোছা চুল থাকে—জলধরের তা থাকবে কেন?

নতুন ভাড়াটে শিবানন্দর গায়ে চুলের বাড়াবাড়ি দেখে দু বোন এখন কথাটা ভাবছে।

তা না হলে পুরুষের গায়ের চুল নিয়ে তারা কোন্‌দিনই বা মাথা ঘামায়।

তাদের দাদা অমূল্যর গায়ে চুল নেই। মাঝখানে পালিশ চামড়া। মাথায় চুল আছে। বাবারও সেইরকম ছিল।

কিন্তু মাথার চুলটা এখানে সমস্যা না, প্রশ্ন না। ছেলেবেলা থেকে হিমি-নিমি জলধরের গা ভর্তি চুল দেখছে, এই নিয়ে একদিন একটু ভাবল না, আজ হঠাৎ সারা শরীরে পশুর মতন এত লোম দিয়ে পাশের আর একটা জোয়ান পুরুষ এসেছে দেখার পর থেকে দুজনের মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে।

উহু জিনিসটাকে তারা ঘেন্নাও করতে পারছে না, আবার খুব যে একটা ভাল চোখে, প্রীতির চোখে দেখবে সেটাও যেন হচ্ছে না।

তবু বুকের লোমটা সহ্য করতে পারত। কিন্তু মাংসের ঠাস বুনোন নিয়ে মুগুরের মতন উরু দুটোর চেহারা দেখে দু বোনের বুকের মধ্যে, বলতে কি, একটা যেন রহস্য মেশানো ভয়ের মতন কিন্তু দানা বাঁধতে শুরু করল।

হুঁ, লালে হলুদে ডোরাকাটা ভেজা গামছাটা দিয়ে লোকটা যখন লুঙ্গিটা তুলে ধরে উরুর ঘাম মুছছিল। আর বেড়ার ফুটোর গায়ে চোখ ঠেকিয়ে প্রায় শ্বাস বন্ধ করে হিমি-নিমি দেখছিল।

এখন আটা মাখতে বসে নিমির চোখের সামনে সেই অদ্ভুত চেহারার উরু দুটো ভাসছিল।

কলতলায় বাসন মাজতে বসে হিমিও সেই রকম একটা ছবি দেখছিল।

যেমন চা খাওয়া সেরে লোকটা দরজার তালায় চাবি দিয়ে হনহন করে বাইরে ছুটে গেছে। লুঙ্গি পরেই বেরিয়েছে। তা থেকে হিমি ধরে নিয়েছে দোকানে টোকানে গেছে।

পাড়ার ভিতরে মুদি দোকান মনোহারী দোকান করতে যাওয়া ছাড়া লোকটা এভাবে এই পোশাকে আর কোথায় যেতে পারে হিমি ভেবে পাচ্ছিল না।

কেবল কি হিমি দেখেছে। রান্নাঘরে বসে কপাটের ফাঁক দিয়ে নিমিও দেখেছে, এমনি কি আর দেখত।

ভীষণ কানপাতলা সে।

শিকল তুলে দরজায় তালা দিচ্ছিল লোকটা, শব্দটা টুক করে নিমির কানে গেছে। তখনই সে বুঝতে পেরেছে কোথাও বেরোচ্ছে মানুষটা। তৎক্ষণাৎ আটার ডেলা ফেলে রেখে নিমি কপাটের ফাঁকে চোখ রেখেছে। লুঙ্গি পরে বেরোচ্ছে শিবানন্দ না কি যেন নাম লোকটার। কাজেই ধারে কাছে কোথাও যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিমি আশ্বস্ত হয়েছে। কেননা শিবানন্দ এখনই আবার ফিরবে।

অবশ্য এই মানুষটার ফেরা নিয়ে কি ঘর থেকে বেরোন নিয়ে চিন্তা করার কিছুই ছিল না, থাকত না, যদি ঠিক এই সময়টায় হিমি না কলতলায় এঁটো বাসন ছড়িয়ে বসত।

কাউকে বোঝান যায় না, মুখ ফুটে নিমি কারো কাছে বলতে পারে না একটা অপরিচিত পুরুষ দেখলে তার বোন তার দিদি—এই হিমি কেমন উছলে ওঠে। চোখমুখ দেখলেই জিনিসটা টের পাওয়া যায়।

কিন্তু টের পাবে কে? দাদা? দাদা দুর্গাপুরে থেকে চাকরি করে। মাসে

দুবার দুটো শনিবারে আসে। রবিবারটা থেকে সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরে যায়।

তাছাড়া পুরুষ মানুষ অমূল্য, কত আর বয়স হয়েছে, একটা মেয়ের মতিগতি চোখ দেখেই টের পাবে, বিশেষ করে নিজের বোনের, একটা কথাই না। তবু যদি দাদা বিয়ে করত। মেয়ে জাতটার আরো একটু পরিচয় থাকত।

আর এই বাড়ীতে টের পাবে কে?

জলধরদা? কথাটা চিন্তা করলেও নিমির হাসি পায়। একমাত্র বাজারের ভুসভুসে কুমড়োর সঙ্গে, জলধর দত্তর তুলনা দেওয়া চলে। মানুষটার মধ্যে রাগ নেই হিংসা নেই আক্রোশ নেই, আস্ফালন নেই, তেমনি কৌতূহল বাড়তি উৎসাহ প্যাঁচানো বুদ্ধি বলতেও কিছু নেই, সব দিক থেকেই শীতল ঠাণ্ডা—হ্যাঁ, তবে সারাক্ষণ একমুখ হাসি আছে, যেন ঐ হাসিটাই বলে দেয় মানুষটা নিতান্তই বুদ্ধির ঢেঁকি ভাল মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কেবল জানে পোস্তার একটা মশলার দোকানে দিনভর মাথা গুঁজে খাতা লিখতে আর জানে বাড়ি ফেরার সময় থলে ভর্তি করে পোস্তার আধপচা আলু দু'ফালি কুমড়ো ও পুঁইশাকের দিনে পুঁইশাক, নটে শাকের দিনে নটে শাক এনে বৌয়ের, হিমি-নিমিরা যাকে ডাকে কালো বৌদি, পায়ের কাছে ফেলতে। ব্যাস্ এই তার জগৎ।

দুনিয়ায় আর কিছু আছে, আরও কিছু চেনা বা বোঝা উচিত জলধরদা হয়তো বিশ্বাসই করে না।

না, বিশ্বাস করে কেবল বৌ আর পোস্তার মশলার দোকান।

তা না হলে কি, এখন হিমি-নিমি বড় হয়েছে, আগে আর এসব বুঝত কেমন করে, জলধরদার সংসারটার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সারাক্ষণ হাসে?

বছর বাদ যাচ্ছে না। ঘর ভর্তি কেবল ট্যাঁ ম্যাঁ, ট্যাঁ ম্যাঁ। এবং যখনই, অর্থাৎ বছরের যে-কোনো সময় কালো বৌদির দিকে তাকান যায়—দেখা যায় লম্বা রোগা ছিপছিপে কালো মানুষটা আঁতুড়ে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে।

কালো বলতে কি আর যেমন তেমন কালো, টিকা হার মানে।

তাহলেও খুব ভাল মানুষ।

এদিক থেকে যেমন দেব, তেমনি হয়েছে দেবী।

জলধরদাকে যদি ভুসভুসে কুমড়োর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়, কালো বৌদিকে তুলনা করতে হয় চিচিংগার সঙ্গে। আকৃতি প্রকৃতি দুদিক থেকেই। চিচিংগার মতোই মানুষটা ঢ্যাঙ্গা, এবং স্বভাবটাও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলের মতন।

না আছে ভিতরে একটু ঝাঁজ, না আছে রাগ হিংসা, না একটু প্যাঁচ।

কালো মাড়ি ছড়িয়ে সারাক্ষণ কেবল হাসছে। হুঁ, যখনই হিমি-নিমির সঙ্গে কি বাড়ির আর কারো সঙ্গে কথা বলুক।

একমাত্র বাচ্চাগুলোকে যখন মারধর করে তখন ছাড়া। একমাত্র তখনই কালো বৌদিকে খিটখিটে তিতিবিরক্ত হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক। একা মানুষ, এক ঘর বাচ্চা সামাল দেওয়া কি মুখের কথা! তা-ও বছরের পর বছর। রাঁধাবাড়া মোছা-ধোওয়া কাচাকাচি। সবই তো একহাতে।

তাই বলা হচ্ছিল, জলধরদার ঐ মোটা মাথা নিয়ে শীতল মেজাজ নিয়ে সিধে চোখ নিয়ে হিমিকে বুঝবার যেমন সাধ্য নেই, তেমনি কালো বৌদিরও না।

অমূল্য পাশের ঘরের এই দুটি বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীকে যতই অভিভাবক-আভভাবিকা ঠাওরে বোনেদের এখানে ফেলে রেখে দুর্গাপুর চাকরি করতে যাক।

হ্যাঁ, তবে কিনা হিমি-নিমিদের বাজারটা, কেনাকাটা হচ্ছে কিনা, চালের ভাঙ্গা টালির ফুটো সারিয়ে দিতে বাড়িওয়ালার লোকটা এল কিনা, কি অসুখে বিসুখে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ আনা—এসব ব্যাপারে জলধরদা হাত-পা বাড়িয়েই রেখেছে, যখন বলবে তখনই মানুষটাকে পাওয়া যাচ্ছে, এবং দুবেলা হিমি-নিমির জন্য কিছু আনতে হবে কিনা দরজায় দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাচ্ছে না।

হয়তো অমূল্য তাই চেয়েছে। ভাবছে এইটুকুনই যথেষ্ট। বোন দুটোর সুখ-সুবিধে দেখছে জলধরদা, আপদে-বিপদে অসুখে-বিসুখে এগিয়ে আসছে। আর তো কিছুর দরকার পড়ে না।

না। দরকার পড়ে না, বোনেদের সম্পর্কে আর কিছু দেখার ভাববার প্রয়োজন আছে অমূল্যর মাথায়ই তা নেই। কেন না তার ধারণা আজও হিমি-নিমি বাচ্চা রয়ে গেছে।

এ দিকে মেঘে মেঘে যে কত বেলা হল তা আর সে বুঝবে কেমন করে।

চাকরি করুক, তা হলেও সে আইবুড়ো ছেলে, হৈ-হল্লা ছেলেমানুষী কি নিজেও ছাড়তে পেরেছে। আর পাঁচটা কারখানার ছেলেকে নিয়ে বেশ করে দুর্গাপুর স্টীল টাউনে খুব ফুর্তিতে আছে। মাসে দুটো শনিবার বোনেদের দেখে যায়, তখন সংসার খরচের কিছু টাকাকড়িও তাদের হাতে দিয়ে যায়। ব্যস্, আর তাকাবার আছে কি?

বলে কিনা হিমির বজ্জাতি, দাদা এখন অনেক দূরে আছে, দাদার চোখে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, জলধর তো বাড়িতেই রয়েছে, তবু না হয় বোঝা গেল এই মানুষটাকেও পোদ্দার দোকানের খাতা লিখতে রোজ বেলা দশটায় ভাত খেয়ে

ছুটতে হয়, ফেরে সেই সন্ধ্যায়, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা যে হিমি-নিমির, বলতে গেলে একরকম গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে আছে সেই কালো বৌদি। জলধরদার স্ত্রী। নিমি দেখেছে, হুঁ, একমাত্র নিমিই লক্ষ্য করছে, হিমির দাঁতের বুদ্ধিও রাখে না জলধরদার স্ত্রী।

বলে কি না শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই যার, চৌদ্দবার আঁতুড়ে ঢুকেও আবার সেখানে ঢুকতে যে মানুষ পা বাড়িয়ে থাকে, এইটুকুন একটি ঘরে আটটা-দশটা বাচ্চা নিয়েও সন্ধ্যের পর হেসে ঢলে সন্তানদের বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শোনাতে যার উৎসাহের কমতি দেখা গেল না, পুঁইশাক খাক আর ছেঁড়া শাড়ি পরুক, হিমি-নিমির সঙ্গে দেখা হলেই চওড়া মাড়ি ছড়িয়ে যে কেবল হাসতে জানে, সে বুঝবে হিমিকে? হিমির ছলাকলা? তবেই হয়েছিল আর কি!

এই যে লুঙ্গি পরে মুখে একটা বিড়ি গুঁজে দরজায় তালা ঝুলিয়ে পাশের ঘরের নতুন ভাড়াটে, যার নাম শিবানন্দ, এইমাত্র বেরিয়ে গেল, আর ঠিক ওপাশটায় কলতলায় থালা গেলাস মাজতে বসে হিমি চট করে একটা কাজ করে ফেলল, এখানে রান্নাঘরের কপাটের আড়ালে থেকে নিমি সব দেখল, আর উঠানের তারে কাপড় ছড়াতে এসে কালো বৌদি পুরো দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুই বুঝল না, কিছুই দেখল না।

সরল মানুষ, দোস দেওয়া যায় না। হিমি যে বাতাসের গলায় দড়ি পরাতে শিখেছে, চোখের সামনে পুকুরচুরি করে সরে যায়, এমন হয়েছে এখন যেন ঘুমের মধ্যে মানুষকে খুন করতেও তার আটকাবে না।

কলতলার পাশ দিয়েই বাইরে যেতে হয়। আবার বাইরের লোককে যদি বাড়ির ভিতর ঢুকতে হয় কলতলা ঘেঁষেই তাকে ঢুকতে হবে।

বিশ্রী ব্যবস্থা। আব্রু বলে কিছু নেই। কিন্তু বাড়িওয়ালা প্রাণকেষ্টকে কথাটা বললে হাসবে এখন। বলবে কত মানুষ আমার এই বস্তিতে থেকে গেছে, এখনো ত্রিশ-চল্লিশ ঘর ভাড়াটে, কেউ তো উঠান নিয়ে কলতলা নিয়ে আব্রুর কথা তোলেনি, হঠাৎ তোমার মাথায় এই চিন্তা ঢুকল কেন মেয়ে?

কাজেই নিমি বুকের মধ্যে একটা জ্বালা নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

হু, হিমির কাণ্ড দেখে।

শশীর সঙ্গে এতসব ব্যাপার করার পর এখন এই শিবানন্দকে দেখে আবার তার মাথা ঘুরে গেল।

নিমি কপাটের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এখনি শিবানন্দ ফিরবে। হিমি আবার কি করে না দেখে নিমি কিছুতেই এখান থেকে সরছে না, পড়ে থাকুক

রুটি গড়া। আটার গুলির ওপর মাছি ভনভন করে উড়ছিল। আড়চোখে দেখেও নিমি চুপ করে থাকল, নড়ল না, তার চোখ কলতলার দিকে।

শিবানন্দ তো এমন জোয়ান পুরুষ। শশী গড়াই ছিল এতটুকুন একটা জীব। যাকে বলে দেড় আঙুলে মানুষ। কাঠির মতন হাত পা। একটুখানি একটা মাথা। তার ওপর ডিসপেপসিয়ায় ভুগে ভুগে রংটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

সেই শশীকে নিয়েই কী বিচ্ছিরী ব্যাপার করতে চলেছিল হিমি। করতে চলেছিল এবং বেশ কিছু করেও ছিল, তা না হলে কি আর শশীর বৌ—

'এই নিমি, ছাখ্, ছাখ্!' হিমি ফিসফিসিয়ে ডাকল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে নিমি ঘরে আলো জ্বালেনি। কেবল বুড়ি পিসীর ছোট খুপরিটায় একটা আলো রেখে এসেছে। আলো না থাকলে বুড়ি ভীষণ চেল্লাচেল্লি করে। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কদিন ঠায় খুব ভয় পাচ্ছে, যেন এখনি বুড়িকে যমে টেনে নিয়ে যাবে। আর আলো থাকলে ততটা অবশ্য চেঁচায় না। কাজেই প্রায় সারারাতই বুড়ির কাছে একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বলে। কেরোসিনের একটা খরচ আছে না? যে জন্য নিমি ইচ্ছে করে তাদের শোবার ঘরটা সন্ধ্যের পর থেকে সারাক্ষণই একরকম অন্ধকার করে রাখে। কেবল বিছানা পাতার সময় হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নেয়। আর খাওয়ার সময়। তারপরেই খাওয়া ও বিছানা পাতা সেরে ফেলে। বেলা থাকতেই রুটিটুটিটা করে নেয়।

বিকেল থেকে তার মনটা ভীষণ খারাপ। হিমি বেড়ার সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের চুলওয়ালা জোয়ান মানুষটাকে দেখছে।

ইচ্ছে করেই নিমি বেড়ার কাছে যায়নি। শুয়ে আছে। একলা হিমিই দেখুক। দেখে যদি সুবিধে করতে পারে করুক। নিমি কিছু বলবে না।

আগের ভাড়াটে শশীর সঙ্গে হিমি, যে এতটা করছিল নিমি কি প্রথমটা টের পেয়েছিল? পায় নি। পরে অবশ্য কিছুই আর ওরা ঢেকে চলতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল রেখে ঢেকে চলার, হুঁ হিমি ও শশী গড়াই, দুজনেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরই আঙুল দিয়ে সব কিছুই দেখিয়ে দিল।

এবারও, হিমি কতটা যেতে পারে নিমি দেখবে। এখন সে কিছু বলবে না। বলতে গেলে ঝগড়া হবে।

হিমির সঙ্গে ঝগড়া করে সে থাকতে পারে না। ঘরের কাজকর্ম নিয়ে সংসারের খরচপত্র নিয়ে. এমন কি বুড়ি পিসির সেবাযত্ন নিয়েও হিমি এমন কাণ্ড

বাধিয়ে তুলবে, নিমিকে তখন একা হাতে সব সারতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। যে জিনিসটাকে নিমি ভীষণ ভয় পায়। তার চেয়ে—

'এই নিমি!' এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিমি আবার বোনকে ডাকল।

'কি হয়েছে!' অন্ধকারে চাপা গলায় নিমি উত্তর করল। 'আমার মাথা ধরেছে।' ফাঁকি দিল সে।

বেড়ার কাছ থেকে সরে এসে হিমি খুক্‌খুক্ করে হাসছিল।

'একবার এসে চুপি দিয়ে গ্যাখ—হাসতে হাসতে তোর পেটে খিল ধরবে।'

'তোর পেটে খিল ধরা—আমার দরকার নেই।' নিমি পাশ ফিরে শুল।

'মনে হয় কি, লোকটার মাথায় গোলমাল আছে বুঝলি নিমি?' হিমি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিমির কানের কাছে মুখটা নিয়ে গেল।

'থাক না গোলমাল, এই নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন!' নিমি এবার ঝটকা দিয়ে উঠল।

হিমি ঢোক গিলল। এক সেকেণ্ড চুপ থেকে পরে একটু কড়া সুরে বলল, 'মনে হয় তুই সেই বিকেল থেকেই যেন আমার ওপর খুব চোটে আছিস্!'

'আমি কারো ওপর চটি না।'

'তুই না করলে কি, হাবভাব দেখে কথার ধরন দেখে বোঝা যায় না।' হিমির গলায় অভিমান ছিল। কাজেই নিমির আর চুপ করে থাকা হল না। শুয়েও থাকল না। উঠে বসল।

'তখন তুই হুট করে এঁটো বাসন নিয়ে কলতলায় গেলি কেন?'

'বা রে, সব এমনি পড়ে থাকত—ধোয়া হত না! রাত্রিরে কি এঁটো বাসনে খাওয়া-দাওয়া হত?' হিমি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল।

'আমার ধোয়ার কথা ছিল।' নিমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল। 'ভাবলাম আটাটা মেখে দিয়ে বাসন নিয়ে আমি কলতলায় যাব। তোর তো আজ রুটি গড়ার কথা ছিল।'

কথাটা সত্য। পালা করে দু বোন রান্না করে। আজ হিমির রাঁধার পালা গেছে। সকালেও সেই রেঁধেছে। কিন্তু বিকেলে নিয়মটা সে ভেঙ্গে দিল। রান্না ফেলে তাড়াতাড়ি বাসন নিয়ে কলতলায় ছুটল।

'তা একদিন না হয় গোলমাল হয়ে গেছে, তার জন্য রাগারাগি করবি?' হিমি ছোট বোনকে বোঝাল। নিমি কথা বলছে না। চুপ করে ওদিকের বেড়াটা দেখছে। টিনের বেড়ায় দুটো তিনটে ফুটো আছে। এই ঘর অন্ধকার। কিন্তু ওপাশে আলো আছে বলে অন্ধকারেও ওপাশের ফুটোগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'হুঁ' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিমি মাথা ঝাঁকাল। 'তুই কেন চটেছিস তা কি আর আমি বুঝি না। খুব বুঝি।'

'কি বুঝেছিস শুনি?' অন্ধকারে নিমি ভুরু কুচকাল।

'কাল তো লোকটা এসেছে—আজ থেকেই আমায় সন্দেহ করতে আরম্ভ করলি?'

'নিশ্চয় করব। ফিসফিসানি সত্ত্বেও নিমির গলার ঝাঁজ বোঝা গেল। হাঁটুর কাপড় তুলে তুই কলতলায় বসেছিলি কেন—দেখছিলি তখন একটা নতুন মানুষ অপরিচিত পুরুষ পাশ দিয়ে যাচ্ছে?'

আশ্চর্য, হিমি একটুও রাগ করল না নিমির কথায়। এখানেই তার বাহাদুরী। একটা কিছু করে হঠাৎ ধরা পড়লে মোটেই সে উত্তেজিত হয় না, মাথা গরম করে না। রাগ অভিমান ক্ষোভ দুঃখ কোনো কিছুই তার কাছে সেই মুহূর্তে প্রশ্রয় পায় না। যেন তখন সে আরও বেশি স্থির সংযত শান্ত হয়ে যেতে পারে। হিমি হাসছিল।

'তোর চোখের ভুল তোর দেখার ভুল নিমি।' নিমির কোলের কাছে এবার একটু বেশি করে ঝুঁকে দাঁড়াল হিমি।

'বরং তখন কাপড়টা পায়ের পাতার ওপর আমি টেনে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, বাসন মাজার ছাই জল সব লাগবে জেনেও, আমার মনে হয় কি তাতেই তোর দেখার ভুল হয়ে গেল, ভাবছিলি দিদি হাঁটুর কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে—?'

নিমি স্তম্ভিত হয়ে থেকে অন্ধকারে হিমির আবছা মুখটা দেখল। কাপড় নামাবার এবং ওঠানোর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত পাঁচ বছরের শিশুও তা বোঝে, কিন্তু এমন চমৎকার একটা ভঙ্গি করে হিমি কথাটা বলল, যেন তার কাপড় তুলে বসাটাই এখন হঠাৎ নামান হয়ে গেল। বেগতিক দেখে হিমি তাই করে। মিথ্যার জাহাজ সে। দিনকে রাত করতে এই মেয়ের জুড়ি নেই। কাজেই নিমিকে তখন চুপ করে থাকতে হয়।

উপায় কি। কেবল এই মানুষটা সম্পর্কে তার বুকের মধ্যে ঘেন্নার ডেলাটাই বড় হতে থাকে।

'তা ছাড়া শোন্' হিমি এবার ঝুপ করে নিমির পাশে দাঁড়াল। খাতির জমাবার জন্য বোনের পিঠে একটা হাত রাখল। 'আমার মনে হয় কি, লোকটার যেন মাথার ঠিক নেই, কেমন একটা বেহুঁশ উড়ু উড়ু ভাব, তুই যদি তখন ভাল করে দেখতিস—আমার দিকে মানে কলতলার দিকে সে তাকালই না, আমি ঘাড় তুলে দেখেছিলাম, চোখ দুটো কেমন প্যাটপ্যাট করছে মানুষটার, হাতের চাবিটা

লুফতে লুফতে নিজের মনে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির দিকে বেড়িয়ে গেল।

কথাটা সত্য। এবং এইজন্যই নিমি খুব একটা হতাশ হয়নি। অর্থাৎ জোয়ান মানুষটা শিবানন্দ না কি যেন নাম, একবারও হিমির দিকে তাকায়নি, দোরে তালা লাগিয়ে চাবিটা লুফতে লুফতে কলতলার পাশ দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। একটু পরে যখন একটা মোমবাতির প্যাকেট নিয়ে ফিরল, হুঁ, দোকানেই গিয়েছিল, নিমির অনুমান সত্য, তখনও কলতলার দিকে ভুল করেও লোকটা ঘাড় ফেরাল না, আর তখন কিনা হিমি ছাই ও জল লাগছে ভান করে দুটো হাঁটুই উদোম করে বসেছিল খুব। আক্কেল হয়েছে, খুব জব্দ হয়েছে মেয়ে আজ! ভেবেছিল সবাই বুঝি শশী গড়াই। বাসন ধুয়ে মুখটা কালো করে হিমি কলতলা থেকে তখন ফিরে এসেছিল।

হুঁ, দেখে নিমি তখন খুশি হয়েছিল।

কিন্তু খুশির ভাবটা বেশি সময় থাকল না।

আবার তক্ষুনি তার মাথায় নানারকম দুশ্চিন্তা জটলা করছিল। কেননা হিমি যদি বেপরোয়া হয়ে বাবরি চুলের শিবানন্দ নামের এই লোকটার পেছনে লাগে, তবে যতই উদাসীন আনমনা থাকুক না, জাতে পুরুষ, তার মন টলতে কতক্ষণ।

বলে কিনা খারাপ মেয়েদের পাল্লায় পড়ে কত মুনিঋষির মাথা গুলিয়ে গেছে!

আর এই মানুষ সারাদিন থাকবে এই বাড়িতে। উঠতে বসতে পাশের ঘরের মানুষদের দেখবেই। কলতলা পায়খানা উঠোন বাড়ীতে ঢোকবার রাস্তা থেকে বেরোবার রাস্তা—সবই একসঙ্গে বস্তিবাড়ীর যেমন হাল। ক্রমাগত পিছন থেকে একটা মেয়ে যদি খোঁচাতে থাকে তবে একটি পুরুষ—

শুয়ে শুয়ে সব সে ভাবছিল।

এখন কিন্তু হিমির কথা শুনে তার একটু হাসিই পেল।

যেহেতু শিবানন্দ তখন একবারও, না বাড়ী থেকে বেরোবার সময় না মোম নিয়ে ঢোকবার সময় হিমির দিকে তাকাল না, তাই হিমি ধরে ফেলেছে লোকটা মোটেই স্বাভাবিক না, পাগলটাগল কিছু হবে।

তাইতো চাইছে নিমি, পাশের ঘরের জোয়ান মানুষটা উন্মাদ হোক, বইয়ের ভাষায় যাকে বলে বিকৃতমস্তিষ্ক। সাদায় আর কালোয় যার জ্ঞান নেই, রাত আর দিনের অর্থ যার কাছে একরকম, কোনটা ঠাণ্ডা কোনটা গরম টের পাবার মত হুঁস যে হারিয়ে ফেলেছে—হুঁ, হাবাগোবা হলেই বা ক্ষতি কি, নিমি মনে মনে

বলল, ঈশ্বর যেন এমন একটা লোককেই পাশের ঘরে ভাড়াটে হিসাবে দিনের পর দিন রাখে।

এই অবস্থায় হিমি মহা সাজগোজ করে থাকুক কি একেবারে নেংটা যাকে বলে দিগম্বরী হয়ে মাই পাছা দেখিয়ে বাবরি চুলের লোকটার সামনে ঘুরুক না। হিমির পীরিতির ভাণ্ড শূন্য থাকবে—তাতে মধু দূরে থাক এক ফোঁটা জলও চুইয়ে পড়বে না।

বুকের জ্বালা নিয়ে হিমি হাত পা কামড়াবে। হুঁ ঈশ্বর যেন তাই করে।

'আয় দেখে যা, শিবানন্দ না সারদানন্দ কি যেন নাম, একলা ঘরে বসে কি করছে!'

বার বার বলছে হিমি। নিমির কৌতূহল হল। আঁচলটা টেনেটুনে ঠিক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বেড়ার সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে দু বোন দুটো ফুটোর ওপর চোখ চেপে ধরল।

মাদুরের বিছানার কাছে একটা মোমবাতি জ্বলছে। হুঁ, আজ যেন রান্না করবে লোকটা। ফুটো দিয়ে বারান্দার কাছের রান্নার জায়গাটা দেখছিল হিমি-নিমি। দু খানা ইট বিছিয়ে উনুন করা হয়েছে। একটা মাটির হাঁড়ি একটা মাটির হাতা যেন জোগাড় করা হয়েছে।

তাই তো, হিমি-নিমির মনে পড়ল মানুষটা যখন কাল ঘরে ঢোকে কোন রকম বাসন কোসন সঙ্গে ছিল না, মাদুরে জড়িয়ে একটা বালিশ ও একটা এলুমিনিয়মের গেলাস শুধু এনেছিল। আর পরনের লুঙ্গি গামছা ও একটা গেঞ্জি। হুঁ, আর একটা জিনিস দু বোনের চোখে পড়েছিল। ছেঁড়া মলাটের একটা বই। পঞ্জিকা টঞ্জিকা হবে হিমি-নিমি ভেবেছিল। এই চুলের বোঝা মাথায়। সঙ্গে মেয়েছেলে বা বাচ্চাকাচ্চা কেউ নেই। একলা। হয়তো সাধু টাধুই হবে দু বোন ধরে রেখেছিল তাই আর কিছু সঙ্গে না থাক একটা পঞ্জিকা কাছে রেখেছে। অমাবস্যা পূর্ণিমা মঘা ত্র্যহস্পর্শ সব মেনেটেনে চলে সম্ভবতঃ।

'এই দু তিন বেলা বাইরে হোটেল-টোটেলে খেয়েছে বুঝলি না?' হিমি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আজ মাটির হাঁড়ি হাতা কিনে এনেছে। ওই ভাখ শালপাতা দেখা যাচ্ছে, পাতায় করে ভাত খাবে।'

'তা হলে তো বোঝা যায় এখানে আসার আগে হোটেলেই খেত—বাসন কোসন যখন কিছুই নেই।' নিমি বলল।

হিমি মাথা নাড়ল।

'তা হবে কেন, থালা বাসন কোথাও হয়তো রেখে এসেছে—হুঁ, যেখানে আগে ছিল সেখানে রেখে আসতে পারে।'

'থালাবাসনের সঙ্গে বৌ-বাচ্চাও রেখে আসেনি তাই বা কে জানে।' নিমি সা বলে পারল না।

হিমি যেন একটু হতাশ হল। লম্বা একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল নিমি।

'তা হলে তো বোঝা যায় রাগটাগ করে কদিনের জন্যে এখানে এসে উঠেছে,' হিমি বিড়বিড় করে উঠল।

'আমার মনে হয় তাই—দুচারদিন থাকবে আবার চলে যাবে।'

হিমি কথা বলল না।

'বা মাথা খারাপও হতে পারে।' নিমি ইচ্ছে করে কথাটা বলল: 'বৌ-বাচ্চা থাকতেই বা কি, পাগলের কোনো বাঁধনই শেষ পর্যন্ত টেকে না। তারপর একদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে দেখিস না, এই শহরে পাগলের কিছু কমতি আছে?'

হিমি মাথা ঝাঁকাল।

'আমার মনে হয় আগে যা আমরা ভেবেছিলাম তাই, সাধুটাধু হবে।'

'তাহলে পূজো আচ্চা করত, সন্ধ্যা আহ্নিক করত, সেসব কিছুইতো দেখছি না।' হিমি গুম হয়েছিল। নিমির খুব ভাল লাগছিল। বোঝা যাচ্ছিল লোকটাকে নিয়ে হিমি অনেক কিছু ভাবছে, মানে শিবানন্দ কি রামানন্দ যাই নাম হোক, যদি সত্যি পাগল হয় হিমির পীরিতের আশায় ছাই, পাগল কি আর মিল ভালবাসা বোঝে? তেমনি সাধু-সন্ন্যেসী হলে তো কথাই নেই, হিমি সেখানে দাঁতটিও ফুটাতে পারবে না। আর যদি আসলে মানুষটার বৌ-ছেলেমেয়ে চেপে থাকে, ছেলেমেয়ে না হয় না-ই থাকল, হুঁ, মনে করা যাক বিয়ে করা একটা বৌ-ই রয়েছে কোথাও—কিন্তু এই পর্যন্ত এসে নিমির চিন্তা থমকে গেল।

থাক না বৌ, বিয়ে করা বৌয়ের সঙ্গে যদি বনিবনা না থাকে—যদি ঝগড়া ঝাঁটি করে বৌকে কোথাও ফেলে রেখে চলে আসে?

নিমি একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল।

তার মগজের মধ্যে আবার একটা দুশ্চিন্তা জট পাকাতে লাগল।

আচ্ছা। একটু পরেই নিমি নিজের মনকে বোঝাল, যদি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না থাকে, মনে করা যাক ঘরের সুবিধে করতে পারছিল না। বৌকে কোনো আত্মীয়ের বাড়ী রেখে এসেছে—এখন আবার ঘর পেয়ে শিগ্‌গীরই ঘরণীকে নিয়ে আসছে—

না, তাতে কিছু সুবিধে নেই, হিমি সব পারে, হিমি যে কী সাংঘাতিক মেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে নিমি ছাড়া এ বাড়ীতে কে আর সেই খোঁজ রাখে।

বলে কিনা জলধরদা আর জলধরদার বৌ হিমিকে পাহারা দেবে।

হিমি ইচ্ছা করলে জলধরদার ঘরের বড় কাঠের সিন্দুকটাও সরিয়ে আনতে পারে, হু, দিন দুপুরে, জলধরদা কালো বৌদি টেরটিও পাবে না।

আর যদি দুটিই সমান বজ্জাত হয়, নিমি এই মানুষটার কথা ভাবছিল, শিবানন্দ না যোগানন্দ যাই নাম থাক—যদি হিমির মতন ভিতরে ভিতরে বদমাইশের শিরোমণি হয় তবে তো কথাই নেই। বিয়ে করেছে, বৌ আছে। তাতে হয়েছে কি।

শশীর বৌ ছিল না? কিন্তু যখন হিমির পাল্লায় পড়ল শশী কি বৌটার কথা একবার ভাবত? তা-ও তো যোগানন্দ না শিবানন্দর মতন তার বৌ কিছু দূরে ছিল না। চোখের বাইরে ছিল না। এখানে এই ঘরেই ছিল। শশী গড়াই যখন এই ঘর ভাড়া করে বৌকে নিয়ে এল, হুঁ, নতুন নতুন কত সাধ সোহাগই না দেখা গিয়েছিল ছোট সংসারটায়। বাচ্চা বৌ ফরসা সুন্দর চেহারা। চাকরিটা মোটামুটি ভাল ছিল শশীর। একটা মোটে সন্তান এসেছে। ভাল নাওয়া খাওয়া, শাড়ি চুড়ি হার দামী সাবান তেল স্নো, একজোড়া ধবধবে বিছানা, চৌকাঠের গোড়ায় নকশা তোলা পুরু পাপোশ, দর্জা-জানালায় রঙিন পর্দা—খুশিতে ডগমগ হয়ে বৌটা সারাদিন খিলখিল করে হাসত আর দারুণ সুগন্ধি জর্দা দিয়ে গাল ভরে পান খেত।

কিন্তু ঐ যে শাকচুন্নি না পেত্নী একদিন শশীর কাঁধে ভর করল। যেন পেত্নীটা একটা ঘা দিয়ে শশী গড়াইয়ের হাসিখুসি ঝলমলে সংসারটাকে ফিরিয়ে দিল। হুঁ, হিমি।

'ঐ ছাখ্, কাঠের কুচি জেলে ভাত চাপিয়েছে।' হিমি হিসহিস করে উঠল। নিমি চুপ করে ফুটোর সঙ্গে চোখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ঐ ছাখ্, কেমন ডুমোডুমো করে ধুন্দুল কাটছে—হ্যাঁরে, শুধু ধুন্দুল দিয়ে কী পাক হবে?' হিমি চাপা গলায় হাসল।

'যা খুশি করুক, তোর এই নিয়ে মাথাব্যথা কেন।' নিমি ঝট্‌কা দিল।

'পাগল না, বুঝলি।' হিমি মাথা ঝাঁকাল। 'খুব হুঁশ আছে, ছাখ ছাখ কেমন চমৎকার করে কাঠি দিয়ে হাঁড়ির ভাত নাড়ছে।

'তুই চুপ কর। মুখটা একটু বন্ধ রাখ দিকিনি।' নিমি আর একটা ধমক লাগাল। 'ওই, আমাদেরই ভুল, আমাদের ধারণাই ঠিক না। সাধু সন্ন্যেসী কিছুই না, মানুষটা কাগজের মোড়ক খুলে শুকনো মাছ বের করল। ঐ ছাখ্, ফালা ফালা করে পেঁয়াজ রসুন কাটছে—সাধু কক্ষনো শুকনো মাছ খায় না।

মুখ ভার করে নিমি বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমার মনে হয় কি—হোটেলে থেকে খেয়েছে এতকাল। দেখছিস না কেমন আনাড়ি হাত। ভাতের ফেনটাও গালতে পারছে না। হাতটা যেন পুড়িয়েছে কেমন রে।'

হিমির ন্যাকামি দেখে নিমির যে কী করতে ইচ্ছে করছিল, যদি মেয়েটার চুল ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি লাগাতে পারত।

'হুঁ, এতকাল মেসে হোটেলে খেয়েছে এখন ঘর ভাড়া করেছে,' রাগটা চেপে নিমি তেতো গলায় বলল, 'এইবেলা বিয়ে করবে, বৌ আসবে ঘরে।'

হিমি বিড়বিড় করে হেসে ফেলল।

'এই বয়সে কি আর কেউ বিয়ে করে? আমি স্পষ্ট দেখেছি, তখন কলতলার পাশ দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল, বাবরির ফাঁকে ফাঁকে একটা দুটো চুল পাকতে আরম্ভ করেছে।

'তা হলে বৌ ঠিকই আছে,' নিমিও দমল না।—'ঘরের সুবিধা ছিল না, এখন ঘর পেয়ে মানুষটাকে শিগ্‌গির কাছে নিয়ে আসবে।'

'বিশ্বাস হয় না।' হিমি ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল। 'বৌ থেকে থাকলে একদম বনিবনা নেই দুজনের। থাকলে গিন্নীকে কালই সঙ্গে নিয়ে আসত। এমন হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধে খেত না হতভাগা।'

'মর, মরে যা তুই।' চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল নিমির, পারল না, কেবল হাতের মুঠো দুটো শক্ত করে রেখে বেড়াটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। হিমি যে সব সময় নিজের দিকে ঝোল টানতে চাইবে—নিজের সুবিধে খুঁজতে পাশের ঘরের পুরুষটাকে বিচার করবে জানা কথা।

আর যদি অসুবিধেয়ও পড়ে, তাতেও কি হিমি চুপ করে থাকবে। এমন রূপসী কচি বৌ ঘরে থেকেও শশী গড়াইকে রাতারাতি কেমন কাত করে ফেলল।

অসহায় আক্রোশ নিয়ে নিমি দুলতে লাগল। ফুটোর গায়ে চোখ ঠেকিয়ে হিমি শিবানন্দ না রামানন্দ নামের মানুষটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

নিমির মনে হল, হিমি বুঝি লোকটাকে জরীপ করছে, কেমন জমি, কতটা দূর থেকে বান ছুঁড়তে হবে—মনে মনে তার হিসাব কষছে।

'খাওয়া হল?'

'হুঁ।'

'আজ যেন অপাক।'

'হুঁ।'

'কি রান্না হল?'

'ভাত, শুকনো মাছ ধুন্দুল দিয়ে।'

'ব্যাস। স্বপাকের মতন খাওয়ার গুণ আর নেই ভাই।'

'হুঁ।'

কান খাড়া করে শুনল দু'বোন। দুজনে খাচ্ছিল ভাত আর আলুর তরকারি। নিমি ভুরু কুঁচকে থেকে জলধরদার গলা শুনছিল, সেই সাধু নতুন ভাড়াটের গলা। হিমি তো চোখ বড় করে অন্ধকার উঠানটার দিকে একটা গাল ঘুরিয়ে রেখে কথাগুলি প্রায় গিলছিল। কিন্তু ঐ দুটো তিনটে কথাই। ওয়াক্ ওয়াক্ করে জলধর মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। তার মানে জলধরদারও রাত্রির আহার শেষ। খেয়ে আঁচাবার সময় নতুন ভাড়াটের সঙ্গে দুটো একটা কথা বলা। বলতে হয় তাই বলা। না বললে কিছু এসে যেত না। পাশাপাশি ঘর। তাই উঠানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ আছে যে। কিন্তু এই থেকে কিছু বোঝা গেল কি?

কিছুই না।

যেমন মোটা মাথার মানুষ জলধর দত্ত। ভুসভুসে কুমড়োর মতন মগজের ভিতরটা।

তা না হলে আরো দুটো কথাটথা বলে এই জলধরদাই পাশের ঘরের নতুন ভাড়াটের আর একটু বেশি পরিচয় টরিচয় নিতে পারত না? খুব পারত।

আগে কোথায় ছিল, হুট করে এখন এখানে ঘর নেওয়া কেন, বাবা বা ভাই কেউ আছে কিনা, [illegible] থাকে তো তারা কোথায় এখন, বিয়ে করেছে কিনা, যদি না করে থাকে তো ভবিষ্যতে করার ইচ্ছে রাখে কিনা, আর যদি করেই থাকে তো পরিবারটিকে কোথায় রেখে এল—কত কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল। একটি নতুন মানুষ অজানা একটি গাছের মতন।

না কি গাছে আর মানুষে কোনরকম তফাত নেই। গাছটাকে পথ চলতে গিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়ার মতন করে লোকটার সঙ্গে ঐ একটা দুটো কথা বলেই জলধর চট্ আচমন সেরে ঘরের দরজায় হুড়কো দিল।

কান খাড়া রেখে দু বোন হুড়কোর শব্দটা শুনল।

'যেমন মোটা মানুষ, আলাপ সালাপও তেমনি।' নিমি গজগজ [illegible] মনে বলল, 'খাওয়া হল,' যেন এর বেশি [illegible] চেহারাটাকে বিকৃত করে ফেলল সে।

'মোটর মেকানিক,' হিমি বলল, 'ধরমতলার একটা গ্যারাজে চাকরি করে, কাল জলধরদা জেনে নিয়েছে, শুনলি তো।'

'আহা, কত গুণ্ডাই তো মোটর মেকানিক ইলেকট্রিক মিস্ত্রী কারখানায় চাকরি করে, বাস চালায়, কাগজ ফেরি করে এই শহরে—এটাই কি কেবল পরিচয় হল, কত চোর ডাকু গুণ্ডা বদমাইস এমন একটা পরিচয় দিয়ে একটা গেরস্থ বাড়িতে ঢুকে পড়ছে তারপর একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে বেরোচ্ছে রোজই তো শোনা যায় এসব ঘটনা।'

হিমি মুখটা ভার করে রাখল।

নিমি ইচ্ছে করেই চোর-ডাকু-গুণ্ডা-বদমাইস শব্দ কটাই বলল।

কিন্তু ঐ যে বলে, 'চোর না শোনে ধর্মের কথা।' এসব বললেই কি হিমি হাত-পা গুটিয়ে ভয়ে চুপ করে থাকবে। সেই মেয়েই নয়।

দু বোনের খাওয়া শেষ।

হিমি বলল, 'তুই জায়গাটা ধুয়ে মুছে দে, আমি এঁটো বাসন কখানা ধুয়ে আনি।'

'রাত করে তুই কলতলায় যাবি নাকি?' নিমি অবাক! কেননা রাত্রের এঁটো থালা-বাসন সকালে ধোয়া হয়।

'উঁহু,' হিমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। সকালে কলতলায় বেজায় ভিড় থাকে, জলধরদার বৌ এক কাঁড়ি বাসন নিয়ে বসে, এখন নিরিবিলিতে কাজটা সেরে আসাই ভাল। সকালের জন্য ফেলে রাখার কোনো মানেই হয় না।'

একটা অজুহাত দেখাতে, যে করে হোক এটা অছিলা টেনে বার করতে হিমির জুড়ি আছে নাকি। নিমি রীতিমত ক্ষেপে গেল।

'জলধরদার বৌ কিন্তু নতুন আসেনি বাড়িতে, কলতলায় ভিড় আগে যেমন ছিল এখনো তাই আছে। তা হলেও রাত করে কোন্ দিন আমাদের এঁটো বাসন ধোয়া হয় শুনি? সকালে ধোয়ারই নিয়ম।'

'ইস্,' হিমি তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে কেমন একটা শব্দ করল। 'দুখানা থালা ধোয়া নিয়ে তুই হঠাৎ নিয়ম-টিয়মের মধ্যে চলে গেলি।'

'নিশ্চয়ই,' নিমি ঘাড় কাত করল। অন্ধকারে কলতলা-টলতলায় যেতে দাদা বারণ করেছে—যখনই বাড়ি আসে বলে যায়।'

'আহা-রে।', হিমি চোখ [illegible]

এত সব ভাড়াটে নিয়ে এই বাড়িতে কেমন করে চলতে হয় আমরা খুব ভাল জানি—মাসে দুবার একবার ক'ঘণ্টার জন্য বাড়িতে উঁকি দিয়ে দাদা আর আমাদের কতটা শেখাবে তুই-ই বল।'

.নিমির আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। হিমি এঁটো বাসন একত্র করে কলতলায় ছুটল। জায়গাটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে হাত মুখ ধুয়ে নিমি শোবার ঘরে চলে এল। হিমিকে উপদেশ দিয়ে কবে সে ফেরাতে পেরেছে।

ফেরাবার গরজই বা কি!

শশী গড়াইয়ের সঙ্গে হিমি কী না করেছিল। জল চিরকাল ঢালুর দিকে গড়াবেই।

তবে হ্যাঁ, এবার বুঝি হিমি আর তেমন ঢালু জমি পাচ্ছে না। সবাই যে শশী গড়াই হবে তার কি কথা আছে।

বেড়ার ফুটোর গায়ে চোখ রেখে ওদিকটা দেখে নিমি একটু আশ্বস্ত হল। খুশি হল। আলো নিবিয়ে লোকটা শুয়ে পড়েছে।

কলতলায় বাসন মাজতে বসে হিমি খুক খুক করে কাশছিল। ইচ্ছে করে দিদির এই কাশি, আর কেউ না বুঝুক নিমি ভাল বোঝে।

আর একজন বুঝত। শশী।

রাত্রে বাইরে যাবার ছুতো করে কলতলায় কি চৌবাচ্চার পাশে গিয়ে হিমি এভাবে কাশত আর শশী গড়াইও তক্ষুনি ঘুমন্ত বৌকে বিছানায় ফেলে রেখে চুপি চুপি দরজা খুলে বেরিয়ে যেত।

নিমিই কি প্রথমটা বুঝতে পারত?

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। ঠাণ্ডার রাত। দুর্গাপুর থেকে শনিবার বিকেলে বাড়ি এসেছিল। বলে কয়ে দাদাকে বাজারে পাঠান হল। এবং সেদিন যেন অমূল্যর মেজাজটা ভালই ছিল। এই বড় একটা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে ফেরে।

হিমি রান্না করেছিল। ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি।

—হিমিকে অতিরিক্ত খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। হয়তো এত বড় ইলিশ দেখে, নিমি ভেবেছিল। মিথ্যে বলতে নেই, খিচুড়িটা দিদি রেঁধেছিল চমৎকার! খেয়ে দাদা খুশি হয়েছিল।

তিন ভাই-বোনে খেতে বসে অনেক গল্পটল্প করল। কাজেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হল। যেন তখন টিপ টিপ জলটা থেমেছে।

অমূল্য বাড়ি এলে বাবার বড় খাটে মশারী খাটিয়ে তাকে শুতে দেয় বোনেরা। দু বোন মাটিতে বিছানা পেতে শোয়।

হিমি-নিমি শুয়ে শুয়েও গল্প করছিল।

এক সময় টুপ করে নিমি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল খুব বেশিক্ষণ যেন সে ঘুমোয়নি।

মশারীটা দাদাকে দেওয়া হয়েছিল বলে তাদের দুজনকে মশারী ছাড়াই শুতে হয়েছিল। ফলে মশার উপদ্রব। যেন চোখটা লাগতে না লাগতেই মশার কামড় খেয়ে নিমির ঘুমটা ভেঙে গেল।

অন্ধকার ঘর। তা হলেও চোখ মেলেই সে টের পেল হিমি পাশে নেই।

সম্ভবত প্রস্রাব টস্রাব করতে বাইরে গেছে। ভাবল সে। এখনি এসে যাবে।

পাশ ফিরে শুল নিমি। কটাস কটাস করে মশার কামড় চলছিলই। কাজেই কিছুতেই তার দু চোখ আর জোড়া লাগছিল না। এভাবে জেগে শুয়ে থেকে এক সময় তার মনে হল দিদি যেন ফিরতে দেরি করছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় উঠে বসল। ঠিক তখন একটা চাপা কাশির শব্দ তার কানে এল। হিমির গলা।

কাশিটা যেন কেমন লাগছিল। পাছে দাদা জেনে যায়—নিমির এই ভয়টাও ছিল।

আলো টালো জ্বালল না সে। দরজায় হাত লাগিয়ে দেখল, হুড়কোটা খোলা, অথচ কপাট দুটো বেশ ভাল করে ভেজান।

এত ভাল করে কপাট ভেজিয়ে বাইরে যাবার অর্থ কি!

তখনই নিমির মনে সন্দেহ উঁকি দিল। সাবধানে কপাট দুটো ফাঁক করে পা টিপে টিপে সে পৈঠায় এসে দাঁড়াল। অবশ্য দরজটাও সেই সঙ্গে আবার ভাল করে টেনে দিল। কি জানি, দাদার চোখে বাইরের আলো লাগলে না ঘুম ভেঙে যায়।

নিমি চাইছিল না তার দাদা এই সময় জেগে ওঠে। অনেক কারণেই চাইছিল না।

হুঁ, বাইরে আলো ছিল বইকি।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবার সময় নিমি দেখছিল প্যাচপ্যাচে ভেজা অন্ধকার নিয়ে আকাশটা মেঘে মেঘে বোঝাই ছিল।

অবাক কাণ্ড। একটা ঘন্টাও বুঝি ভাল করে পার হয়নি। মশার কামড় খেয়ে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল পুরো একটা ঘণ্টাও সে ঘুমোতে পারে নি—আর ঠিক এই সময়ের মধ্যে কিনা মেঘটেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলো আকাশ মাটি বাড়ি ঘর টলমল করছিল।

গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল নিমির। প্রায় সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার পর মাঝরাত্রে হঠাৎ জ্যোৎস্না উঠলে চারদিকের সব কিছুই কেমন ভূতুড়ে অবাস্তব হেঁয়ালি মনে হয়।

রাইরের এমন একটা ছবি দেখে নিমির ভাল লাগছিল আবার যেন ভয় ভয়ও করছিল। যেন এমন দৃশ্য জীবনে সে কখনও দেখেনি। হয়তো স্বপ্নের মধ্যে দেখে থাকবে। কাজেই সব কিছু তার স্বপ্ন স্বপ্ন ঠেকছিল।

শ্রাবণ মাস। কদম গাছ দুটোর ঝোপে ফুল ফুটেছিল। ঠাণ্ডা বাতাস ভুরভুরে কদমের গন্ধ, তার উপর জ্যোৎস্নার বন্যা। নিমির গা শিরশির করছিল কি সাধে!

পৈঠা থেকে নেমে পা পা করে সে চৌবাচ্চার ওপারে প্রস্রাবখানার দিকে গেল। একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। দুটি ছায়া মূর্তি। উঁহু, তারা টের পাচ্ছে না এ বাড়ির আর একটি মেয়ে জেগে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হিমির কোমর জড়িয়ে শশী চুমু খাচ্ছে। শশী পাগল হয়ে উঠেছে। হিমিরও যেন দিশামিশা নেই। উদোম গা, বেনী খুলে গেছে।

ওফ সেদিনের সেই ছবি কল্পনা করলে নিমির হাত পা আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকে। মুখের ভিতরটা নোনতা স্বাদে ভরে ওঠে। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসে। হুঁ, আজও।

এক সেকেণ্ড পরেই অবশ্য দুটো শরীর আলাদা হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিমিকে কলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হিমি আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ফেলল।

শশীও দেখল তাকে। আর মাথা তুলতে পারছিল না। মাথা গুঁজে শশী নিজের ঘরে চলে গেল।

কিন্তু হিমি?

তাই নিমি ভাবে, লজ্জা ভয় অপমান বলতে তার দিদির কিছু নেই।

ঝপ্ করে সব কিছু সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে।

সেদিন তাই হয়েছিল।

প্রথমেই থমকে গিয়েছিল নিমিকে দেখে, তারপর হুঁ শশী যখন ঘরে ঢুকে পড়েছে, আঁচলটা বুকে টেনে নিয়ে নিমির চোখের দিকে তাকিয়ে হিমি ফিক করে হাসল।

'পেচ্ছাব পেয়েছে বুঝি তোর।' হিমি প্রশ্ন করল। নিমি শব্দ করতে পারছিল না। মুখটা বিশ্রী নোনতা লাগছিল। কেমন শীত শীত করছিল তার।

ঘাড় গুঁজে ঘরের দিকে ফিরে চলল।

হিমি পিছনে আসছিল।

আশ্চর্য, কি করে যেন হিমি বুঝতে পারল না, এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার দাদাকে কিছুতেই বলতে পারবে না নিমি। থাক না সেদিন দাদা বাড়িতে উপস্থিত।

তাই কিন্তু হল। নিমির সাধ্য ছিল না এই নিয়ে দাদার কানে কিছু তোলে। পরদিনও রবিবার সারাদিনই অমূল্য বাড়ীতে থাকল। হিমি দাদার সঙ্গে ঢোক গেলে কথা বলল। নিমি গম্ভীর হয়ে রইল।

নিমির মনে হচ্ছিল, হিমি অপরাধ করল, তাতে হিমির কিছুই হল না, নিমি যেহেতু সেই জিনিস দেখে ফেলেছে, অপরাধটা তারই হল এখানে বেশি।

যে জন্য হাসাটাসা দূরে থাক, ভাল করে দাদার সঙ্গে সে কথাই বলতে পারল না। সোমবার ভোরেব ট্রেনে অমূল্য দুর্গাপুর ফিরে গেল।

অমূল্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিমি নিমিকে খোঁচা দিল।

'হ্যাঁ রে তুই এমন গোমড়া হয়ে আছিস কেন ?'

'কেন আছি তা তুই ভাল জানিস।' অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিমি উত্তর করেছিল।

'আমি বুঝতে পেরেছি।' হিমি ঠোঁট টিপে হাসছিল। 'পরশু রাতের ব্যাপরটা তুই ভুলতে পারছিস না।'

এতবড় নির্লজ্জ বেহায়া তার দিদি !

নিমির কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল।

'অ্যা, এর পরেও তুই আবার হাসছিস !' রীতিমত চেঁচিয়ে উঠেছিল সে।

'এই আস্তে আস্তে !' ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চোখ গোল করে হিমি ছোট বোনকে সাবধান করে দিল। 'ঐ ভাখ, কালো বৌদি উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।'

'থাকুক তাকিয়ে, আমি সবাইকে ডেকে বলে দেব, তুই কেমন নোংরা, একটা কুমারী মেয়ে হয়ে—'

হি-হি-হি। হিমি তক্ষুনি মুখে আঁচল চাপা দিয়েছিল। 'পারবি না, কাউকে তুই মুখ ফুটে এই জিনিস বলতে পারবি না নিমি, জানি, এখন তড়পাচ্ছিস, কিন্তু মুখ খুলতে গেলেই তোর জিভ আটকে যাবে।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে নিমি বড় বোনকে দেখছিল। তার সতেরো হিমির আঠারো।

কিন্তু এই একটা বছরের ব্যবধান কি এত বেশি, যে দিদি তাকে পুতুলের মতন খেলাচ্ছে! নিমির অবাক হওয়া যেন আর শেষ হচ্ছিল না, যার ফলে তার চোখে জল এসে পড়ল।

হিমি মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিমির দুই হাত চেপে ধরে।

'না না, তুই মন খারাপ করিস না নিমি, আমার দোষ, ঠিকই তো আমার অপরাধ হয়েছিল। আর কোনোদিন এমন কাজ করব না।'

'আমার গা ছুঁয়ে তুই প্রতিজ্ঞা করছিস?'

'হুঁ, এই করলাম।' কেননা নিমির হাতদুটো তার মুঠোর মধ্যেই ছিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিমি চোখ মুছে নিল। নিমি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে বুঝতে পেরে হিমি পরে একসময় হেসে হেসে বলেছিল, 'ঐ একটু ভালবাসাবাসি আর কি, তা না হলে যদি তুই মনে করিস আমি ঐ দেড় আঙুলে রোগা ডিগডিগে শশীকে বিয়ে করব! ককৃখনো না।'

'থাক, এই বিচ্ছিরি জিনিস নিয়ে আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না।' নিমি ঘরের কাজে হাত লাগিয়ে দিল।

হিমিও আর কিছু বলেনি।

কিন্তু হিমি কি সেখানেই ব্যাপারটা শেষ করেছিল? প্রতিজ্ঞা? একটা মুখের কথা ছাড়া আর কি। তা না হলে শশীর সংসারের এমন চেহারা হয়েছিল কেন?

তার পরেও, কদিনই গভীর রাত্রে নিমির ঘুম ভেঙ্গে গেছে। টের পেয়েছে হিমি নেই।

কিন্তু আর একদিনও বিছানা ছেড়ে নিমি উঠে বাইরে যেত না। কেমন ঘেন্না লাগত। শুয়ে থেকে শুনত হিমি চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কাশছে। তার মানে শশীকে ডাকছে। ঘুমের মধ্যে বৌকে রেখে শশীও নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু রোজই কি বৌ ঘুমিয়ে থাকত!

শশী গড়াই-এর বৌ একদিন টের পেয়েছিল।

টের না পেলে এত বড় কাজটা মণ্টির মা করল কি করে। শশীর মেয়ের নাম মণ্টি ছিল না!

শশী ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

একটা সাংঘাতিক জোয়ান পুরুষ এসেছে সেই ঘরে। হিমি কলতলায় বসে কাশছে।

কাশুক, নিমি মনে মনে বলল, এই মানুষ শশী না, সংসারে সবাই কিছু শশী হয় না।

শিবানন্দ না কি যেন নাম লোকটার। ভুসভুস করে নাক ডাকছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়ার কাছ থেকে সরে এসে নিমি বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াল।

এক বছরের ছোট হয়েও হিমির তুলনায় নিমির শরীরটা এইটুকুন। এখনও যদি সে ফ্রক পরে থাকে কিছু বলার ছিল না।

কিন্তু নিমির লজ্জা করে।

যেহেতু হিমি কাশছিল, সেদিনের সেই টলটলে জ্যোৎস্নার রাত্রের দৃশ্যটা নিমির চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শশী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর, এই দুটো মাস প্রায় ভুলে থেকেছিল ছবিটা। আজ আবার মনে পড়ল নিমির।

নতুন করে মনে পড়ল।

যে জন্য একটা সাংঘাতিক কৌতূহল নিয়ে সে আরসিটার সামনে দাঁড়াল।

বুকের আঁচলটা সরিয়ে দিল।

চোখের পলক না ফেলে বুক দুটো দেখল কিছুক্ষণ। কোমরটা দেখল।

আরসির মধ্যে উরু দেখা যায় না, কাজেই চোখ নামিয়ে শায়াটা তুলে সরা-সরি উরু দুটো দেখল।

সেদিন চৌবাচ্চার পাশে শশীকে সরিয়ে দিয়ে হিমি যখন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকে দেখছিল, হিমির প্রায় সবটা শরীরই নিমি দেখে ফেলেছিল।

কিন্তু নিমির মনে হয়েছিল, তার দিদি, না যেন ওটা আর কেউ, তার মনে হয়েছিল, কি রোজ যেমন হিমিকে দেখছিল সে সেই হিমির ভিতর থেকে আর একটা হিমি বেরিয়ে এসেছে। নিজের চোখ দুটোকে নিমি বিশ্বাস করতে পারছিল না। এত বড় স্তন হিমির? পূর্নিমার চাঁদের মতন গোলগাল। উরু দুটো এত বিশাল এত মসৃণ এমন নিটোল। ভাদ্রের ভরা নদীর কথা মনে পড়ছিল নিমির। কোমরটা এত সুন্দর? নাভি? জ্যোৎস্নার মধ্যে নাভিটাকে ফুলের বোঁটার মতন দেখাচ্ছিল।

যে জন্য নিমির মাথার ভিতর ঝিমঝিম করছিল। একটু পরেই অবশ্য হিমির দিকে তাকাতে, তার মানে যখন কাপড় চোপড়টা ঠিক করে নিয়ে হিমি আবার রোজকার হিমির চেহারা ধরে ঘেন্না করছিল নিমির। ভীষণ ঘেন্না করছিল।

কিন্তু মুহূর্তের দেখা চাঁদের আলো মাখা বেণী খুলে যাওয়া হিমির খোলামেলা শরীর নিমির মনে একটা ছাপ ফেলে দিল, যে জন্য ঘেন্না বা রাগ থাকা সত্ত্বেও

হিমির সেই মূর্তিটা অনেকদিন সে, বিশেষ করে যখন একলা থাকে, যেমন বাথরুমে কি পায়খানায় বসে মনে করতে চেষ্টা করেছে আর খুঁটিয়ে নিজের হাত পা উরু বুক কোমর নাভি সব দেখেছে।

হুঁ, তার শরীরটা ছোট।

হিমির সবই কেমন বড় বড়।

আজ হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এই জন্যই বলে মানুষের মন, মনের ওপর কারো হাত নেই, দেড় আংগুলে সেই রোগা পটকা শরীর পাশে হিমি:ক যেমন কল্পনা করছিল তেমনি পাশের ঘরের নতুন ভাড়াটে, গা ভরতি যার চুল মাথায় বাবরি, শিবানন্দ না কি যেন নাম তার পাশে নিমি নিজের ঝকঝকে পুতুলের মতন ছোট্ট শরীরটা কল্পনা করল।

খুবই অল্প সময়।

নিজের মনে হাসল একটু।

তারপর আয়নার কাছ থেকে সরে এসে বিছানা পাতায় মন দিল। থালা বাসন ধুয়ে হিমি যখন ঘরে ঢুকল হিমির মুখটা থমথম করছিল।

স্বাভাবিক। নিমি ভাবল। কষ্ট করে রাত করে কলতলায় এঁটো বাসন ধুতে গেল, এতক্ষণ বসে কাশল কিছুই ফল হল না। বিকেলেও তাই হয়েছিল। একবারও কলতলার দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে দোরে তালা দিয়ে মাথা পাগলা মানুষটা গট্‌গট্ করে কিনা বেরিয়ে গেল।

হিমির রাগ হওয়া স্বাভাবিক দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। সংসারে সবাই কেন শশী হবে না।

'পাগল, লোকটা পাগল।' পরদিন সকালে রান্না ঘরের দরজায় ছুটে এসে হিমি, নিমিকে ডাকল। 'আয় দেখবি আয়।' আজ নিমির রান্নার দিন। নিমি চোখ তুলে বোনের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল।

'আমার দরকার নেই, তুই ভাখ্ গে।'

'কাণ্ড দেখলে হাসতে হাসতে তোর পেটে খিল ধরবে।' বলছিল হিমি, কিন্তু হিমির মুখে হাসি ছিল না, মুখটা কালো।

নিমি ভিতরে ভিতরে খুশি। যদি সত্যি শিবানন্দ না রামানন্দ লোকটা পাগল হয় তো হিমির আশা ভরসা একেবারে শেষ হল। কিন্তু কতটা পাগল, লোক দেখান কি সত্যিকার পাগল সেটাই দেখতে হচ্ছে। চিন্তা করে নিমি উনুনের পাশ থেকে উঠে এল।

শোবার ঘরে ঢুকল দুজন।

হিমি একটা ফুটোর গায়ে চোখ রাখল, নিমি আর একটা ফুটোর ওপর বাঁ চোখটা চেপে ধরল।

পাগলামী বটে! চালের বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে বেড়ালটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে শিবানন্দ হাসছে। আর তর্জনী তুলে বেড়ালটাকে শাসাচ্ছে: 'আর আমার দুধে মুখ দিবি। ছাখ, একদিন মুখ দিয়ে কেমন মজাটা হল।'

'বেড়ালের সঙ্গে কথা বলছে।' হিমি ফিসফিসিয়ে উঠল।

'কাদের বেড়াল রে!' সাদায় কালোয় বিড়ালকে যেন নিমি হঠাৎ চিনতে পারছিল না। ফুটো থেকে চোখ তুলে সে বোনের দিকে ঘাড় ফেরাল। নিমি বিরক্ত হল।

'তুই কি চোখ দুটো আকাশে তুলে রাখিস! চব্বিশ ঘণ্টা তো বাড়িতে আছিস—কার বেড়াল চিনিস না।'

একটু ভাবল নিমি। ফুটো দিয়ে চোখ গলিয়ে আবার ওপাশটা দেখল। শিবানন্দ একবার করে দড়িটা একটু ঘুরিয়ে দিতে বেড়ালটা চরকির মতন শূন্যে পাক খাচ্ছে আর ক্রমাগত ম্যাঁও ম্যাঁও করে চেঁচাচ্ছে।

'ইস মরে যাবে, এমন করে ঘোরাচ্ছে।' নিমি ফিসফিসিয়ে উঠল।

'পাগলের আবার মায়াদয়া আছে নাকি!' হিমি বলল।

'বেড়ালটাকে যেন চেনা চেনা ঠেকছে।' নিমি বলল।

'আর একটু ভাল করে ছাখ, পুরোপুরি চিনতে পারবি।' হিমি বলল।

'হুঁ, তাই তো!' নিমি তখনি মাথা ঝাঁকাল। 'এ-বাড়ির বেড়াল, মনে হয় শশীর বেড়ালটা।'

'তোর মাথায় কিছু নেই নিমি'—হিমি নাক সিঁটকানোর মতন চেহারা করল।' কোন্‌দিন শশী এখন থেকে চলে গেছে, বেড়ালটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে, ভুলে গেছিস!'

নিমি বিরক্ত হল।

শশী যখন বাড়ী ছেড়ে চলে যায় আমি কি সারাক্ষণ তাকিয়েছিলাম?'

'আহা, একটা মানুষ চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে একটা জীব চলে গেল—তোর চোখে পড়ল না!'

'এ বাড়ীতে অনেক বেড়াল ঘুর ঘুর করছে।' নিমি না বলে পারল না।

'এটা শশীর বেড়াল হলে কি এতক্ষণ আমি চুপ করে থাকতে পারতাম।'

হিমি মুখ ঘুরিয়ে তখনি আবার ফুটোর ওপর চোখ রাখল।

তাই তো, নিমি চিন্তা করল, শশীর বেড়ালকে এমন শূন্যে ঝুলিয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে দেখলে হিমি সহ্য করত না। এখনি ছুটে গিয়ে লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করত।

ছি ছি! আজও কিনা তার দিদি শশীর নামটা উচ্চারণ করে।

'ঐ ত্যাখ্ এখন আবার ওটাকে চুমু খাচ্ছে।' হিমি বলল।

তাই দেখছিল নিমি।

দড়ির বাঁধন খুলে শিবানন্দ না যোগানন্দ বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে, চুমু খাচ্ছে, বেড়াল খুশি গলায় গরগর আওয়াজ করছে, টিন থেকে বিস্কুটের মতন কি যেন বের করে বেড়ালটাকে খেতে দিল, বাবরি চুলের মানুষটা। পরনে সাদা লুঙ্গি। 'হুঁ', লালে হলুদে ডোরাকাটা গামছা, লোমে ভরতি দুই উরুর মাংস চোখ পাকিয়ে আছে, খালি গা, বুকটা যেন আজ আরও বেশি চওড়া লাগছে।

'কালো বৌদির বেড়াল।' হিমি বলল।

জলধরদার ঘরের বেড়ালটাকে সে কিনা এতক্ষণ চিনতেই পারছিল না।

'হুঁ, তাই।' এখন সে মাথা ঝাঁকাল।

বিস্কুট খাওয়া শেষ। কোল থেকে নামিয়ে দিতেই বেড়ালটা এবার লেজ তুলে জলধরের ঘরের দিকে ছুটল। শিবানন্দ দোরে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসতে লাগল। যেন এইভাবে ওটাকে ছুটে পালাতে দেখে খুব আমোদ পেয়েছে সে। হিমি-নিমি তৎক্ষণাৎ বেড়া থেকে সরে এসে তাদের ঘরের দরজায় দাঁড়াল। একদঙ্গল ছেলেমেয়ে নিয়ে জলধরদা গামছা পরে তাঁর ঘরের পৈঠায় দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে, সকলের পিছনে তালগাছের মতন ঢ্যাঙ্গা একটা শরীর নিয়ে জলধরদার স্ত্রী শাড়ী ছড়িয়ে খুব হাসছে, বাচ্চাগুলি হাসছে, বেড়ালটা ছুটে এসে তাদের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল, গলায় গরগর শব্দ করছিল। বোঝা গেল ওই ঘরের মানুষগুলি তাদের বেড়ালটাকে খুঁজছিল। এবার টের পেয়েছে তাদের আদরের মেনি এতক্ষণ কোথায় ছিল, ছাড়া পেয়েছে দেখে সকলেই খুশি। সকলেই নিশ্চিন্ত।

'শশীর বেড়ালকে এভাবে আটকে রাখলে পাগলটাকে এখনি শিখিয়ে দিত।' হিমি বলল, 'জলধরদা ঠাণ্ডা মানুষ, কিছু করল না।'

'কেমন জোয়ান দেখছিস তো,' নিমি না হেসে পারল না।

'রোগা টিঙটিঙে শরীর নিয়ে শশী মানুষটাকে কিছু বলতেই সাহস পেত না। চুপ করে থাকত।'

'তাছাড়া' নিমির কথা শুনেও শুনল না হিমি, বলল, 'শশীর বেড়ালকে এভাবে

চরকি ঘোরাতে গেলে ঐ বেড়ালই ছাড়ত পাগলকে ? আঁচড়ে কামড়ে রক্ত বের করে ছাড়ত। ইস্! পরে আবার কোলে নিয়ে আদর করা, সেটি আর হোত না। শশীর বেড়াল এত বদমাইসি মোটেই সহ্য করত না।'

নিমি আর কিছু বলল না। নতুন ভাড়াটের ওপর হিমির এত রাগ কেন নিমি কালই বুঝে গেছে।

এখনও তো বোঝা যাচ্ছে না লোকটা বদ্ধ পাগল কি সংসার বৈরাগী সাধু, বিয়ে করেছে না কি বৌ মরে গেছে, না কি আজ পর্যন্ত বৌয়ের মুখই দেখল না হতভাগা, এখনও মানুষটার সবই অন্ধকার। চোর ডাকাত না—তাই বা কে বলবে।

মোটা মাথা জলধরদা তো আর তেমন করে আলাপসালাপ করতে জানে না যে, কায়দা করে পাশের ঘরের নতুন মানুষটার পেট থেকে সব কথা বের করবে।

কেমন বোকার মতন তখন জলধর জলধরের বৌ ও বাচ্চাগুলি হি হি করে হাসছিল।

যেন তাদের সোহাগী মেনিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চরকির মতন পাক খাইয়ে মুখে রক্ত তুলে মেরে না ফেলে মানে মানে ঘর থেকে বিদেয় করেছে দেখে বেজায় খুশি। বোকা আর কাকে বলে ? তা না হলে সন্ধ্যেবেলা কারখানা থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে একথালা তালের বড়া ঐ মানুষের ঘরে এসে পৌছয়!

'দাও দাও!' যেন জলধরই, বলে দিচ্ছিল বৌকে। কালো বৌদি সারা দুপুর ঘেমেটেমে তালের বড়া ভেজেছে। পোস্তার দোকানে খাতালেখা সেরে ঘরে ফিরে জলধর বৌকে বলে কয়ে এতগুলি বড়া বড় মেয়েটাকে দিয়ে শিবানন্দর ঘরে পাঠিয়েছিল।

'বুঝলি না', চোখ পাকিয়ে নিমি বলল, 'নতুন ভাড়াটের সঙ্গে জলধরদা আত্মীয়তা পাকাচ্ছে'।

'হুঁ, জলধরদা তো তাই করে।' হিমি বলল, 'তারপর যখন মাছির ঝাঁক ওঘরে গিয়ে ভনভন করবে হুঁ, এক দঙ্গল বাচ্চা, তখন বিরক্ত হয়ে ঝাঁটা নিয়ে শিবানন্দ সবকটাকে তাড়া করবে। শশী তাই করত।'

শশীর নাম আর মুখ থেকে পড়ছে না হিমির। নামটা শুনে শুনে নিমির কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

'সবাই তো শশী না-ও হতে পারে।' নিমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'হয়তো বাচ্চাগুলোকে আদরটাদরই করবে নতুন মানুষটা।'

'তোর যেমন মাথা।' হিমি ভেংচি কাটল। 'পরলা দিন কালো বৌদির

বেড়ালটাকে দিয়েই তো বুঝলি। একটু দুধে মুখ দিয়েছে কিনা রাগের ঠেলায় চার পা বেঁধে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে কেমন চরকি ঘুরিয়ে ছাড়ল ওটাকে।'

'আহা, তার পরে তো আদর করেছে কালো বৌদির মেনিকে, কত বিস্কুট খাইয়েছে, কোলে নিয়ে চুমু খেয়েছে।'

'পাগল, পাগলকে দিয়ে বিশ্বাস কি।' হিমি ঠোঁট উল্টাল। 'আর একবার যখন ঘরে ঢুকবে হয়তো এমনি আদর করার অছিলা করে বুকে টেনে নিয়ে তারপর এমন আছাড় মারবে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা।'

'এখনো বলা যায় না কেমন মানুষ—আরো দুটো দিন না গেলে বোঝা যাবে না।'

নিমির মাথায়ও কি আর এই জিনিস ঘুরছিল না। কদিন ধরে ঘুরছিল। এত সহজে যে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী না সে, নিমি জানে।

এই জন্যই না বিকেল পড়তে সাবান দিয়ে বেশ করে গা-টা ধুয়ে হিমি ধোয়া শাড়ি পরে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ গায়ে জড়ায়, চমৎকার একটা বেনী তৈরী করে, যত্ন করে স্নো পাউডার মেখে মুখখানা ফুলের মতন টাটকা লোভনীয় করে তোলে।

তারপর সদরের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া দেখে।

নিমিও কিছু হাত পা গুটিয়ে থাকে না।

বিকেল পড়তে সেজেগুজে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনের কদমগাছের পাতা দেখার ভান করে বার বার রাস্তার দিকে তাকায়।

তাই তো, এখনও বোঝা যাচ্ছে না লোকটা বদ্ধ পাগল কি সংসার বিরাগী সাধু, বিয়ে করেছে, না কি বৌ মরে গেছে—না কি আজ পর্যন্ত বৌ কি তা জানলই না। আশ্চর্য কি, কত মানুষ তো বেলা গড়িয়ে বিয়ে করে।

হুঁ, দু বোন অপেক্ষা করে।

শিবানন্দ কখন কাজ থেকে ফিরবে।

আজ সকালে সে একটা তক্তাপোষ কিনে এনেছে। কিছু বাসন কোসন এনেছে। একটা কুঁজো। একটা উনুন। অবশ্য এ থেকে এখনই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তা হলেও লক্ষণটা—যেন কেমন, কেমন।

'হুঁ হুঁ' ভালো করে হাত পা ছড়িয়ে বসুন।' গলা বাড়িয়ে জলধর বলছিল, 'ঘরখানা নিয়েও কদিন এমন ছিলেন যেন ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। দু তিন স্টেশন পরেই নেমে যাবেন।'

শুনে শিবানন্দ হা-হা করে হাসছিল। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না তা কেন হবে, ধারে কাছে কয়লা ঘুঁটে পাওয়া যাবে তো দাদা ?'

'বলে কিনা কয়লা ঘুঁটে, এটা যে গেরস্ত পাড়া গো মশাই', জলধরও হাসছিল। 'বলি ক'মণ কয়লা চাই আপনার, ক'শ ঘুঁটে কিনবেন। চলুন আমি দোকান দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জলধরের সঙ্গে গিয়ে তখনি আধ পাগলা মানুষটা কয়লা ঘুঁটে নিয়ে এল।

তারপর এক ফাঁকে গিয়ে চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতি সবই কিনে আনল।

কখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কখনো বেড়ার ফুটো দিয়ে হিমি নিমি এসব দেখছিল।

'তোর কি মনে হয় ?' নিমির কানের কাছে মুখ এনে হিমি বলছিল।

'ব্যাপার যেন তেমন সুবিধের নয়।' নিমিই কি লোকটার মতিগতি বুঝতে পারছিল, তা হলেও হিমিকে চটাবার জন্য তার চোখে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে হাসল। 'দেখছিস না, জোড়া তক্তপোষ নিয়ে এসেছে।'

ফুটোর গায়ে চোখ রেখে হিমি প্রকাণ্ড তক্তপোষটা দেখল। তরপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিমির মুখের দিকে তাকাল।

'বলছিস তা হলে, বেটার বৌ আছে ? এখন বৌকে নিয়ে আসবে ? তাই এত্তবড় খাট ?'

'তা বলব কেন, বৌ থাকতেই হবে তার কি কথা আছে, ঘর পেয়েছে, জিনিসপত্তর আসছে, নতুন বিছানাপাটি করা হচ্ছে—হয়তো এখন বিয়েটিয়ে করে নতুন বৌ আনবে।'

হিমির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'ঐ ত্যাখ, কেমন সুন্দর একটা ফুলদানী এনেছে।' নিমি আবার বেড়ার গায়ে চোখ রেখে বলল, 'আর মোমবাতি না। হারিকেন-লণ্ঠন কিনে এনেছে। বেশ ভাল করেই ঘরখানা সাজাচ্ছে।'

'তবে আর জলধরদা তখন হাত পা ছড়িয়ে বসবার কথা বলছিল কেন ?' হতাশ গলায় হিমি বলল, 'এ যে একেবারে শুয়ে পড়ার মতন অবস্থা দেখছি।'

'আমার মনে হয় ঘোর সংসারী মানুষ, বুঝলি, তুই বলছিলি পাগল-টাগল। মোটেই পাগল না, দারুণ হুঁস রেখে চলে।'

হিমি শুনল। তখনি নিমির কথার জবাব দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা শক্ত করে রাখল। তারপর বেড়ার কাছ থেকে সরে এল।

'বুঝলি নিমি,' যেন বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তরটা তৈরী করল হিমি,

তারপর নিমির চোখের দিকে তাকিয়ে এমন করে হাসল, নিমির হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল।

হিমিকে তো চেনে সে, হিমির এই হাসিও দু একবার দেখেছে। হাত ঘুরিয়ে হিমি বলছিল, 'হুঁ, ভালই তো, বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে আনছে, বাঁধনটা শক্ত হবে—শক্ত গিঁট খুলতে সুবিধে, নড়বড়ে গিঁটে প্যাঁচ লেগে যায়।'

কথাটা মিথ্যা কি।

নিমি মুখে আঙুল গুঁজে ভাবতে লাগল। শশী নতুন বিয়ে করে এ বাড়ি এসেছিল ? শক্ত বাঁধন ছিল। এক টানে হিমি গিঁট খুলে ফেলল।

সেদিন দুপুর থেকে একটু একটু করে বৃষ্টি পড়ছিল। নিমি বুড়ি পিসির ঘরে বসে পিসির সঙ্গে গল্প করছিল। সত্যি, মানুষটাকে তারা দু বোনে তেমন ভাল করে দেখাশোনা করে না, দুবেলা খাবার দিয়ে চলে যায়, বুড়ি একা একা শুয়ে থাকে—মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে। হিমি তো ভীষণ ঘরের কাজ করে—তারপর সারাদিন সে বৌদির উঠানে বারান্দায়—দরকার বুঝলে সদরের বাইরে কদমতলা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে। নিমি তবু মাঝে মাঝে একবার দুবার পিসিকে উঁকি দিয়ে দেখে যায়।

আজ নিমির মন খুব খারাপ। ঐ যে কথায় আছে বাঘ বলতে বলতে সত্যি একদিন পালে বাঘ পড়েছিল, যে ভয়টা কদিন ধরে করছিল, সেটাই যেন এখন চোখের সামনে দেখছিল সে।

কাজের ফাঁকে সে নিজেই বা কম সেজেগুজে থাকছে কি। উঠানে দাঁড়ায় বারান্দায় দাঁড়ায়। উঁহু, একবারও শিবানন্দ না যোগানন্দ নামের জোয়ান মানুষটা তার দিকে ভুল করেও তাকাচ্ছে না। হিমি টের না পায়, বাবরি নাচিয়ে লোকটা যখন কলতলায় যায় কি দোকান করতে বেরোয়, পিছন থেকে দুবার একবার চাপা গলায় যে নিমি না কেশেছে তা-ও নয়। কিছু ফল হল না।

কোথায় আর বিয়ে করে ঘরে বৌ আনছে। প্রকাণ্ড তক্তপোষের একটা পাশ যত আজেবাজে জিনিষ দিয়ে বোঝাই করছে। ডালের ঠোঙ্গা তেলের টিন, দরকার হলে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, তরকারীর ঝুড়ি অর্থাৎ যখন যা খুশি রাখছে।

আর রান্নাবান্নাই কি নিয়মিত করছে।

অবশ্য ইচ্ছে হলে করে। কালই দেখা গেল শালপাতায় করে বাজার থেকে রুটি তরকারী এনে খাচ্ছে। নয় তো মুড়ি চিবোচ্ছে, শুকনো পাউরুটি ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বা কোনোদিন বাইরে হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরছে। এমন চমৎকার একটা ফুলদানী এনেছিল। কোথায় আর রাখা হল ফুল। তক্তপোষের নীচে ধূলো ময়লায় গড়াগড়ি যাচ্ছে সেটা।

জনালায় ঝুলাবে বলে পর্দা আনা হয়েছিল দোকান থেকে।

যেমন আনা হয়েছিল পড়ে আছে, নাকি হ্যারিকেনের কালিঝুলি মোছা হচ্ছে।

বেড়ার ছিদ্র দিয়ে হিমি লোকটার কাণ্ড কীর্তি দেখে।

'পাগলও নয় সাধুও নয়, আসলে কুড়ের বাদশা, এলোমেলো হয়ে থাকতে ভালবাসে।' নিমি বলছিল সেদিন, 'কেমন নোংরা ছাখ্—একদিনও ঘরে ঝাঁটা লাগায় না।'

'ঘরে ঝাঁট দেবে কি, মাথায় বাবরি, মুখে দাড়ি, গায়ে চুল—জঞ্জাল নিয়ে থাকতে ভালবাসে, এই ওর স্বভাব। এক একটা পুরুষের এক একরকম স্বভাব থাকে।'

'তোর ঘেন্না করে না?' হুট করে নিমি প্রশ্ন করেছিল।

'করত, যদি জাতে পুরুষ না হয়ে মেয়ে হত,' হিমি সোজাসুজি উত্তর করেছিল। 'দেখিস না, নোংরা জামাকাপড় পরে থাকে, দেখতে পেত্নীর মতন, কালো বৌদিকে দেখলে কেমন আমার ভেট্‌কি আসে।'

নিমি মাথা ঝাঁকাল।

অর্থাৎ পুরুষ জাতটা নোংরা হলেও কিছু এসে যায় না। যে জন্য হিমি হাল ছাড়ছিল না। হিমির দেখাদেখি নিমিই কি সাজগোজ বন্ধ রেখেছিল। সেজেগুজে যোগনন্দ না কি শিবানন্দ নামের বিদঘুটে স্বভাবের মানুষটার আসে পাশে ঘোরাঘুরি কম করেছিল কি। কিন্তু সুবিধে করতে পারছিল কোথায়।

হিমির কথাই ঠিক।

জলধরদা তালের বড়া খাইয়ে খাতির জমিয়েছিল নতুন ভাড়াটের সঙ্গে।

তারপর থেকে ভনভন—মাছির ঝাঁক, সকাল নেই বিকেল নেই পাশের ঘরে আনাগোনা করছেই, কালো বৌদির আটটি ছাওয়াল আটবার করে এই ঘরে আসছে আর যাচ্ছে।

'যখন ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করতে আরম্ভ করবে, দেখিস—' হিমি বলছিল, 'শশীর ঘরে এভাবে 'মাছির ঝাঁক চব্বিশ ঘণ্টা আনাগোনা আরম্ভ করেছিল না? শেষটায় একদিন বিরক্ত হয়ে শশী সব কটাকে কেমন তাড়া করত।'

'আমার যেন মনে হয়, এই লোকটা মোটেই শশীর মতন না,' উদাস গলায় নিমি বলেছিল, 'এখন তো জলধরদার ঘরের বেড়ালটাও আসছে। চরকির মতন

বাঁশে ঝুলিয়ে আর ওটাকে ঘোরাচ্ছে না, দিব্যি এটা ওটা খেতে দিচ্ছে, কাল তো দেখলাম, দুধের ভাগ পর্য্যন্ত দিয়ে দিল।'

'আর দুটো দিন সবুর কর না।' হিমি চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'এত সহজে একটা পুরুষকে বোঝা যায় না।'

নিমি তাই দেখছিল। সাজগোজের মাত্রাটা হিমি ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছিল।

কোনদিন যা করত না, এখন আর কেবল স্নো ক্রিম পাউডার না, ঠোঁটে গালেও রং মাখতে শুরু করে দিল হিমি। সবটা পেট দেখা যায় পিঠ দেখা যায় দোকান থেকে এমন দেখে জামা কিনে এনে পরতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ শিবানন্দ শ্রীরামানন্দ নামের মানুষটাকে শশী গড়াই করে না তোলা পর্য্যন্ত হিমি যেন কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্ছিল না।

নিমি এতটা অগ্রসর হতে পারবে কেন।

চুপ করে থেকে দিদির কাণ্ড দেখছিল।

হুঁ, সেদিন দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি। মেঘলা আকাশটার মতন মুখটা কালো করে নিমি পিসির ঘরে বসে পিসির সঙ্গে গল্প করছিল।

হিমির মুখে হাসি ধরছে না। পরের দিন কাজে বেরোবার সময় শিবানন্দ নাকি হিমির দিকে তাকিয়ে একবার হেসেছিল। শুনে নিমির বুকের ভিতর ধক্ করে উঠেছিল। নিমি তখন রান্না নিয়ে ছিল।

হিমির কথাটা খুব বিশ্বাস করতে পারছিল না নিমি।

হয়তো অন্য কোন কারণে শিবানন্দ হেসেছিল। হাসতে গিয়ে হিমির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে থাকবে।

চোখাচোখি হওয়াটা অস্বাভাবিক কি। যেমন লোকটার ঘর থেকে বেরোবার সময়, কি যখন ঘরে ঢুকছে, উঠানের বারান্দায় এমন সব জায়গায় হিমি দাঁড়িয়ে থাকে, ক'দিনে রক্ত খাওয়া বাঘিনীর মতন হয়ে উঠেছে না তার দিদি?

কিন্তু আজ তো নিমি নিজের চোখেই দেখল, কোনোদিন যা করে না মানুষটা, প্রত্যেক দিন দুপুরে তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে ফেলে কাজে বেরিয়ে যায়। আজ কিনা দিব্যি হিমির হাতে চাবিটা দিয়ে গেল।

একটা লাজুক হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে হিমি হাত পেতে চাবিটা নিল। নিমিও তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। নিমির দিকে শিবানন্দ তাকালই না।

'ঘরটা বেজায় নোংরা হয়ে আছে, একটা লোককে আজ বলে দিয়েছি দুপুরে এসে ঝাঁটফাট দিয়ে পরিষ্কার করবে, তুমি এসে ভাই দরজাটা খুলে দিও।'

হিমির সঙ্গে শিবানন্দ রীতিমত কথা বলছিল। হিমির মুখটা তখন রোদ লাগা পদ্মফুলের মতন লাল হয়ে গেছে। ঘাড় কাত করে হাত বাড়িয়ে সে চাবিটা ধরল।

'ঝাঁট দিয়ে লোকটা চলে গেলে আবার ঘরে তালা দিয়ে দিও—সন্ধ্যাবেলা এসে আমি চাবিটা নেব।'

'ঠিক আছে, আপনাকে ভাবতে হবে না।' কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলছিল হিমিও।

দাঁড়িয়ে সব শুনল দেখল নিমি।

তখন আর সে কি করে অবিশ্বাস করে যে আধপাগলা মানুষটা আগের দিন হিমির দিকে তাকিয়ে হাসেনি। অথবা চোখে চোখ পড়ামাত্র হিমিই হয়তো আগে হেসেছিল। নিমি চিন্তা করল। যেমন তার দিদি উঠে পড়ে লেগেছে। এক হাসিতেই শিবানন্দ কাৎ। নিজের ঘরে বসে নিমি তাই ভাবছে। জল যেদিকে গড়াবার ঠিক গড়াচ্ছে।

বিকেল পড়তে গা ধুয়ে সেজেগুজে নিমির আর এখন লাভ কি।

দিদির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা তার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

পিসির ঘরে বসে সে শুনছিল হিমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটাকে দিয়ে নতুন ভাড়াটে ঘরের ভিতরটা সাফ করাচ্ছে। হয়তো নিজের হাতে শিবানন্দের বিছানাটিছানাটাও ঠিক করে দিচ্ছে, কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখছে। শশীর বৌ ছিল। এত সব করতে পারেনি। এখন তো খালি ঘর। বোঝা যায় সব কিছুই হিমির হাতে ছেড়ে দিয়ে শিবানন্দ কাজে গেছে।

হুঁ, পিসির ঘরে বসেই নিমি টের পেল, যেন জলধরদার বাচ্চাগুলি নতুন ভাড়াটের ঘর খোলা দেখে কলকল শব্দ করে ঝাঁক বেঁধে ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিল, হিমি সব কটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, যেন ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ করে কালো বৌদির বেড়ালটাও সেদিকে ধাওয়া করছিল, সঙ্গে সঙ্গে হিমি দূর দূর করে ওটাকে বিদায় করেছে।

তাতো করেছে। নিমি চিন্তা করল। এই ঘর এখন হিমির হাতের মুঠোর মধ্যে।

অন্য কারো সেখানে ঢোকার অধিকার নেই।

বিকেলে হিমির সাজসজ্জার বহর দেখে কে। অহংকারে তার পা যেন মাটিতে পড়ছিল না। একটা দুপুরের মধ্যে চেহারাটাই কেমন বদলে গেছে।

কেবল কি হিমি, কাজ থেকে যখন ফিরে এল বাবরি চুলের মানুষটাকে নিমিতো প্রায় চিনতেই পারছিল না। বিরাট পরিবর্তন।

বাবরিটা ছেঁটে ফেলেছে। সেলুনে বসে দাড়িগোঁফ কামিয়ে মুখটাও পরিষ্কার করে এসেছে। কেবল কি তাই, হাতে এক বোঝা রজনীগন্ধা। উঁহু, কেবল রজনীগন্ধা হাতে কেন, হাতে একটা ট্রানজিসটারও দেখা গেল নতুন।

বোঝা যাচ্ছিল শিবানন্দের মনে বসন্তের হাওয়া বইছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা পোস্তা থেকে ফিরে এসে তকতকে ঝকঝকে ঘর দোর এবং শিবানন্দর চুল ও চেহারা দেখে মোটা মাথার জলধর দত্ত হৈ হৈ করে উঠল: 'এইবার ঠিক হয়েছে, ঘর ভাড়া নিয়ে এখন আর কেবল হাত পা ছড়িয়ে বসা না, ভায়ার দেখছি আরাম করে শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়েছে, বেশ বেশ, শুভ দিনটা যেন শীঘ্রি আসে, আমরা পেটভরে নেমতন্ন খাব।'

শিবানন্দ হা-হা করে হেসেছিল।

'হবে হবে নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য ভাবনা কি।'

'লোকটার মাথায় যদি কিছু থাকত, পচা ভুসভুসে কুমড়ো।' বেড়ার ফুটো থেকে চোখ তুলে হিমি নিমির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাপা গলায় হাসছিল। 'জলধর এখনো আশায় আছে এই মানুষ বিয়ে করবে।'

'বিয়ে করবে না তোকে বলেছে নাকি?' মুখটা ভার নিমির, খোঁচা দেওয়ার মতন করে কথাটা বলল।

হিমির চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

'আমাকে একথা বলবে কেন, লোকটার ধরণ ধারণ হাব ভাব দেখে বলছি।'

'না, তখন তো দেখলাম, তোর হাতে ঘরের চাবি দিয়ে গেল' অন্যদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিমি বলল, 'কথাটথাও বেশ বললি, ভাবলাম কি জানি যদি—'

হিমি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ, সেটাই আসল কথা, তাই তো মুখটা সারাদিন এমন গোমড়া করে রেখেছিস—

'ঐ যে আমার হাতে চাবি দিয়ে গেল—তাতেই হিংসায় ফেটে পড়ছিল তা না হলে একটা অচিন লোক, বিয়ে করবে কি করবে না এমন কথা আমাকে বলবে, হুট্ করে তোর মাথায় এলো।'

নিমি চুপ।

হিমি চুপ থাকল না।

'শশীকে দিয়েও আমাকে কম হিংসে করিসনি তুই। হুঁ, মায়ের পেটের বোন হয়েও।'

'শশীকে দিয়ে হিংসে করতে আমার বয়ে গেছে।' নিমি ছেড়ে কথা কইল না। 'শশীর সঙ্গে তুই কি করছিলি পাড়ার লোকে জানে, শশীর বৌ কেন গলায় দড়ি দিল, শশী কেন ঘর ছেড়ে পালাল এই তল্লাটের কারো জানতে বাকি নেই।'

'বেশ করেছে জেনেছে, আমি কারো জানাজানির তোয়াক্কা রাখি—কেমন না?' সাপের মতন হিস্‌হিস্ করে উঠল হিমি। চুলে ফুল গুজেছে চোখে পুরু করে কাজল লাগিয়েছে, ঠোটে রং গালে রং, নিমির দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিমি তখনি আবার বেড়ার সঙ্গে লেপটে দাঁড়াল। পাশের ঘরে তখন ট্রানজিস্টারে একটা বাজনা বাজছে, যেন নিমি দেখতে পায় এমন করে বাজনার তালে তালে পা ফেলছিল তার দিদি, কোমরটাও একটু একটু করে দোলাচ্ছিল।

'সবাই শশী না মনে রাখিস,' নিমির চোখ দুটো জ্বলছিল, রাগে নাকের ছিদ্র ফুলে উঠছিল, 'অত আঁকু পাঁকু করলে কি হবে—একটা আস্ত পাগল এসে ওঘরে ঠাঁই নিয়েছে, পাগলকে হাতের মুঠোয় আনতে তোর সারাজন্ম কেটে যাবে।'

'সারাজন্ম কাটবে কি কালকেই মুঠোর মধ্যে আনব, তুই তাকিয়ে দেখবি—। হিমি হি হি করে হাসল। 'পাগলকেও বশ করার মন্ত্র আমি শিখে গেছি, বুঝলি?'

নিমি আর একটাও কথা বলল না, দুপ দুপ করে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তখন রাত হয়েছে। দুবোনের খাওয়া দাওয়া শেষ। টিপটিপ বৃষ্টিটা একটু সময় একেবারে বন্ধ ছিল। এবার আবার জোরে আরম্ভ হল। হাওয়াও ছেড়েছিল খুব। শীত শীত করছিল।

'এই নিমি!' হিমি ডাকল। আবার সে বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিমি বিছানা পাতছিল। সেখান থেকে সে মাথা নাড়ল।

'আমার দেখার দরকার নেই, তুই ত্থাখ্—'

'আহা এমন করিস কেনরে—'ছোট বোনকে আদর করতে হিমি এগিয়ে এল। 'না হয় তখন রাগ করে একটা দুটো কথা বলেই ফেলেছি।'

'বলছি তো' নিমি বিছানা পাতা বন্ধ রাখল না, দিদির দিকে চোখ তুলল না।

'আমার দেখে কিছু লাভ নেই, তুই প্রাণভরে ত্থাখ্—তোর যখন আশা আছে—'

'হুঁ, আশা না হাতী—কাণ্ডটা ত্থাখ্ এসে আগে, তখন তুই বলিস।'

নিমির কৌতূহল হল।

'কি হয়েছে?'

হিমি তাকে বেড়ার কাছে নিয়ে এল। ফুটো দিয়ে নিমি চোখ গলিয়ে দিল। আর একটা ফুটো দিয়ে হিমি দেখছিল। এমন চকচকে ঝকঝকে করে ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছিল দুপুরে। এর মধ্যেই উনুনের ছাই, কালি, কাগজের টুকরো, ডিমের খোলা, পেঁয়াজের খোসায় মেঝেটা প্রায় নরক হয়ে উঠেছে, নিজের হাতে বিছানাটা সাফসুফ করে রেখে এসেছিল হিমি, আবার যত আজে বাজে জিনিসে তক্তপোষের ধারটা বোঝাই হয়ে আছে, ঘটা করে রজনীগন্ধার আঁটি কিনে এনেছিল না! ফুলদানীটা কুঁজোর কাছে মাটিতে গড়াচ্ছে, রজনীগন্ধা ওপাশে কয়লার ঝুড়ির পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

'ভয়ানক এলোমেলো ভীষণ নোংরা মানুষটা।' নিমির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হিমি চাপা গলায় বলল।

'তাই তো দেখছি।' নিমি ফুটো থেকে চোখ সরাল না। 'তখন তুই কত সুন্দর করে সব সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে এসেছিলি।'

'বুঝলি, তুই বলছিলি পাগল,' আক্ষেপের গলায় হিমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পাগলকে হাত করতে আমার দুদিন লাগত না, আসলে লোকটা বিশ্রীরকম ছন্নছাড়া বেহিসেবী—এমন মানুষকে বাগ মানান অসুবিধে আছে।'

'বেরসিকও বটে।' নিমি চাপা গলায় হাসল। 'এই না মৌজ করে ট্রানজিস্টারের বাজনা শুনছিল। এখন সেটা দেখছি তক্তপোষের তলায় ঢুকেছে।'

'বেরসিক বলে বেরসিক!' রাগের ঠেলায় হিমি দাঁতে দাঁতে দাঁত ঘষল। 'তা না হলে এমন পরিষ্কার বিছানার ওপর জলধরদার নোংরা বেড়ালটাকে টেনে তুলে আদর করছে, চুমু খাচ্ছে।'

'অথচ তখন তুই কতবার করে ওটাকে ওঘর থেকে তাড়িয়ে দিলি।' নিমি আর হাসল না।

হিমি মাথা ঝাঁকাল।

'ওটাকে তাড়িয়েছি, জলধরদার ভন ভন মাছির ঝাঁককে তাড়িয়েছি ঘর নোংরা করবে বলে—তাড়িয়ে দিয়ে আমার খুব লাভ হল না।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছিস,' নিমি আর বেড়ার ধারে দাঁড়াল না। 'এলোমেলো সৃষ্টিছাড়া বেহিসেবী মানুষ। এমন লোককে হাত করতে তোর বেগ পেতে হবে।'

'তা হলেও আমি সহজে ছাড়ছিনে।' হিমি আস্তে করে পায়ের গোড়ালী

দিয়ে মেঝেতে আঘাত করল। তার বেনীর ফুলটা থরথর করে কাঁপছিল। এত রাত করেও দিদি চুলে ফুল গুঁজে রেখেছে, বিছানাটার কাছে সরে যেতে যেতে নিমি দেখল।

রাত তখন কত? আচমকা নিমির ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকারে হাত দিয়ে দেখল হিমি পাশে নেই। বেড়ার ধার থেকে সরে এসে আলো নিবিয়ে এক-সময় দিদি তার পাশে শুয়ে পড়েছিল, নিমির পরিষ্কার মনে পড়ল। তবে?

নিমির বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠল। তবে তাই হয়েছে, ভাবল সে, শিবানন্দ বা রামানন্দ কি যেন নাম, বিদঘুটে স্বভাবের জোয়ান মানুষটাকে হিমি শেষ পর্যন্ত হাত করতে পেরেছে।

শোয়া ছেড়ে ধড়মড় করে নিমি উঠে বসল। কান পেতে রইল। একটা টিকটিকি চালের কাছে দুবার শব্দ করে উঠল। বৃষ্টিটা যেন থেমে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে নিমি দরজাটা ধরল। হুঁ, যা ভেবেছে, হুড়কোটা খোলা, কাঁপা হাতে নিমি ভেজানো কপাট দুটো ফাঁক করল। সঙ্গে সঙ্গে চৌবাচ্চার ওখান থেকে একটা চাপা, খুব চাপা একটা কাশির শব্দ তার কানে এল।

নিমির পা কাঁপছিল। তাহলেও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অবাক্ হয়ে গেল সে। কোথায় মিশমিশে কালো মেঘলা অন্ধকার রঙ, কোথায় বা এলোপাথাড়ি হাওয়া!

সব এখন চুপচাপ স্থির। চাঁদের আলোয় বাড়িঘর দোর উঠোন, কলতলা চৌবাচ্চার ধারের পাঁচিল নিয়ে বাইরেটা খিল খিল করে হাসছে।

সেদিনের সেই রাত। নিমির মনে পড়ল বাদলার পর দুপুর রাতে অবিকল সেই আয়নার মতন জ্যোৎস্না। হিমির কাছে শশী যেদিন প্রথম ধরা দিয়েছিল। নাকি শশী গড়াই-এর কাছে হিমি ধরা দিয়েছিল?

যাই হোক, সেদিনের মতন আজ আবার সেই কদম ফুলের গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে।

সেদিন নিমির কান্না পায়নি।

আজ কান্না পেল।

সেজেগুজে সে-ও কি উঠোনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত না? জোয়ান মানুষটার মন ভোলাতে চোখ টানতে কম চেষ্টা করল কি সে!

পারল না। কিছুই হল না হিমির কাছে হেরে গেল।

দেড় আঙুলে রোগা পটকা শশীকে দেখে কোনোদিন তার মন ওঠেনি। কিন্তু

শশীর পরে যে এল, ছ ফুট লম্বা, এই পুষ্ট পায়ের গোছা, উরু ভর্তি কালো কালো লোম, শিবানন্দ না যোগানন্দ যেন নাম আধপাগলা মানুষটা নিমির চোখে ধরেছিল।

হিমি ঠিক ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

দু চোখ পুরু ঝাপসা হয়ে গেল নিমির।

উঠোনে নেমে টলতে টলতে কলতলার দিকে এগোল। কিন্তু দু পা এগিয়ে তাকে থামতে হল। একটা ছায়ামূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে। হিমি, তার দিদি, নিমি চিনল।

'কি হল!' আস্তে শুধোল সে।

'চুপ!' কাছে সরে এসে ঠোঁটে আঙুল রাখল হিমি। ওদিকে যাবি না।'

'ওখানে কে? কারা?' চৌবাচ্চার পাঁচিলটার দিকে চোখ রাখল নিমি।

'ওই যে, নোংরা হয়ে থাকতে ভালবাসে, সৃষ্টিছাড়া বেহিসেবী মানুষটা।' হিমি দাঁতে দাঁত ঘষল।

'আর একটা কে? চাপা গলায় কেউ কাশছিল যেন শুনছিলাম?'

'জলধর গিন্নী।' হিমি হাসল না আক্রোশে একটা গরম নিশ্বাস ফেলল।

'কাশি শুনে আমিও তো দোর খুলে পা টিপে বেরিয়ে এলাম, এসে ওখানে উঁকি দিয়ে দেখি পেত্নীর মতন ঢ্যাঙা শরীরটাকে উলঙ্গ করে জড়িয়ে ধরেছে পাগলটা।'

'আমার মনে হয়, ফিসফিসিয়ে নিমি বলল, 'ওই বেড়ালটাকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে খাতির জমিয়েছিল কালো বৌদি।'

'এসব বদমাইশি চলবে না এ বাড়িতে।' হিমি আর একবার দাঁতে দাঁত ঘষল। 'ভাড়াটেকে নিয়ে বেলেল্লাপনা কালই আমি বাড়িওয়ালাকে বলে ওদের তুলে দেব।'

'আমার মনে হয় জলধরদা টের পেলে গলায় দড়ি দেবে।' নিমি বলল।

হিমি শব্দ করল না।

———

আপন ভাই

আজ আকাশটা পরিষ্কার। কাল সারাটা দিন যা গেছে না। আজ তো ঝিলমিল রোদই উঠল! সেই যেন সোনার আশ্বিন মাস এসে গেছে।

হুঁ, দিব্যি শরৎকালের চেহারা আকাশের শ্রাবণের শুরুতেই। মনটা কেমন খুশি লাগছিল। অধর চক্রবর্তী হাতের লাঠিটা রাস্তার পাশের কালোবাসকের ঝোপের মাথায় একবার ঠেকিয়ে দিয়ে আবার হন-হন করে হাঁটে। এমনি। এখন মেজাজটা ভালই লাগছিল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

পড়েছে। রাত্রে যেন ভাল করে ঘুমোতেই পারেনি। কত কথা কত চিন্তা যে মাথায় ঘুরছিল। এখনো ঘুরছে।

বলে কিনা একটা নতুন পাখি গাছের মাথায় উড়ে এসে বসলে মন কেমন আনচান করে ওঠে! তুবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। হুঁ, অধর চক্রবর্তীর করে। সকলের করে না।

পরশু কদের একটা বেড়ালের বাচ্চা এসে রান্নাঘরের দাওয়ার কাছে কাঁইকুঁই করছিল। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। নীলুর মা তখনি ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে বাচ্চাটাকে। কুকুর-বেড়াল একেবারে তু চক্ষের বিষ নিভাননীর। কিন্তু চক্রবর্তীর নিজের খুব খারাপ লাগে না এসব। কুকুর বেড়াল পাখি কাঠবেড়াল ছাগল গরু হাঁস, এমন কি মুরগিও যদি তুমি বাড়িতে পুষতে চাও চক্রবর্তীর তাতে আপত্তি নেই। কোনদিন কাউকে বাধা দেয় না। বরং বাড়িতে একটা নতুন জীব আসলে আদর করে তাকে আপন করে নেওয়ার দিকেই তার ঝোঁকটা বেশি।

সেই যে সেবার তার বন্ধু, বঙ্কিমের কাছ থেকে হিমু তুটো লেগ-হর্নের ছানা বাড়িতে পুষবে বলে চেয়ে নিয়ে এসেছিল, কী লাফালাফিটাই না করেছিল নিভা। বামুনের ঘরে মুরগি! একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ফেলেছিল চক্রবর্তী-গিন্নী সেদিন। আহা, আজকাল আর এসব বাছবিচার করতে গেলে হয় নাকি। ছেলের হয়ে চক্রবর্তী স্ত্রীকে বোঝাতে গিয়েছিল, এই খাদ্যাভাবের দিনে তুটো একটা মুরগি ঘরে থাকলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না, মাছের যা আকাল, মাঝে-মধ্যে অন্তত ডিমটাও তো খাওয়া চলে।

কিন্তু, কে কার কথা শোনে। রণরঙ্গিনী মূর্তি হয়ে নিভা সারা উঠোন দাপিয়ে বেড়িয়েছিল মনে আছে অধরের। হয় তোমরা এ-বাড়িতে থাক, আমি কোথাও চলে যাই, আর তা না হয় আমি এখানে থাকি—সুবিধে মতন জায়গা খুঁজে তোমরা চলে যাও। মোটের ওপর আমি এ-বাড়িতে মুরগি রাখতে দেব না।

নিভারই জয় হয়েছিল।

চক্রবর্তী হেরে গিয়েছিল। হিমু হেরে গিয়েছিল মুখটা চুন করে লেগ্-হর্নের ছানা তুটোকে সে আবার বঙ্কিমের বাড়ি দিয়ে আসে। কেননা হিমু বুঝতে পেরেছিল, মাকে চটিয়ে বাড়িতে এই জিনিস রাখা যাবে না। একদিনের ব্যাপার তো নয়। নিত্যিকার ব্যাপার। রোজ মা খিটিমিটি করবে। হিমুর পক্ষে তা অসহ্য।

হুঁ, হিমু, হিমাদ্রি, চক্রবর্তীর বড়ছেলে। জেদী একরোখা স্বভাব। খুব বেশি কিছু নিয়ে কোনদিনই আবদার-টাবদার করা তার ধাতে নেই। সেই

ছোটবেলা থেকে। একবার যদি বাবা কি মা-র বকুনি খেয়েছে কোন কিছু করতে গিয়ে বা চাইতে গিয়ে, দ্বিতীয়বার সেই রাস্তায়ই ছেলে আর হাঁটেনি। যেন সাংঘাতিক একটা অভিমান তাকে পেয়ে বসত তখন।

অথচ নীলুটা ঠিক বিপরীত। তার অভিমানও নেই। দশবার বকুনি খেয়েও আবার সেই জিনিসই করবে, সেই জিনিসই চাইবে। হুঁ, দশবার তুমি বলে-কয়ে তাকে সংশোধন করতে পারবে না। তা না হলে আজ ছোঁড়ার এই অবস্থা।

সেদিক থেকে, অধর চক্রবর্তী মনে করে, তার হিমু—হিমাদ্রি একটা পুরুষের মতন পুরুষ। সত্যি তো, জেদ না থাকলে, লজ্জা-ঘেন্না না থাকলে তাকে কি বেটাছেলে বলা যায়! মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যায় না।

একটা বেতঝোপের আড়ালে বসে চক্রবর্তী প্রস্রাব করে নিল। রোদটা চড়ছে। শ্রাবণের রোদের তেজ খুব। তার হিমুর মতন। তেজী রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে হিমুর মুখটাই এখন মনে পড়ছিল খুব।

আজ তার হিমু বাড়ি আসছে। এই জন্যই মনে এত উত্তেজনা। পরশু বিকেলে বম্বের ডাকঘরের ছাপ মারা চিঠিটা পেয়েছে অধর। ঘুম হয়নি, কাল রাত্রেও হয়নি। বলে কিনা একটা নতুন পাখি গাছের ডালে উড়ে এসে বসেছে দেখলে প্রাণটা কেমন করে। আর এ তো ঘরের ছেলে। পুরনো মুখ। হুঁ, তেইশ বছরের পুরনো। তেইশে পড়ল না হিমাদ্রি! নীলুর ঠিক তিন বছরের বড়। নীলাদ্রির বুঝি এখন কুড়ি চলেছে।

'এই যে চক্কোত্তি, কি ব্যাপার? হন-হন করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' জগদীশের সঙ্গে দেখা হতে অধর থমকে দাঁড়ায়।

'আমার হিমু, বাড়ি আসছে।'

'তাই নাকি! অনেক দিন পর তো!'

'হুঁ, পুরো ছ' বছর হয়ে গেল।'

'খুব আনন্দের কথা, খুব আহ্লাদের কথা! সকলেই বলাবলি করে শুনি হিমাদ্রি বম্বে গিয়ে খুব উন্নতি করেছে। স্টেশনে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?'

চক্কোত্তি থুতনি নাচাল।

'ক'টা বাজল এখন?'

'আটটা দশ।' হাতের ঘড়ি দেখে জগদীশ বলল, 'কিন্তু ট্রেনের তো এখনো ঢের দেরি হে!' জগদীশ ছেলে পড়িয়ে এর মধ্যেই বাড়ি ফিরছে বোঝা গেল। স্টেশনবাবুর ছেলেকে পড়ায়। এইট ক্লাসে পড়ে ছেলে। জগদীশ বুঝি এখন পোস্টমাস্টারের মেয়েকে পড়াতে যাচ্ছে। অঙ্ক ইংরেজী দুটোই জগদীশের খুব

জানা আছে কিনা, তাই পাড়াগাঁ হলেও বেশ ভাল ভাল ঘরের ক'টা টুইশানি তার হাতে। অধর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সংস্কৃতের পণ্ডিত। আজকাল আর সংস্কৃত পড়তে কোন্ ছাত্র প্রাইভেট টিউটর রাখে! ওটা ফাঁকি দিয়ে পাস করার তালে আছে সব। জগদীশের হাতে ঘড়ি। টেরিলিনের শার্ট গায়ে। পায়ে বেশ দামী জুতো। শুধু স্কুলের বেতনে কি এতসব হয়। টুইশনির পয়সায়। অথচ অধরও এক স্কুলের মাস্টার। মাইনের স্কেল একরকম। নিজের বেশভূষার দিকে চোখ পড়তে তার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। না, তা কেন হবে, আগে হয়েছে, এতদিন হয়েছে, আজ যে অধরের মনে অন্য গর্ব, অন্যরকম উৎসাহ। হিমাদ্রি বাড়ি আসছে। কাজেই মন-খারাপ ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে এক সেকেণ্ডের বেশি দেরি লাগল না। জগদীশের প্রশ্ন শুনে অধর একগাল হাসল।

'হুঁ, ট্রেনের দেরী আছে, আর যদি লেট করে আসে তবে তো কথাই নেই, তা-ও তো বম্বে মেল আগে হাওড়ায় পৌঁছবে, তারপর আমার হিমুকে আবার শেয়ালদায় এসে ট্রেন ধরতে হবে, তবে না বাড়ি।' বলতে বলতে চক্রবর্তী আকাশের দিকে চোখ তুলে দিল। 'গরমটাও খুব দিচ্ছে।' বিড় বিড় করে বলল সে।

'বাদলার পর রোদ উঠেছে। গুমোট তো ছাড়বেই।' জগদীশ পকেট থেকে সিগারেট ও দেশলাই বের করে ফস্ করে ধরিয়ে নিল। যদি সূক্ষ্ম চোখ দিয়ে এই সময় অধরের চেহারাটা দেখত সে তো একটা ঘেন্না একটা ঈর্ষার উঁকিঝুঁকি ঐ মুখটার মধ্যে জগদীশের ঠিক চোখে পড়ত। মদ গাঁজা খাওয়া বিড়ি সিগারেট টানা যে কী ভীষণ খারাপ চোখে দেখে অধর, জগদীশের তা জানা নেই। এসব কথা কেউ মুখে প্রকাশ করে না। মনে মনে রাখে। কাজেই অধরের মনের ভাব জগদীশের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন। এখানে ঘেন্নাটা বেশি হওয়ার আর একটা কারণ—জগদীশ শিক্ষক। একজন শিক্ষকের পক্ষে এই সমস্ত নেশা-টেশার চর্চা রাখা যে কতখানি অন্যায় অধর সেটা চিন্তা করে, জগদীশ করে না। যদি করত তো অনেকদিন আগেই সে ধূমপান বর্জন করত। আজ কুড়ি বছরের ওপর সে শিক্ষকতা করছে। তুমি তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে একটা আদর্শ মানুষ হয়ে থাকবে। তা না। তুমি যদি সেই আদর্শ নিজেই ভেঙে চুরমার কর তো ছেলেমেয়েরা, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কোন্ আদর্শ সামনে রেখে পথ চলবে হে! হুঁ, অধর চক্রবর্তী এই সমস্ত বিষয়ে গভীরভাবেই চিন্তা করে। কেননা সে নিজেও একজন শিক্ষক। শিক্ষকের জীবন কেমন হওয়া উচিত এই নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছে অধরের অনেক দিনের।

'খুব একটা ভাবনায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে?' একগাল ধোঁয়া ছড়িয়ে জগদীশ হাসল। 'অ, এখন বুঝতে পেরেছি, কল্যাণপুরে হাট হয়ে তুমি পরে স্টেশনে ছেলেকে রিসিভ করতে যাবে, তাই না?'

অধর ঘাড় কাত করল।

'ঠিক ধরেছ। একটা কড়াই ও একটা হাঁড়ি কিনতে হবে। ঐ দুটো জিনিস আমি এখুনি কিনে নিয়ে যেতে চাই। এই জন্যই একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরনো।'

'আচ্ছা চলি।' জগদীশ আর দাঁড়ায় না। অধর ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে এক পলক দেখল। ঈর্ষা করার কারণ জগদীশের পয়সা। স্কুলের মাস্টারি ও প্রাইভেট টুইশনি ছাড়াও জগদীশ একটা ইংরেজী গ্রামার ও একটা ট্র্যানশ্লেসান বই লিখে ফেলেছে।

অনেক স্কুলেই বই দুটো আজ ছ'বছর ধরে পাঠ্য করছে। আট-দশটা এডিশন হয়ে গেছে দুখানা বইয়ের। সেই পয়সায় জগদীশ পাকা কোঠা ও স্যানিটারী পায়খানা করেছে। দামী জুতো পায়ে দিয়ে টেরিলিনের জামা চড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে যায়। আর কথায় কথায় সিগারেট টানে। আর বেছে বেছে এমন এক শিক্ষককেই কিনা স্টেশনমাস্টারের মতন বড় বড় সরকারী চাকুরের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে ডাকে।

সত্যি, অধর এক এক সময় ভাবে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিই যেন কেমন বেঁকে-চুরে দুমড়ে গেছে। কেবল চটক, কেবল খেলো জিনিসের দিকে হাত বাড়াতে সবাই লালায়িত! তা না হলে সমাজের এই চেহারা, দেশের এই দুরবস্থা।

চমৎকার গন্ধটা নাকে লাগতে অধর চক্রবর্তী থমকে দাঁড়াল। হাটের মুখেই জয়দেবের দোকান। সকালে কচুরি-জিলিপি ভাজা হচ্ছে। গন্ধে মাত করে দিয়েছে ত্রিভুবন। গরম কচুরির ওপর অধর চক্রবর্তীর চিরকাল লোভ।

'আসুন পণ্ডিতমশাই।' জয়দেব আদর করে ডাকল। হাতের লাঠি ও ছাতাটা দোকানের এক কোণায় রেখে চক্রবর্তী একটা বেঞ্চিতে বসল। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'আজ বুঝি হিমুদা আসছে?' জয়দেব ক্যাশ ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

'হুঁ।' চক্রবর্তী একগাল হাসল। 'তুমি কার কাছে শুনলে হে?'

'নীলু কাল বলছিল।'

'হুঁ, আজ বম্বে মেলে আসছে হিমাদ্রি!'

'তবে যে এত সকাল সকাল স্টেশনে ছুটছেন! ওরে কে আছিস, দুখানা গরম

কচুরি ও চারখানা জিলিপি দিয়ে যা এখানে। ভাল করে ধুয়ে টুয়ে একগ্লাস জল রেখে যা আগে।'

জয়দেব কর্মচারীদের একজনকে ডাকল।

'ঠিক আছে বাবা, এত তাড়া কি—হুঁ, স্টেশনে পরে যাব। ট্রেনের এখনো বিলম্ব আছে। সকাল সকাল বেরোলাম হাট থেকে একটা মাটির হাঁড়ি ও কড়াই কিনতে হবে।' একটু থেমে থেকে অধর হাসল। 'বুঝতে পারছ, একটি মুখ বাড়ল—একমাসের ছুটি নিয়ে হিমু বাড়ি আসছে। এতদিন তিনটে মুখ ছিলাম।'

'নীলুর মুখে আমি শুনেছি—একমাসের ছুটি নিয়েই হিমুদা আসছে। আমার যে কী ভাল লাগছে! কৈ রে—এখানে খাবারটা দিয়ে যা!' ওদিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জয়দেব আবার পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। 'সত্যি, হিমুদা যে এত উন্নতি করবে ভাবতেই পারা যায় না।'

'চেষ্টা! চেষ্টা! উত্তম ছাড়া জীবনে কেউ বড় হতে পারে না জয়দেব। আমি তো রাত-দিনই নীলুটাকে বলি, এই বয়সে—হিমু যত কষ্ট করেছে যত পরিশ্রম করেছে—তুই তার ছটাকও যদি করতিস তবে তোর আজ এই দুরবস্থা হত না।'

অধরের সামনে শালপাতায় গরম কচুরি ও জিলিপি এসে গেল।

'আচ্ছা, আগে তো গ্লাসে করে জল দিয়ে যাবি গাধা।' জয়দেব তার কর্মচারীকে ধমক লাগাল।

'ঠিক আছে, আমি তো বসছিই—বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খালি পেটে চা খেয়ে এসেছি। গিন্নীর শরীরটা ভাল না। রুটি-টুটিটা ভাজতে পারে নি।'

জলের গ্লাস এসে গেল। চক্রবর্তী উঠে গিয়ে হাত-মুখটা ধুয়ে ফেলল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে আবার বেঞ্চিতে বসল।

'হুঁ, কি বলছিলাম যেন। বাড়ি ফিরতে অনেক বেলা হবে, তাই ভাবলাম জলখাবারটা তোমার দোকানে সেরে নেওয়া যাবে।'

'খুব ভাল করেছেন। এর মধ্যেই তো অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হয়েছে। বয়স হয়েছে। এখানে বসে একটু বিশ্রাম করে যান।'

কচুরি ও জিলিপি ভেঙে চক্রবর্তী মুখে পুরল। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'না হে, বাইরে টাইরে কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি কোনদিনই হয় না। তবে কি না তুমি হলে নীলুর বন্ধু, দুজনে একসঙ্গে আমার স্কুলে পড়েছ। তুমি কিছু আমার চোখে নতুন মানুষ না। তা ছাড়া তোমার বাবা রাসবিহারীর সঙ্গেও আমার খুবই সদ্ভাব ছিল তোমরা জান সেকথা। কাজেই তোমাদের এই দোকানটাকে আমি আমার নিজের বাড়িঘরের মতন দেখি। বাড়ি-ঘরে তৈরী খাবার আর এই দোকানে তৈরী

খাবার আমার কাছে এক রকম। আজ চল্লিশ বছরের ওপর হয়ে গেল এই কল্যাণপুর শ্যামনগরের বাসিন্দা আমি। একমাত্র তোমাদের দোকান ছাড়া আর কোন খাবার দোকানে আমি ঢুকেছি মনে করতে পারি না।'

জয়দেব আস্তে মাথা নাড়ল।

'খাবারটা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'খাচ্ছি। হুঁ, কাল বুঝি নীলাদ্রি তোমার দোকানে এসেছিল?' অধর ভুরু কুঁচকোল।

'আমার দোকানে ঠিক আসে নি। বাড়ি ফিরছিলাম। স্টেশনের কাছে হঠাৎ দেখা। তখন হিমুদার কথা বলল।'

'হুঁ, কাল আমি ওকে স্টেশনবাবুর কাছে বম্বে মেলের খবরটা জানতে পাঠিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনে ঠিক কখন এসে গাড়িটা পৌছবে আমার তো জানা নেই বাবা।'

জয়দেব চুপ করে রইল।

'আর ওই এক ছেলে আমার—কী বলব তোমাদের, ওর জন্য এক এক সময় মনের দুঃখে আমার বনে চলে যেতে ইচ্ছে করে। অ্যাঁ, আমার হিমুও ছেলে, আর তুইও ছেলে। কেউ বিশ্বাস করবে তোরা এক মায়ের পেটের দুটি ভাই?'

জয়দেব মাথা নাড়ল।

'হিমুদার সঙ্গে নীলুর তুলনাই হয় না। কেবল নীলু কেন, এই গাঁয়ে—গাঁয়ে বলছি কেন, আমাদের এই নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টে হিমাদ্রি চক্কোত্তির মতন এমন আর একটি ছেলে কেউ খুঁজে বার করুক দিকিনি। যেমন দেখতে শুনতে তেমনি তাঁর সাহস বুদ্ধি আলাপ ব্যবহার, তেমনি তাঁর গুণ। সত্যি, মানুষটার গুণের শেষ নেই। অতবড় গুণী ছেলে কলকাতা শহরেই বা ক'টা আছে। সেদিন তো আনন্দবাজার পত্রিকায় হিমুদার ফটো বেরিয়েছিল।'

'কেবল কি আনন্দবাজার! যুগান্তর বসুমতি উল্টোরথ সিনেমা জগৎ সব কাগজেই আমার হিমুর ছবি বেরিয়েছে। প্রায়ই নাকি বেরোয়—আমি তো খুব একটা কাগজ-টাগজ দেখি না। সেদিন আমাদের পলাশবাবুর ছেলে শুভেন্দু এসে আমাকে একগাদা সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ওই ছোঁড়া আবার লেখে-টেখে কিনা। অনেক কাগজ তার কাছে আসে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুভেন্দু সেন। আমাদের নিচের ক্লাসে পড়ত। ছিপছিপে রোগা চেহারা।'

'হুঁ, খুব ভাল ছেলে।' খাবারটা শেষ করে অধর কাচের গ্লাস তুলে ঢক ঢক

করে জল খেল। উঠে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে পরে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা ও হাতটা মুছে ফেলল। 'আচ্ছা, এখন বলো তো বাবা তোমার কত দাম হয়েছে—'

'না না, সে কি! আপনি পয়সা দেবেন কেন, আপনাকে দাম দিতে হবে না।'

'আহা, তা কি হয়, এটা হল তোমার দোকান, একটা ব্যবসা—তোমার বাড়িতে তো আর যাই নি—তখন না হয়—'

'ঐ একই কথা হল। আপনাকে পয়সা দিতে হবে না।'

অধর ভিতরে ভিতরে খুশি হল।

'ঈশ্বর তোমার শ্রীবৃদ্ধি করুক। আর বসব না বাবা।' হাত বাড়িয়ে ছাতা ও লাঠিটা তুলে নিল অধর।

'আর একটু বিশ্রাম করে গেলে হত না? একটা সিগারেট খাবেন?'

'না বাবা, আমি ধূমপান করি না।' জয়দেবের চোখের দিকে চোখ রেখে অধর অল্প হাসল। 'তুমি কি কোনদিন রাস্তায় ঘাটে আমাকে বিড়ি-সিগারেট খেতে দেখেছ?'

'না।'

'আমি, নেহাত একজন শিক্ষক, ধূমপান করাটাকে পাপ মনে করি।'

এবার জয়দেব ঠোঁট টিপে হাসল। কেন না কাল নীলুর সঙ্গে দেখা হতে রেলের ওভারব্রীজের ওপরে বসে তারা দুজনে মিলে একটা প্লেন উইলস্-এর প্যাকেট শেষ করেছে।

'নীলু বলছিল হিমুদা নাকি শিগ্‌গির আমেরিকা যাবে। বম্বের একটা সিনেমা কোম্পানি নাকি টাকা দিয়ে পাঠাবে।'

'তা পাঠাতে পারে, আমাকে অবিশ্যি হিমু এসব বিষয়ে কিছু লেখে-টেখে না। চিঠিপত্তর মাঝে মাঝে যা দু-একখানা লেখে নীলুর কাছেই লেখে—হুঁ, আমেরিকা ইংলণ্ড জার্মানী যে-কোন দেশে পাঠালেই হল। সিনেমা কোম্পানিগুলোর তো পয়সার অভাব নেই। শুনছি হিমুর মতন ভাল ফটো তুলতে অনেকেই পারে না।'

'হুঁ, খুব নাম করেছে হিমুদা,' জয়দেব ঘাড় কাত করল। 'এতবড় ক্যামেরাম্যান কলকাতায়ও খুব কম আছে শুনেছি।'

হাসি-হাসি মুখ করে অধর চক্রবর্তী মাথা ঝাঁকাল। 'নীলু বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে কেবল দাদার গল্প করল? আর তুমি জিজ্ঞেস করলে না ওকে, তুই কী করছিস, তুই কি বাপের খেয়ে সারাজীবন ভেরেণ্ডা ভাজবি?'

জয়দেব এ-কথার উত্তর করল না। এক সেকেণ্ড মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

'চলি বাবা, হাঁড়িটা কড়াইটা কিনে এবার রেলস্টেশনের দিকে এগোতে হয়।' অধর চক্রবর্তী দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি নীলুকে বলেছিলাম, তুইও এবার তোর দাদার সঙ্গে বম্বে চলে যা না— ওখানে গেলে হিমুদা নিশ্চয়ই একটা সুবিধে করে দেবে।'

'না না।' জয়দেবের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অধর নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'গাঁ ছেড়ে সে কোথাও নড়বে না, শ্যামনগরের মাটিতে যে সে কী পেয়েছে তা সে-ই জানে। একেবারে কামড়ে ধরে পড়ে আছে এখানকার মাটি—কিছুতেই কারো কথা কানে তুলবে না—সাহস না থাকলে উদ্যম না থাকলে আজকালকার দিনে— হুঁ, এতবড় একটা কূপমণ্ডুক…' বলতে বলতে চক্রবর্তী রাস্তায় নেমে এল।

॥ ২ ॥

সাহেবদের মতন ধবধবে গায়ের রং। তেমনি উঁচু লম্বা। ব্যাকব্রাস করা চুল। টাই স্যুট পরা মানুষটা যখন কল্যাণপুরের মতন একটা ছোট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফরমে আপার ক্লাসের কোন কামরা থেকে বেরিয়ে এল তখন তাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। হুঁ অধর পণ্ডিতের ছেলে। যারা চেনে তারা বলাবলি করল। আবার হিমাদ্রিকে চেনে না, কোনদিন তাকে দেখেনি, বা দেখলেও ভুলে গেছে এমন কিছু কিছু মানুষও স্টেশনে উপস্থিত ছিল বৈকি। হয়তো তারা কলকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। আপ-ট্রেনে এই কাজে সেই কাজে শান্তিপুর কৃষ্ণনগর কি রাণাঘাট যাচ্ছে এমন সব যাত্রীর সংখ্যাও স্টেশনে কম ছিল না। আজকাল পাড়াগাঁর মতন জায়গায় ছোটখাটো রেলস্টেশনেও রোজ ভিড় লেগে আছে। বাবা, সিনেমা কোম্পানিতে চাকরি করে, তা-ও বোম্বাইয়ের মতন জায়গায়। অনেক টাকা রোজগার করে। উঁহু, বি-এ এম-এ পাস করে করত কি। ঘোড়ার ঘাস কাটত। এই কল্যাণপুর শ্যামনগরের মতন দুটো গাঁয়ে খুঁজে দেখলে এমন দশ গণ্ডা বি-এ পাস এম-এ পাস বেরিয়ে পড়বে না!

তাদের দিকে কে তাকায়! কে তাদের খোঁজ করে।

দু'বার চেষ্টা করেও স্কুল ফাইন্যাল পাস করতে পারল না যে ছেলে সেই ছেলেকে দেখতে আজ কত উৎসাহ লোকের। গর্বে অধর চক্রবর্তীর বুকটা ফুলে উঠেছিল।

'কি হল বাবা, তুমি এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'মালপত্র সব নামল?' অধর চক্রবর্তী কেমন থতমত খেল।

'হ্যাঁ সব নেমেছে, তুমি দুটো রিক্সা ডাক।' পকেট থেকে রঙীন রুমাল বের করে হিমাদ্রি কপালের ঘাম মুছল।

'দুটো দিয়ে কি হবে?'

'কি মুশকিল, দেখছ এতবড় দুটো স্যুটকেস হোল্ড-অল এত বড় একটা ব্যাগ, এদিকে তুমি বলছ তোমার সঙ্গেও জিনিস আছে—'

'হুঁ, ঐ তো,' অধর আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। 'লাইটপোস্টের কাছে কড়াটা হাঁড়িটা রেখেছি।'

'তোমার যেমন মাথা, হাঁড়ি কড়াই নিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়েছিলে?'

'কোথায় রাখব? চারদিকে যা চোর-ছেঁচড় রে বাবা।'

'স্টেশনমাস্টারের ঘরে রাখতে পারতে, বাইরে ওয়েটিংরুমে রেখে এলেই বা ক্ষতি কি?' হিমু মুখ খিঁচিয়ে উঠল। অধর চক্রবর্তী মাথা চুলকাতে থাকে।

'ভারি তো একটা কড়া ও মাটির হাঁড়ি। চুরি গেলেই কি এমন লাখ টাকার সম্পত্তি চুরি যেত? যাও, ছুটে গিয়ে দুটো সাইকেল-রিক্সা ডেকে আন।'

'রিক্সা প্ল্যাটফরমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের ডাক, মালপত্রগুলো রিক্সায় তুলতে হবে না?' হিমাদ্রি এদিক-ওদিক তাকাল। 'এমন হোপলেস স্টেশন, একটা কুলি পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।'

'দুটো তো স্যুটকেস, আর ঐ বিছানা, দুজনে ধরাধরি করে রিক্সায় নিয়ে তোলা যেত।' অধর পণ্ডিত ছেলের মুখের দিকে তাকাল।

'কেন, রিক্সাওয়ালা মাল নেবে না?'

'নেবে বেশি পয়সা চাইবে।'

'তা নেবে বেশি পয়সা। আমি টায়ার্ড। এমন একটা লং-জার্নির পর এসব টানা-হেঁচড়া করতে যাব নাকি এখন!' রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মোছা শেষ করে হিমাদ্রি প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়াতে লাগল। অধর চক্রবর্তী প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে রিক্সা ডাকতে গেল।

হিমাদ্রির চারদিকে তখনও কিছু কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে। শান্তিপুরের ট্রেন এসে চলে গেল। আর একটা ট্রেন যেন আসবে আসবে করছিল। কিন্তু ট্রেনের দিকে কারো নজর নেই। সকলের চোখ ফরসা সুন্দর মানুষটির দিকে। হাতে কী সুন্দর একটা ঘড়ি। রঙিন রুমাল দিয়ে যখন ঘাড় গলা মুছছিল কেমন একটা বুনো ফুলের গন্ধ জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনো সেই আশ্চর্য গন্ধের

কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। যেন দু-একজন জোর জোর শ্বাস টেনে গন্ধটা বুকের ভিতর পুরে নিতে চেষ্টা করছিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করে হিমাদ্রি চোখ তুলে আকাশটা দেখল। হাতের ঘড়ি দেখল একবার! তার আশেপাশে যে এতগুলি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যেন তার মোটেই খেয়াল নেই। ক'টা গাছ কি খুঁটি দাঁড়িয়ে থাকার মতন অবস্থা। অর্থাৎ কারো দিকে সে তাকাচ্ছে না, কারো সঙ্গে সে কথাও বলছে না। কেনই বা তাকাবে, কেনই বা কথা বলবে। সিনেমা কোম্পানির চাকরি, তার ওপর থাকে বম্বের মতন জায়গায়। কত পয়সা কামাই করছে, কেমন চকচকে ঝকঝকে চেহারা হয়েছে, গায়ে কেমন দামী পোশাক!

অবাক চোখ মেলে যারা তাকে দেখছিল তাদের গায় ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পায়ে ছেঁড়া জুতো, বেশির ভাগ খালি পা। তাদের অনেকেরই একবেলা খাওয়া জোটে তো আর একবেলার জন্য চিন্তা করতে হয়—অনেকের হয়তো আদৌ জোটে না।

রিক্সাওয়ালা যদি রিক্সায় মাল তুলতে গিয়ে বেশি পয়সা দাবী করে তবে তাই তাদের দেব—গলা বড় করে এখানে ক'টা মানুষ একথা বলতে পারে? পয়সা বেশি থাকলে তো বেশি পয়সা দেবে। এখানে অনেকের বোধহয় চাপবার মতন পয়সাই নেই যে।

দুপ দাপ করে রিক্সাওয়ালারা ছুটে এল। পিছনে অধর পণ্ডিত।

'নে বাবা, চট করে সব গাড়িতে তুলে নে।' অধর আঙুল দিয়ে ছেলের স্যুটকেস ব্যাগ ও হোল্ড-অলটা দেখাল। রিক্সাওয়ালা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গেল। আর একবার এসে অধরের কড়াই ও হাঁড়িটা তুলে নিয়ে গেল। হিমাদ্রি যেন গুণগুণিয়ে গান করছিল। প্ল্যাটফরম থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখনও সে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে ভুলেও একবার তাকাল না। যেন ক'টা গাছ যেন খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের সঙ্গে অধর চক্রবর্তীও প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল।

'পণ্ডিত খুব ভাগ্যবান হে।'

'তা আর বলতে। সারাজীবন ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে ইস্কুলের মাস্টারি করল। বড়ছেলের দৌলতে এখন যদি কপাল খোলে।'

'তবে কিনা আজকালকার ছেলেপিলে বাপ-মাকে কতটা দেখবে, বা এখনই কতটা দেখছে সেটাও জানতে হবে—ভেতরের খবর তো আমরা কিছুই জানি না।'

'না, তা জানি না।' একজন আর এক জনের চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়ল। ভিড়টা আস্তে আস্তে ভেঙে গেল।

বাড়ি পৌঁছে হিমু কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। স্টেশন প্ল্যাটফরমে একগাদা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গম্ভীর অহঙ্কারী হিমাদ্রিকে আর যেন খুঁজেই পাওয়া গেল না।

অবশ্য এখানে অহঙ্কার করবেই বা কার সামনে? বাবা মা আর ছোটভাই। নিভাননীর গায়ের রং পেয়েছে সে। কাঠামোটা অধর চক্রবর্তীর। হিমুর তুলনায় নীলু শরীর বা রংয়ের দিক থেকে প্রায় কিছুই না, কেবল বাবা অধর চক্রবর্তীর ধারাল নাখ-চোখটা পেয়েছে। দেখতে কত ছোটখাটো। রংটাও বেশ ময়লা। হিমু যেমন নাকে-চোখে কথা বলতে পারে, নীলু ঠিক তার উল্টো। লাজুক মুখচোরা। যে জন্য অধর চক্রবর্তী রাত-দিন তাকে গালিগালাজ করছে। তুই একটা মেয়েছেলে। বি. এ. পাস করলে হবে কি, আজ পর্যন্ত একটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে শিখলি না, সাহস করে কোথাও পা বাড়াতে হলে তোর মাথায় বাড়ি পড়ে। তুই চিনিস কেবল তোর বাবার এই টিনের চালের বাড়িটা আর বাড়ির চারপাশের ক'টা গাছপালা। বর্তমান জগৎটা যে কী করে চলছে সেই সম্পর্কে আজও তোর কোন ধারণাই জন্মাল না। তোকে মেয়েছেলে বলব না তো কি বলব? উঁহু, আজকাল মেয়েরাও অনেক এগিয়ে গেছে। তুই মেয়েছেলেরও অধম। নীলু প্রতিবাদ করে না। বাপের গালাগাল নীরবে হজম করে, আর চুপ করে থাকে।

সময় সময় নিভাননীকে ছোটছেলের হয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। 'গাছের পাঁচটা ফল কিছু একরকম হয় না। অবিকল হিমুর মতন তোমার নীলুও হবে এ কি করে আশা কর? এক ছেলে হাজার টাকার ওপর মাসে রোজগার আর এক ছেলে আজ পর্যন্ত দুশো টাকাও রোজগার করতে পারল না। তাই বলে রাতদিন তাকে গালিগালাজ করতে হবে তার কি অর্থ আছে। পয়সা রোজগার কতকটা, কতকটা কেন, বেশিটাই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। অর্থভাগ্য সব মানুষের এক রকম হয় না। যদি তা হত তো সংসারে গরীব ধনী কথা দুটো থাকত না। নীলুর চেয়েও বেশি লেখাপড়া জানা, এঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে ডাক্তারি পাস করেছে এমন লাখ লাখ ছেলে রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে —চাকরি পায় না। চাকরির বাজারটা কী দাঁড়িয়েছে, আর রোজ এই নিয়ে খবরের কাগজে কী সব লেখালেখি হচ্ছে তুমি কি পড় না? ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই তো খবর কাগজ নিয়ে বসে পড় দেখি।'

স্ত্রীর এসব কথায় অধর চক্রবর্তী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

'তুমিই আস্কারা দিয়ে ছোঁড়ার মাথাটা খেয়েছ। চাকরি করবে না নীলু,

ব্যবসা করবে, দোকান দেবে—দিলাম কল্যাণপুরের হাটের একটা ঘর নিয়ে স্টেশনারী দোকান খুলে। আমার কি আর জমানো টাকা ছিল? তার জন্য কী পরিমাণ ধার-দেনা করতে হয়েছিল তুমি কি খবর রাখ না, তুমি কি এসব কিছুই জান না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলটা কি? পারল ব্যবসা চালাতে? বছরও ঘুরল না, গণেশ উল্টে দিয়ে পীরগঞ্জের কিশোরীর হাতে দোকানশুদ্ধ তুলে দিয়ে ঘরের ব্যাঙ আবার ঘরে এসে ঠাঁই নিল। হয়ে গেল ব্যবসা।'

'এমনটা হয়েছে তোমার ওই কিশোরীর জন্য। ঐ শয়তানের কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করতে যাবে আমি কি জানতাম? এই নিয়ে গোড়ায় আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে না পর্যন্ত। যখন জানলাম তখন আমার মাথায় বাজ পড়ল। অ্যাঁ, কিশোরী হল সুদখোরের সুদখোর, তার চোখের পর্দা গায়ের চামড়া বলে কিছু আছে?

বছর না ঘুরতেই টাকার জন্যে কোর্ট-কাছারী করবে বলে শাসাতে আরম্ভ করল। বড়ছেলে হিমুর টাকা পেয়ে কিশোরীর টাকা শোধ করবে বলে তুমি কথা দিয়ে এসেছিলে। হিমুও টাকা পাঠাতে পারল না, কিশোরীও অপেক্ষা করল না, নালিশ করতে কোর্টে ছুটল, আর অমনি তুমিও ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দোকান শুদ্ধ তার হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলে। বলি, দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করে রাতারাতি কেউ লাভের মুখ দেখে? তা কি সম্ভব? গাছে ফল এলেই কিছু পাকতে শুরু করে না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দোকানটা আরম্ভ করে চালু করতে ক'টা দিন সময় পেল নীলু যে তুমি এমন—

নিভাননীর কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। এর চৌদ্দ আনাই সত্য। কিশোরীর কাছ থেকে টাকা ধার করা মস্ত ভুল হয়েছিল। একটু চুপ থেকে পরে অধর চক্রবর্তী অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। ঐ তো, নার্সারি করবে বলে ছেলে ক'দিন খুব লাফালাফি করল—তখন আর আমার কাছে টাকা চাইতে সাহস পেল না। তোমার কাছে টাকা চাইল। হাতের চুড়ি গলার হার বাঁধা দিয়ে তুমি টাকা জোগাড় করে দিলে, কিন্তু জিজ্ঞেস করি তার নার্সারিতে ক'টা ফুল ফুটেছিল, ক'টা গাছে কলি এসেছিল চোখের ওপর তো দেখলে—এমন অপদার্থ, এতবড় অকর্মণ্য ভূ-ভারতে আর দুটো জন্মেছে বলে তো আমার জানা নেই—'

কিন্তু নিভাননী কিছুতেই বিশ্বাস করে না তার ছোটছেলে নীলু অপদার্থ, নীলু অকর্মণ্য। 'যখন সময় হবে তখন ঠিকই ও রোজগারপাতি করবে, সেদিন তোমার আমার বলার অপেক্ষায় সে বসে থাকবে না—'

'সেই দিন তার কোনদিনই আসবে বলে আমি মনে করি না।' অধর সঙ্গে

সঙ্গে উত্তর করে। তাতে নিভাননী আরও চটে যায় 'যেন তুমি গণক ঠাকুর, যেন নীলুর করকোষ্ঠী তোমার নখের আগায়—বলি তুমি যে রাতদিন ওর পেছনে এমন লেগে আছ, ক'দিন হল ও পাস করে বেরিয়েছে শুনি? হুঁ, টাকা রোজগার—যদি তাই বল তো আমিও বলতে পারি, এই যে সারাজীবন ইস্কুলের মাস্টারি করলে, তোমার গায়ে আজও ছেঁড়া সার্ট কেন, আজও একজোড়া ভাল চটি তোমার পায়ে উঠল না, ফুটো টিনের ঘরে বাস করছ—আর সেই মাস্টারি করেই জগদীশ বাঁড়ুজ্যে রাজার হালে আছে, তার বৌয়ের গায়ে নিত্যনতুন গয়না, পাকা বাড়ি করেছে—'

'থাক, জগদীশের কথা আমার কাছে বোল না, জগদীশ কি, করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে তা আমার খুব জানা আছে, এমন নীতিভ্রষ্ট একটা লোককে আমি আমার জীবনে আদর্শ করতে চাই না।' ইত্যাদি বলতে বলতে চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে স্ত্রীর সামনে থেকে সরে যায়। অর্থাৎ জগদীশ মাস্টারের কথা উঠলে অধর চক্রবর্তী, হয় চুপ করে যাবে, নয়তো সেখান থেকে সরে পড়বে।

যাই হোক আজ কিন্তু নালুকে নিয়ে কোন অশান্তি নেই। আজ হিমু বাড়ি এসেছে। চক্রবর্তীর মুখে হাসি। তেমনি নিভাননীর মুখেও হাসি ধরছে না। নালু ঠিক হাসছে না, তবে মুখ কালো করেও নেই। বা তার ছোট ঘরটায় চুপ করে বসে নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দাদার জন্য গয়লাবাড়ি থেকে দুধ নিয়ে এসেছে, দাদা এসেই চা খাবে। মুরগির ডিম নিয়ে এসেছে। ডিম নিভাননী ছোঁবে না। নীলু তার ছোট ঘরে কেরাসিন স্টোভে সেদ্ধ করে রেখেছে, কাল স্টেশন থেকে পাউরুটি কিনে এনে রেখে দিয়েছিল। অর্থাৎ তার ধারণা ছিল দাদা ভোর ভোর বাড়ি পৌঁছে যাবে। এসে ডিম পাঁউরুটি দিয়ে চা খাবে। এত বেলা করে যে হাওড়ায় ট্রেন আসবে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। যাই হোক, দাদার জন্য এটা আনা ওটা যোগাড় করার ব্যাপারে তার উৎসাহ উদ্যমটা দেখবার মতন। সে ওটা ধরেই নিয়েছে, দাদা বাড়ি এলে তার ছোট ঘরেই শোবে। এই সেদিনও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে হিমু ও সে এক বিছানার শুত না! আজ এক বিছানায় তার সঙ্গে হিমু শোবে কিনা সে ঠিক বলতে পারছে না, সেই জন্য অর্থাৎ তার নিজের শোবার জন্য নীলু যদিও মাথা ঘামাচ্ছে না, বড় ঘরের দাওয়ায় চট বা মাদুর-টাদুর যা হোক একটা কিছু বিছিয়ে শুয়ে পড়লেই চলবে, ভাবছিল সে দাদার জন্য। শোয়া-টোয়ার ব্যাপারে দাদা চিরকালই একটু বেশি খুঁতখুঁতে। বিছানাটা পরিষ্কার হওয়া চাই, ঘরের জানালা খুলে রাখা চাই. কোনদিক থেকে কোনরকম দুর্গন্ধ-টুর্গন্ধ আসবে না, ধোঁয়া আসবে না। ইত্যাদি নানারকম

ব্যাপার। যে জন্য কাল সারাদিন নীলু তার ছোট ঘরটা পরিষ্কার করেছে। ঘরের পিছনে ছোট জমিটায় নার্সারি করবে বলে অনেক গাছ-টাছ পুঁতেছিল নার্সারি তো খুব হল। এখন জায়গাটা জঙ্গলে ভরে গেছে। হয়তো সাপখোপ এসে আস্তানা গেড়েছে।

তাই নীলু এক এক সময় চিন্তা করে, মানুষ ইচ্ছে করলেই কিছু একটা করতে পারে না, অনেক দিন থেকেই নার্সারির স্বপ্ন দেখছিল সে, মা-র কাছ থেকে ও কিছু টাকাকড়িও যোগাড় করল। কলকাতার একটা বড় নার্সারিতে গিয়ে তাদের ক্যাটালগ দেখে দেশী-বিদেশী নানারকম ফুলের চারা ও বীজ কিনে নিয়ে এল। ভাল সার কিনে আনল। গত আষাঢ় মাসে জিনিসটা আরম্ভ করেছিল। আবার একটা আষাঢ় এসেছে। কিন্তু ফুলবাগানের জায়গায় এর মধ্যেই প্রকাণ্ড জঙ্গল গজিয়েছে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও বর্ষার ফুলের চারাগুলি সে বাঁচাতে পারেনি। আশায় আশায় ছিল শীতের মুখে মৌশুমী ফুলের বীজগুলি থেকে অঙ্কুর বেরোবে। কিন্তু দেখা গেল সব বীজ পিঁপড়েয় খেয়ে শেষ করে রেখেছে। সারাটা শীত কিছু শুকনো কাঁটাগাছ জন্মাল! তার ঘরের জানালায় বসে নীলু সবই দেখছিল। তারপর গরম পড়তে না পড়তে ফণিমনসা আর বিছাপাতায় জমিটা ছেয়ে গেল। তারপর বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত রকমের আগাছা যে মাথা গজিয়ে লক লক করে বেড়ে উঠল। দেখে নীলু বোকা বনে গেছে। গাছ গাছ সে করেছিল ঠিকই, এবং অগুণতি গাছও ঐ জমিতে জন্মাল, কিন্তু সে সব ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এখন তার গা রীতিমত শির শির করে। নার্সারি করতে গিয়ে ঘরের পিছনটায় সাপ ব্যাঙ কেঁচো টেঁচো এবং অগুণতি পোকামাকড় ডেকে আনল। এটা কি তার ভাগ্যের দোষ, নাকি ঠিক মতন কাজ করতে না পারার জন্য, তার অক্ষমতার জন্য—সে ভেবে পায় না। দোকানের অবস্থাও শেষ পর্যন্ত তাই হল না। বাবা তাকে দু চোখে দেখতে পারে না ঠিকই, তা হলেও সে দোকান করবে শুনে বাবা তার জন্য ধারকর্জ করল। জয়দেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কলকাতা থেকে বহু মালপত্র কিনে এনে দোকান লাগাল। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সারাদিন হাঁ করে বসে থাকে। মাছিটাও দোকানে ঢোকে না। অথচ শ্যামনগর কল্যাণপুরের মানুষ কি মনোহারী জিনিস কেনে না। ঠিকই কেনে, কাঠের ঠেলা গাড়িতে দোকান সাজিয়ে রাস্তায় ফিরি করে এমন সব ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তারা সাবান কেনে তেল কেনে আলতা কেনে, চুলের ফিতে কাঁটা আরসি চিরুনি কাচের গ্লাস মায় স্নো ক্রিম পাউডার। দিন গেল মাস গেল বছর ফুরোল। নীলুর দোকানের শো-কেস্ ও আলমারীর তাকে কেবল ধুলো জমছে

লাগল। এদিকে কিশোরী রোজ টাকার জন্য বাবাকে তাগাদা দিচ্ছে। হুঁ, দেব নিশ্চয় দেব, ধারের টাকা কেউ কোনদিন রাখে? আমার বড়ছেলে আশ্বিন মাসে বম্বে থেকে টাকা পাঠাবে, টাকাটা এলেই সব একসঙ্গে শোধ করব। বাবার কথায় কিশোরী আশ্বিন পর্যন্ত অপেক্ষা করল। গেল আশ্বিন—এলো কার্তিক। আবার কিশোরীর তাগাদা শুরু হল। জানুয়ারীতে ছেলে টাকা পাঠাবে, ছেলের চিঠি পেয়েছি। এটা বাবাকে বানিয়ে বলতে হল, কেন না দাদা বম্বে থেকে টাকা পাঠাবে এমন কোন চিঠি আজ পর্যন্ত বাবাকে লেখেনি। বাবার কাছে কোন চিঠিই লিখত না দাদা। নীলুর কাছে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়েছে। তাতে টাকা-পয়সার কিছু উল্লেখ থাকত না।

আমি অমুক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি অমুক ছবিতে এখন কাজ করছি, আমার সঙ্গে অমুক ডিরেক্টারের কি অমুক প্রডিউসারের পরিচয় হল, অমুক ফিল্মস্টার আমাকে তার ফ্ল্যাটে দুপুরে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে, অমুক অ্যাকেট্রেসের সঙ্গে সেদিন সারাটা বিকেল ম্যারিন ড্রাইভে কাটালাম, কেবল এইসব। হুঁ, বাবার কথা মতন কিশোরী জানুয়ারী পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কাটল জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীও পার হল। মার্চ মাস পড়তে কিশোরী স্বমূর্তি ধারণ করল। এক বছর তিন মাস পার হয়েছে। আর সে অপেক্ষা করবে না। এবার তার পাওনা টাকা আদায় করতে না পারলে আদালতে সে নালিশ করবে—বেগতিক দেখে ভয়ে ভয়ে বাবা দোকানটাই তার হাতে তুলে দিল। নীলুর ব্যবসা করার সাধ ঘুচল।

কাজেই নীলু ধরে নিয়েছে ইচ্ছে করলেই সে কিছু করতে পারে না। হয় তার ইচ্ছার মধ্যে ত্রুটি আছে, বা তার ক্ষমতার অভাব, অথবা তার ভাগ্য—দুর্ভাগ্য তাকে এভাবে ভোগাচ্ছে।

যাক, যে কথা বলা হচ্ছিল, দাদা বাড়ি আসছে। দাদার খাওয়া শোওয়া ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অনেক কিছু তাকে ভাবতে হচ্ছে। কথাটা মিথ্যা কি, দাদাকে সে দারুণ ভালবাসে। সেই ছোটবেলা থেকে।

দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর ক'টা দিন তার যা কেটেছিল না! তার ইচ্ছে করছিল সে-ও কোথাও চলে যায়, যেদিকে দু চোখ যায়। আসলে দাদা রাগ করে অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। দু দুবার স্কুল ফাইন্যাল ফেল করল। অথচ বাবা সেই স্কুলের একজন শিক্ষক। লজ্জায় দুঃখে বাবা কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। পণ্ডিতের ছেলেই তো গাধা হয়, কাজেই অধর বাবুর আফসোস করার কোন কারণ নেই! একদিন বাবার স্কুলের কোন টিচার নাকি অনেকটা বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর একজন টিচারের সঙ্গে

আলোচনা করছিল। কথাটা শুনে এসে, নীলুর মনে আছে, বাবা সেই রাত্রে ভাত খায়নি। পরে মা-র মুখে সে শুনেছিল সারারাত বাবা ঘুমোয়নি। ঘরের মেঝেয় পায়চারি করে কাটিয়েছিল। পরদিন সকালে, মা তখন সবে রুটি বেলছিল, চা খেতে এসে দাদা রুটি চাইছিল, রুটি ভাজতে দেরি হচ্ছিল বলে দাদা মা-র সঙ্গে রাগারাগি করছিল, দাদার গলার স্বর শুনতে পেয়ে বাবা তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরের দরজায় ছুটে যায়। বাবা যে খুব একটা রাগী মানুষ তা নয়। কিন্তু দাদার পরীক্ষার ফল বেরোবার পর থেকে বাবা যেন একটু কিছুতেই খুব উত্তেজিত অস্থির হয়ে পড়ছিল। তা ছাড়া আগের দিন স্কুলের ড্রয়িং-এর মাস্টার পুলক গাঙ্গুলী ও ইতিহাসের মাস্টার ফণী রায়ের আলোচনাটা শুনে এসে বাবার মনের অবস্থা যে খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল নীলু সেটা পরিষ্কার অনুমান করতে পারছিল। বাবার মনের অবস্থা বুঝতে পারার মতন বয়স হয়েছিল তার। নীলু তখন ক্লাস এইটে পড়ে। সকাল বেলা রুটি নিয়ে হিমু মা-র সঙ্গে ঝগড়া করছে, তাও এমন এক ছেলে দুবার চেষ্টা করেও যে কিনা সামান্য স্কুল ফাইন্যালের দরজা ডিঙোতে পারে না। নীলুর পরিষ্কার মনে আছে, দাদার চিৎকার শুনে সে পড়া ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। পায়ের খড়ম তুলে বাবা সেদিন কী মারই না মারল দাদাকে! দাদার মাথার এক জায়গার চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। ঠিক তার দুদিন পরেই দাদা নিরুদ্দেশ হয়।

আজ নীলু চিন্তা করে, কেবল নীলু কেন, তার বাবা মা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও গাঁয়ের পাঁচটা মানুষেরও ঐ একই ধারণা, বাবার খড়মের বাড়ি খেয়ে হিমাদ্রি দুঃখে অপমানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বলেই না জীবনে সে এমন উন্নতি করতে পারল। শ্যামনগরে পড়ে থাকলে আজ ঐ ছেলে কী করত কে জানে! হয়তো কিছুই করতে পারত না। কথাটা সবচেয়ে বেশি শোনা যায় বাবার মুখে। বিশেষ করে নীলু সম্পর্কে বাবা যখন মুখ খোলে। নীলুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাবা বড়ছেলের যে কত প্রশংসা করে। ভিতরে তেজ না থাকলে ঘেন্না না থাকলে সে আবার মানুষ নাকি! তেজ ঘেন্না সাহস পরিশ্রম—এসব হল পুরুষকারের লক্ষণ। দাদাকে অবশ্য বাবা খুবই ভালবাসে, হয়তো জীবনে একদিনই দাদার গায়ে বাবা হাত তুলেছিল। দাদার মতন ভালবাসা বাবার কাছ থেকে নীলু কোনদিনও পায় নি। নীলু মা-র প্রিয়। বম্বে গিয়ে দাদাকে প্রথম দুতিন বছর খুবই কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। দাদাকে দেখে এক ভদ্রলোকের খুব মায়া হয়। দেখতে শুনতে দাদা বরাবরই সুন্দর তো, তেমনি বুদ্ধি-উজ্জল ছটফটে চেহারা। ভদ্রলোক খুব ভাল ক্যামেরাম্যান। বোম্বে শহরে তার একটা স্টুডিও ছিল। এ স্টুডিওতে

দাদা প্রথম চাকরি নেয়। তখন দাদা ফটোগ্রাফির কাজ কিছুই জানত না। খদ্দের দোকানে এলে তাদের অভ্যর্থনা করে বসানো, চেয়ারটা বেঞ্চিটা এগিয়ে দেওয়া, ক্যামেরাটা এখান থেকে ওখানে নেওয়া, ডার্করুমের পর্দা খাটানো কি পর্দা গুটিয়ে নেওয়া—এসবই দাদাকে করতে হত। পরে অবশ্য ঐ স্টুডিওতে থেকে দাদা ক্যামেরার কাজটা শিখে নেয়। তারপর এই ফিল্ম কোম্পানি সেই ফিল্ম কোম্পানিতে ঢোকার চেষ্টা আরম্ভ করে। এসব কথা দাদা তখন বাড়িতে কাউকেই লিখত না। বম্বে যাবার দু-মাস পরে, নীলুর কাছে প্রথম ছোট্ট একটা চিঠি দেয়। আমি বম্বে শহরে একটা চাকরি পেয়েছি। আমি ভাল আছি। আমার জন্য তোরা চিন্তা করবি না। ব্যস্ এই পর্যন্ত। চিঠি পেয়ে মা ও বাবা নিশ্চিন্ত হয়। তখন আর তারা কান্নাকাটি করত না। মা অবশ্য কোনদিনই খুব একটা কান্নাকাটি করে নি। কাঁদত বাবা। কাঁদত আর চুপচাপ একলা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। বাবার সেদিনের চেহারাটা আজও নীলুর খুব মনে পড়ে।

হুঁ, নীলুর কাছে লেখা হিমুর প্রথম চিঠি পেয়ে বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেল। আমি জানি, আমি জানতাম, আমার হিমু একটা কিছু করছে। তেজ করে অভিমান করে খামকা সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় নি। একটা কিছু করবে বলেই সে এভাবে চলে গিয়েছিল। বম্বে শহরের মতন একটা অচেনা অজানা জায়গায় এত কম বয়সে একটি ছেলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে—তা চাট্টিখানি কথা নয়। এই ছেলে জীবনে উন্নতি করবে আমি বলে রাখলাম।

॥ ৩ ॥

অধর চক্রবর্তীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। হিমু উন্নতি করেছে। উন্নতি বললে যথেষ্ট হয় না। টাকাপয়সা অনেকেই রোজগার করে। রোজগারের পরিমাণটা কি সেটা দেখতে হবে তো। না, তা-ও সবটা নয়—উন্নতি বলতে আরও কিছু বোঝায়। এই কাগজে সেই কাগজে হিমুর নাম বেরোচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে। কাজেই এই ছেলেকে নিয়ে অধর চক্রবর্তী গর্ব করবে না তো কাকে নিয়ে করবে। এটাকে যদি উন্নতি না বলা হয় তো উন্নতি বলতে আর কী বোঝায়, চক্রবর্তীর তা জানা নেই। উঠতে বসতে বাবার মুখে এই সব কথা।

নিভাননী কিন্তু বড়ছেলে সম্পর্কে ততটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারছে না। তার একটা কারণ আছে। অধর চক্রবর্তীর মতন বাইরের লোকের চোখেও

নীলুর দাদা একটা সাঙ্ঘাতিক মানুষ। মাসিক হাজার টাকার ওপর যার উপার্জন এই বয়সেই। এত যার নাম-ডাক। কিন্তু নাম-ডাক দিয়ে নিভাননী করবে কি॰!

আজ পর্যন্ত বাড়িতে একটা পয়সা পাঠাল না ছেলে। বাপ বুড়ো হয়েছে! আজ বাদে কাল রিটায়ার করবে। ব্যাঙ্কে কিছু জমানো পয়সা নেই। মাগগীগণ্ডার বাজার কোনরকমে দুবেলা ডাল-ভাত খেয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। এই অবস্থায়—

মা-র কথা মতন আগে আগে টাকার জন্য নীলু তার দাদাকে দু-একটা চিঠি যে না লিখেছে তা নয়। উত্তরে হিমু জানিয়েছে বম্বে শহরে থাকা-খাওয়ার খরচ খুব বেশি। তা ছাড়া সর্বদা সিনেমা লাইনে ঘোরাঘুরি করতে হয়। পোশাক-আসাক বাবদও তার অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। মনিঅর্ডার করে বাড়িতে টাকা পাঠাবার মতন অবস্থা তার এখনও হয় নি। ভবিষ্যতে যদি সে-রকম অবস্থা হয় নিশ্চয়ই সে পাঠাবে। দুটো চিঠিতে হিমু ঠিক একই উত্তর দিয়েছে। নীলুর দোকানের জন্য কিশোরীর কাছ থেকে ঋণ করার পর কিশোরী যখন টাকার জন্য তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছিল তখন আর একবার মা-র কথা মতন নীলু টাকার জন্য দাদাকে লিখেছিল। হিমু সেই চিঠির কোন জবাবই দেয় নি।

নিভাননী রেগে গিয়ে অধর চক্রবর্তীকে নিজের হাতে চিঠি লিখতে বলে। অধর রাজী হয়নি। তোমরা কেবল টাকা টাকা করছ—ওর সুখ-সুবিধেটা মোটেই দেখছ না। বিদেশে আছে। হয়তো হোটেলে মেসে থেকে খেতে হয়। বা একটা চাকর-চাকরাণী রাখতে হয়েছে ভাত রেঁধে খাওয়াবার জন্য। বিশেষ করে সিনেমার লাইনে আছে। জামা-কাপড়ের দিক থেকে ছোঁড়াকে ফিটফাট থাকতে হয়—তা ছাড়া একটা বড় শহরে বাস করতে গেলেই নানারকম বাড়তি খরচ। এসব তোমাদের বিবেচনা করতে হবে। আগে তাকে দাঁড়াতে হবে। সেই সুযোগ তাকে দিতে হবে আমাদের। আমি একবারও হিমাদ্রির টাকার কথা চিন্তা করি না। আমাদের যেভাবে চলছে, চলুক, আরো কিছু দিন এভাবে আমরা চালিয়ে যাব। হিমু নাম-ধাম করেছে, মদ বেশ্যায় লেপালেপি হয়ে কোথাও পড়ে নাই। পরিবারের মুখ দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে—তার এই দিকটা দেখেই কি আমাদের তুষ্ট থাকা উচিত নয়?

বাবার এসব লম্বা বক্তৃতা শুনে দু'চারদিন নীলুর মা চুপ করে থাকত। কিন্তু আবার যখন এটা-ওটার জন্য সংসারে বাড়তি টাকার দরকার পড়ত তখন আবার মা-র চেঁচামেচি আরম্ভ হত। অধর চক্রবর্তীও কিছু চুপ করে থাকত না। হিমুকে চিঠি লিখতে হয় তোমরা লেখ—আমার দ্বারা হবে না। আমি একদিন বলে

দিয়েছি। ও যদি বিয়ে করে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এখানে আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে রেখে যেত তা হলে বরং একটা কথা ছিল। একবার কেন দশবার আমি তাকে টাকার জন্য লিখতাম। বাবা—সে-সব কিছুই না, আমরা দুটো মানুষ স্রেফ ভাত খাব বলে দুদিন পর পর বম্বের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে তাকে উত্যক্ত করব এ কেমন কথা! হুঁ, ছেলে তো আছেই, আর একজন বাড়িতে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটছে না! আঙুল দিয়ে বাবা তখন নীলাদ্রিকে দেখিয়ে দিত। আমার রোজগারে তোমার কুলোচ্ছে না বুঝলাম, তুমি তোমার ঐ আদরের দুলালকে আর একবার বুঝিয়ে বলো, দুটো পয়সা এবার ঘরে আনতে শিখুক, তিনি, বি. এ. পাস করেছেন বলে আমরা কিছু উদ্ধার পেয়ে যাইনি যে তিনবেলা উনি এখানে থালা পেতে যাবেন আর গাছতলায় বসে বুলবুলির শিস শুনবেন।

নীলুর ব্যাপারে বাবা সর্বদা এমন হুল ফুটিয়ে কথা বলে। মাকে তখন একেবারে চুপ করে থাকতে হয়। আর এভাবে বম্বেতে চিঠি লিখে হিমুর কাছে টাকা চাওয়ার প্রসঙ্গটা আবার ক'দিন চাপা পড়ে যায়।

তবু নীলু দাদাকে ভালবাসে। ভীষণ ভালবাসে। দাদা আসবে। ছোট ঘরটা পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছবির মতন করে তুলল সে। ঘরের পিছনের আগাছার জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফেলল।

বাবা জানল না, অথচ তাঁরই এ-সব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হবার কথা, দু ছেলের মধ্যে হিমুকে তিনি অনেক বেশি ভালবাসেন, কিন্তু তবু মার কাছ থেকেই ক'টা টাকা চেয়ে নিয়ে সে জানালার পর্দার কাপড় একটা বেশ বড় দেখে পাপোষ ও একটা চীনামাটির ফ্লাওয়ার ভাস কিনে আনল। এই জন্য সে কাল কলকাতায় ছুটে গিয়েছিল। পর্দা পাপোষ পাওয়া যেতে পারত, কিন্তু পছন্দসই ফুলদানি এসব অঞ্চলে তুমি পাবে না। মা টাকা দিতে গাঁইগুঁই করছিল। মা-র হাতে টাকা কোথায়। তা হলেও নীলুর পীড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মা তার হাতবাক্সে জমানো সামান্য পুঁজি থেকে ক'টা টাকা নীলুর হাতে তুলে দিয়েছিল।

পর্দা কেনা হবে ফুলদানী পাপোষ কেনা হবে শুনে নিভাননী মোটেই খুশি হয় নি।

তোর দাদা ক'দিন আর বাড়ি থাকছে, একমাসের ছুটি নিয়ে তো আসছে, আবার সে তার বম্বে শহরে ফিরে যাবে। খামকা এখন এসব বাড়তি খরচ করার কী অর্থ আছে।

তা হলেও ঘরের চেহারাটা একটু ভদ্রগোছের না করলে চলে? দাদা নিশ্চয়

সেখানে খুব সাজানো-গোছানো ঘরে থাকে। নীলু হেসে উত্তর করেছিল, একমাস থাক কি পনেরো দিন থাক, যে ক'দিন দাদা বাড়িতে থাকল একটু আরামে একটু ভালভাবে দাদা থাকুক এটাই আমাদের দেখতে হবে।

নীলুর দাদাভক্তির তুলনা নেই, মা এটা ভাল করে জানে। যে জন্য এর পর মা আর বিশেষ কিছু বলেনি। গম্ভীর হয়ে ঘরের কাজকর্ম করছিল। টাকা নিয়ে নীলু কলকাতায় ট্রেন ধরতে স্টেশনে চলে গেছে। ফেরার সময় জয়দেবের দোকানে গিয়ে জয়দেবের সঙ্গে দেখা সেখা করে। জয়দেব তখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে দুজনে স্টেশনের ওভারব্রীজের কাছে গিয়ে অনেকটা সময় আড্ডা দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে দাদার বিষয় নিয়েই আলোচনা করে।

এক সময় জয়দেব হেসে বলেছিল, এবার হিমুদা বাড়ি এলে হিমুদাকে একটা বিয়ে করিয়ে দে, তবেই দেখবি মানুষটা সংসারী হবে। তা না হলে এভাবে সারা জীবন পাখা মেলে বম্বের আকাশে উড়বে আর উড়বে। বুড়ো বাপ-মার দিকে কোনদিনই তাকাবে না।

জয়দেবের কথা শুনে নীলাদ্রিও হেসেছিল, কিছু বলেনি। তবে বাবার কথাটা তার তৎক্ষণাৎ মনে পড়েছিল। হিমু কিছু বিয়ে করে তার বৌ-ছেলে-মেয়েকে আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে রেখে যায়নি যে এখনি তার কাছে টাকা চাইতে হবে। অর্থাৎ বাবার মনের ভাবটা এই, হিমু বিদেশে, একলা আছে সে সুখে থাকুক আরও নাম-ধাম করুক, তবেই আমরা সন্তুষ্ট—সিনেমার লাইনে কাজ করে প্রচুর কৃতিত্ব দেখিয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করছে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে—তার কাছ থেকে এটাই আমাদের বড় পাওয়া, এর অতিরিক্ত কিছু তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা আমাদের অন্যায়। সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে হয় নীলু করবে। তার তো আর অন্য কোন গুণ নেই, বি. এ. পাস করাটা এ-দিনে কিছু একটা গুণের সামিল নয়, অনেকটা কোট-প্যাণ্ট পরার মতন ব্যাপার। কোট-প্যাণ্ট পরে যে-কোন একটা চাকরিতে লেগে যাওয়া। কিছু পয়সা ঘরে আনা। যদু মধু রাম শ্যাম সবাই আজকাল বি. এ., এম. এ. পাস করছে।

অর্থাৎ অধর চক্রবর্তীর বক্তব্য তার বড়ছেলে হিমাদ্রি একটি প্রতিভাবান যুবক। টাকা টাকা করে তাকে উত্যক্ত করে তার প্রতিভাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করতে দেওয়া উচিত নয়। মনে মনে নীলুও তাই মেনে নিয়েছে।

এত টাকা রোজগার করেও দাদা আজ পর্যন্ত একটি পয়সা বাড়িতে পাঠাল না বলে তার মনে কোনরকম ক্ষোভ নেই হিংসা নেই। বাড়ির আর কারো কাছে চিঠি না লিখে দাদা একমাত্র তার কাছে চিঠি লেখে এতেই সে সন্তুষ্ট। ছেলেবেলার

মতন দাদা আজও তাকে ভালবাসে, বিদেশে থেকে এত নাম-ধাম করা সত্ত্বেও আদরের নীলুকে হিমু ভোলেনি এটা কম কথা!

মা-র ব্যাপারটা অন্যরকম। মা-র দিক্‌টা যে নীলু চিন্তা না করে এমন নয়। ছোটছেলের দায়-দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে অধর চক্রবর্তী রাতদিন মাথা ঘামায়। এখন নিভাননীও যদি বড়ছেলের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সারাক্ষণ চিন্তা করে, এবং ছেলের ভাবগতিক দেখে মন খারাপ করে তবে কি তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায়?

এটা কিছু গোপন নেই, বাইরের কেউ অবশ্য আজও ব্যাপারটা জানে না, তা না হলে নীলু ও তার বাবা পরদিনই জানতে পেরেছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময় দাদা মা-র সোনার হারটা চুরি করে নিয়ে যায়। ঘামাচির যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল বলে নিভাননী সেটা ক'দিন ধরে পরছিল না। খুলে নিজের হাতবাক্সের মধ্যে রেখেছিল। বাক্সে চাবি দেওয়া ছিল না। ইচ্ছে করেই মা দেয়নি। হয়তো দু-একদিন পরে হারটা আবার গলায় পরবে ভেবে তালা-চাবি দিয়ে ওটা বন্ধ করবার কথা চিন্তাই করে নি। আগেও কতবার হারটা গলা থেকে খুলে মাকে ওই হাতবাক্সের মধ্যে ফেলে রাখতে দেখেছে নীলু। নীলু দেখেছে, তার দাদা দেখেছে, বাবা দেখেছে। খুবই একটা প্রকাশ্য ব্যাপার, হাতবাক্সে না রেখে নিভাননী তার গলার হারটা তোষকের নিচে কি আলমারীর মাথায়ও রাখতে পারত। তাদের তো আর চাকর-বাকর ছিল না।

দাদা ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সকলের আগে নীলু টের পায়। দু ভাই এক বিছানায় শোয়। সকালে জেগে উঠে নীলু দেখল দাদা পাশে শুয়ে নেই। তবে বোধকরি হিমু আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে গেছে নীলু অনুমান করল। কিন্তু তখনি নীলুর চোখে পড়ল দেওয়ালের ব্র্যাকেটটা যেন খালি খালি ঠেকছে, দাদার শার্ট ট্রাউজারস গেঞ্জি লুঙ্গি কিছুই দেখছিল না সে সেখানে। তারপর নীলুর চোখে পড়ল কাঠের বেঞ্চির ওপর রাখা ফাইবারের স্যুটকেসটা নেই। দু ভাই একটা স্যুটকেস ব্যবহার করত। নীলু চেয়ে চেয়ে দেখল তার জামাকাপড়গুলি স্যুটকেস থেকে বের করে একটা পুঁটলির মতন করে বেঞ্চির এক পাশে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এবার নীলু মোটামুটি সবটা জিনিস আঁচ করতে পারল। বাবার খড়মের বাড়ি খেয়ে দুদিন ধরে দাদা কী যেন কেবল ভাবছিল। দু একবার নীলুকে বলেছিল, শিগগির কোথাও সে চলে যাবে, আর কোনদিন বাড়ি আসবে না। নীলু অবশ্য দাদার ঐ-কথার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়নি, রাগ করে অভিমান করে কোথাও চলে

ধাবার কথা বলছে দাদা, যেমন বাড়িতে অভিভাবকদের হাতে মার খেয়ে কি বকুনি খেয়ে, অনেক ছেলেই বলে। হাতে টাকাকড়ি নেই, গেলেও আর দাদা কতদূর যাবে। একবেলা দুবেলা হয়তো বাড়ি আসবে না, তারপর এক সময় ফিরতেই হবে।

সেদিন সকালেও একলা চুপ করে তাদের ছোট ঘরটায় বসে নীলু তাই ভাবছিল। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। মাকে সে কথাটা বলল। মা বাবাকে বলল। হিমুর স্যুটকেস নেই জামাকাপড় নেই। বাবা সবই শুনল। শুনে গুম হয়ে রইল। পরদিন সকালে, না, নীলুর মনে আছে দুপুরে, মা বুঝি কি ভেবে হাতবাক্সটা খুলেছিল। হারটা গলায় পরতে কি আর মা বাক্স খুলেছিল? মা-র মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু নিলে না, অথচ হিমু বাক্স ভরে তার জামাকাপড় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। হাতবাক্স খুলে মা দেখল হারটা নেই। তখুনি মা বুঝল হিমুর কাজ। ঐ হার চুরি করে ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। শুনে বাবা চুপ করে রইল। এই হার আজকের নয়। অধর চক্রবর্তী নিভাননীকে ওটা গড়িয়ে দেয়নি। বিয়ের সময় নিভাননী তার বাবার কাছ থেকে আড়াই ভরির সোনার হারখানা উপহার পেয়েছিল। হারটা চুরি যাওয়ায় মা খুব ব্যথা পেল।

বাবা কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিচ্ছিল না। হারের শোকের চেয়ে ছেলের অন্তর্ধানই তাঁকে বিচলিত করছিল বেশি।

তাবলে কি হিমুর জন্যে নিভাননীর মন কাঁদছিল না! কাঁদছিল, নীলু তার মাকে দেখে যেমন বুঝত, কিন্তু দুঃখের সেই কান্নার সঙ্গে একটা ঘেন্না-বিদ্বেষের ভাবও যেন মা-র মনে আস্তে আস্তে জমা হচ্ছিল। বিদ্বেষের ভাবটা পরে আরও বেড়ে গেছে। কেন না মা ততদিনে জেনে গেছে হিমু উন্নতি করছে, অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করছে—নীলুর কাছে দাদা কত চিঠি দিত মাকে সে প্রায় সবই বলত। হুঁ, কেবল নীলুর কাছেই হিমু চিঠি লেখে, মা-র কাছে এক লাইন দুলাইনও কোনদিন লেখে না। মা-র জন্য খালি, কিছু টাকা পাঠিয়ে মা যাতে একটা হার গড়িয়ে নিতে পারে এমন কথা কি একবারও হিমুর মনে উঁকি দিচ্ছে না? মা-র মনের ভাব নীলু বুঝত। যে জন্য একবার দুবার দাদার কাছে চিঠিতে কথাটা সে উল্লেখও করেছিল। কিন্তু হিমাদ্রি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছে। পরে বাবা ও মা-র মধ্যে ঐ হার নিয়ে যখনই কথা উঠত বাবা হাসত, হেসে মাছি তাড়ানোর মতন জিনিসটা উড়িয়ে দিত। যেন মা-র গলায় হার থাকাটা কিছুই নয়। মা-র গলা শূন্য থাকলেও তেমন কিছু এসে যায় না। বরং হিমাদ্রি যে ওটা কাজে লাগিয়েছে। বাবা অনেকদিনই মাকে বুঝিয়েছে, তখনকার মতন এটাকে

চুরি মনে করা গেলেও আসলে কি এটা চুরি ? সেদিন হাতবাক্স থেকে জিনিসটা তুলে নিয়ে গিয়ে হিমু তার বম্বে যাওয়ার এবং সেখান থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করার একটা বড় খরচ জুগিয়েছে, কাজেই হিমু এক হিসাবে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। অধর চক্রবর্তীর পক্ষে একসঙ্গে এত টাকা ছেলের হাতে তুলে দেওয়া কোনকালেই সম্ভব হত না। এবং এভাবে বম্বে পালিয়ে না গেলে আজ হিমুর অবস্থা যে কী দাঁড়াত কল্পনা করতে পার ? এমনি তো আর একজন ঘরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে চোখের ওপর দেখছ।

প্রসঙ্গটা তখন চমৎকার বাঁক নিয়ে ছোটছেলে নীলুর দিকে ঘুরে যেত, নীলু বেকার অকর্মণ্য। সাহস করে বড়ছেলে বিদেশে চলে গিয়েছিল বলে না আজ সে, ইত্যাদি ইত্যাদ…

অনেকদিন নীলাদ্রি কথাটা ভেবেছে। যদি হিমাদ্রি চিরকালের মতন নিরুদ্দেশ হত ! কোনদিন কোনদিক থেকেই আর তার খোঁজখবর পাওয়া না যেত ! গলার হারের কথা নিভাননীর মনে পড়ত কী ? ছেলে আর বেঁচে নেই ভেবে অধর চক্রবর্তী শোকে পাগল-টাগল হয়ে মরে যেত কিনা বলা যায় না, হয়তো মরে যেত, হয়তো আজও বেঁচে থেকে হাউ হাউ করে কাঁদত, কিন্তু 'হার' শব্দটা নিভাননীর মুখ থেকে ভুলেও উচ্চারিত হত না। পুত্রশোক ছাপিয়ে হারের শোক নিশ্চয় কোন মা-র মনে মাথাচাড়া দিতে পারে না। কিন্তু তা যখন হয়নি, বরং এখানে উল্টোটাই ঘটেছে, হিমাদ্রি সুখী, হিমাদ্রি সক্ষম, হিমাদ্রি উপার্জনশীল, সেই অবস্থায়—

বাগান সাফ করতে করতে সারাটা সকাল নীলু ছবিটা কল্পনা করেছে। দাদা যখন বাড়িতে ঢুকবে, যখন মা-র সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, মা-র শূন্য গলার দিকে যখন তার চোখ পড়বে—হারের কথাটা কি একবারও তার মনে পড়বে না ? যদি মনে পড়ে, দাদার চেহারাটা তখন কেমন দাঁড়াবে ? আর মা ? এতদিন পর ছেলেকে দেখে কি আনন্দে কেঁদে ফেলবে, নাকি হাসবে, নাকি গম্ভীর, থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ? ছবিটা কিছুতেই পরিষ্কার করে ভাবতে পারছিল না নীলাদ্রি। যে জন্য ভিতরে ভিতরে সে ছটফট করছিল। তার নিজের দিক থেকে সে ঠিক আছে। ছেলেবেলায়ও হিমু তার দাদা ছিল, আজও সেই দাদা রয়ে গেছে, বাবাকেও বোঝা যাচ্ছে। একদিন রাগের মাথায় ছেলেকে পায়ের খড়ম তুলে মারধোর করাটা কিছু না, অধর চক্রবর্তীর চোখে হিমু ছ-সাত বছর আগে যেমন ছিল আজও তাই থাকবে চোখ বুজে বলা যায়। কথাটা হচ্ছে মাকে নিয়ে—মা-র মুখটা ভাবতে গিয়ে দাদার মুখটাও নীলু বার বার আঁকতে চাইছিল ; হুঁ, দুজনের

সম্পর্কটা কেমন দাঁড়াবে—ছবিটা কিছুতেই ফোটাতে পারছিল না সে, বার বার কেমন হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছিল।

হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দাদা বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সব কেমন জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। আশ্বিনের আকাশের মতন ফটফট করতে লাগল মা-র মুখ দাদার মুখ।

যেন হিমাদ্রিভূষণ বম্বের একটা নাম-করা ফিল্ম কোম্পানীর বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান নয়। সেই ছ' বছর আগের, না আরও আগের, মা যখন নিজের হাতে জামাকাপড় পরিয়ে দিত, সেই ছোটবেলার হিমু আবার মা-র সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুধে দাঁত বের করে ফিক ফিক হাসছে। যেন এতক্ষণ খেলাধুলো করে বাইরে কাটিয়ে ঘরে এল! এখন তাকে খেতে দিতে হবে। ক্ষিদে পেয়েছে। মা আমি খাব! দাদার গলায় সেই আবদার। মা-র চোখে সেই টলটলে স্নেহ। সেই হাসি। বাৎসল্যের অপরূপ মাধুরী। দেখে নীলু অবাক।

হুঁ, খাবি, জামাকাপড় ছেড়ে চান টান করে নে। ইস, কত বেলা হয়ে গেল রে বাড়ি পৌঁছতে। নিভাননী অধীর হয়ে উঠল।

—বম্বে মেল যা লেট করে এল মা আজ হাওড়ায়! মা-র সামনে ধপ করে বেতের মোড়াটায় বসে পড়ে দাদা পায়ের জুতোমোজা খুলল। গলার টাই খুলল। একটানে শার্টটা খুলে ফেলল। তারপর ঘামে ভেজা ফিনফিনে নেটের গেঞ্জি।

—আমি আগের চেয়ে অনেক ফরসা হয়েছি, না মা।

—হুঁ। ওখানকার জলটা বোধহয় ভাল।

—ভাল, খুব ভাল। খুশি চোখে হিমাদ্রি নিজের খোলা শরীরের ওপর চোখ বুলোল। তারপর হেসে বলল, একটু মোটাও হয়েছি, তাই না মা?

তুই মোটা হয়েছিস তোর স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, মুখ ফুটে মাকে এ-কথা বলতে নেই, সন্তানের অকল্যাণ হয়। তাই বুঝি নিভাননী অল্প হাসল। মোটা আর হয়েছিস কোথায়। আমি তো একরকমই দেখছি। রংটা সামান্য ফরসা হয়েছে এই যা।

আর কারো সঙ্গে কথা না, নীলু পাশে দাঁড়িয়ে, বাবা দাঁড়িয়ে। কেবল মা-র সঙ্গে হিমু কথা বলছে।

—রান্নাঘরের কোণার পেঁপেগাছটা তো দেখছি না মা!

—ঝড়ে ভেঙে গেছে।

—তাই বলো, রান্নাঘরের কোণার দিকে চোখ রেখে হিমু স্তব্ধ হয়ে থাকে। যেন জায়গাটা ফাঁকা দেখে হিমুর মনে কষ্ট হচ্ছে।

—নে বাবা, আর দেরি করিস নে। সেই কখন থেকে উনুনের আঁচে ভাত বসিয়ে রেখেছি। ঠাণ্ডা ভাত তুই খেতে পারিস না।

—কি রান্না করেছ শুনি? হেসে মা-র হাত থেকে তোয়ালে গামছা নিয়ে হিমু উঠে দাঁড়াল।

—তপসে মাছের ঝোল, চিংড়ি দিয়ে চালকুমড়োর ঘণ্ট, মোচার ডালনা।

—কুমড়োর ডাঁটা দিয়ে মটরের ডাল করনি কেন?

—কাল করব। কুলগাছটার নিচে চলে যা, এখন পুকুরে যেতে হবে না। নীলুকে দিয়ে বালতি করে জল তুলিয়ে রেখেছি।

কুলগাছের নিচে চার বালতি জল তুলে রেখেছিল নীলু। নীলু আশা করছিল এবার দাদা তার মুখের দিকে তাকাবে। তাকায়নি। তোয়ালে গামছা হাতে হিমু স্নান করতে চলে গেছে।

॥ ৪ ॥

একটা ভয় কাটল! আর ভাবনা নেই। নীলু নিশ্চিন্ত। দাদার অনাদর হবে না বাড়িতে। তাই তো, নিলু চিন্তা করল, মা যেন গেট-পাস দিল দাদাকে। দাদা নির্ভাবনায় হলে ঢুকে পড়ল। এখন সে ও দাদা মিলে একসঙ্গে মজা করে থিয়েটার দেখবে। এই সংসারটা তো, থিয়েটারই। একটা রঙ্গমঞ্চ। যে কদিন দাদা থাকবে দু ভাই খুব আমোদ-ফূর্তি করে কাটাতে পারবে। হিমু তো কেবল তার দাদা নয়, তার বন্ধু, সেই ছেলেবেলা থেকে। একসঙ্গে শোয়া বসা খাওয়া গল্প করা বেড়ানো।

নীলু কান পেতে শুনছিল, কত সহজ স্বাভাবিক গলায় মা তার বড়ছেলেকে এটা খা ওটা খা বলে আদর করছে। হিমুর মধ্যেও কোন আড়ষ্টতা অস্বাভাবিকতা ছিল না। গলার আওয়াজ শুনে নীলু টের পাচ্ছিল। কাল কুমড়োর ডাঁটা দিয়ে মটর ডাল করবে আর পুঁই-চিংড়ি। আমি নিজে কল্যাণপুরের হাটে গিয়ে চিংড়ি পুঁইশাক কিনে আনব।

—এতটা রাস্তা তোর গিয়ে দরকার কি, নীলু আছে না। ও তো ঘরে বসা, কাল হাটে গিয়ে মাছ-তরকারী নিয়ে আসবে।

ভাগ্যিস বাবা সেখানে উপস্থিত ছিল না। বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছে। নিভাননীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে অধর চক্রবর্তী এখনি বলত, হুঁ ঘরে বসা, কেবল থাল।

থালা ভাত গিলতে পারেন উনি, হাটে-বাজারে পাঠিয়েই কি শান্তি আছে, চোখ দুটো আকাশে রেখে ছোটবাবু জিনিস কেনেন, বেগুনে ঢেঁড়সে পোকা আছে কি দোকানী দাঁড়িপাল্লায় মেরে দিচ্ছে বাবুর সেদিকে খেয়ালই থাকে না।

—নীলুর সঙ্গে আমিও হাটে যাব। ভাতের গরাস মুখে নিয়ে হিমু কথা বলছে। যে জন্য গলার স্বরটা একটু মোটা, অস্পষ্ট। অনেকদিন গাঁয়ের হাট দেখি না।

—আচ্ছা কালকের কথা কাল হবে। এখন তুই খা দিকিনি। সবটা মাছ নিয়ে নে।

—উঁহু, এটুকু মাছ তুমি খাবে।

—আমার মাছ আছে।

—কৈ, দেখি! নীলু টের পায় হিমু মাছের বাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। ছোট ঘরে নীলু দাদার বাক্স স্যুটকেস সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছে। হোল্ড-অল খুলে দাদার বিছানাটা বের করে তক্তপোষের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। তার নিজের ময়লা সুজনি ও তেলচিটে বালিশটা নিচে মাটির ওপর নামিয়ে রাখে। ছোট ঘর থেকে রান্নাঘরের সব শোনা যায়।

—উঁহু, বাটি দেখতে হবে না। মা ধমক লাগায়। আমি বলছি আমার মাছ আছে।

—আমি দেখবই হি-হি। দুধে দাঁত বের করে হিমু হাসছে। মা চটে যায়। কী পাগল ছেলে রে বাবা। তপসে মাছ আমরা রোজ খাই, তুই কি ওখানে তপসে মাছ খাস?

মিছে কথা বলছিল মা। নীলু টিপে টিপে হাসছিল। টাকার অভাবে হপ্তায় দুদিনের বেশি মাছ আসে না। তা-ও কলকাতার বরফ-পচা ভোলা টেংরা। দশ টাকা কেজির তপসে দাদার জন্য আজ সেই মুকুন্দপুরের হাট থেকে নীলু কিনে এনেছে। ও বাড়ির কানাই গোঁসাইয়ের ছেলে তপনের সাইকেলটা নিয়ে ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে নীলু মুকুন্দপুর চলে গিয়েছিল। মাছের দাম শুনে নিভাননীর চোখ চড়কে ওঠে। অধর চক্রবর্তীও চমকে উঠেছিল। কিন্তু,মুখ ফুটে কিছু বলে নি। অন্যদিন বাড়িতে এই মাছ দেখলে আর দর শুনলে অধর চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ জানাতে নির্ঘাৎ হাঙ্গার স্ট্রাইক করত, আর সারাদিন কি বকুনিই না খেতে হত নীলুকে। কিন্তু আজ যে হিমু আসছে। ভাল মাছ দেখে অধর চক্রবর্তী খুশি। মা-র মনের ভাব খুব একটা ভাল বোঝা যায় নি। মুখ বুজে যত্ন করে মাছটা রান্না করেছে এই শুধু দেখেছে নীলু।

—আমি জানি, আমি জানতাম। বাটি থেকে মুখ তুলে হিমু সোজা হয়ে

বসেছে, নীলু কল্পনার চোখে দেখছিল। হিমুর গলায় থমথমে অভিমান : চিরকাল তুমি ঐ করেছ! আমার পাতে বাবার পাতে নীলুর পাতে সব ঢেলে দেবে—নিজের জন্য কিছুই রাখবে না।

মা হাসছে। মা-র রুপালি গলার হাসি। অনেক দিন পর নীলুর কানে আসছে। নীলু রোমাঞ্চিত।

'হুঁ, সব তোদের পাতে ঢেলে দেই—আমি খাই না, আমি না খেয়েই চল্লিশ বছর বেঁচে আছি কিনা। নিভাননী আবার হাসে।'

—বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার! হিমু রেগে গেছে। মাকে ধমকাচ্ছে :—এত খারাপ লাগে তোমার কাজ কারবার দেখলে। আমায় তিনটে মাছ না দিলে যেন তুমি শান্তি পাচ্ছিলে না, একটা তোমার জন্য রেখে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হত?

—ঠিক আছে, এখন তুই খা বাব', রাগারাগি করিস নে, ট্রেনে কি ছাই-ভস্ম কিছু খাওয়া হয়েছে, তার ওপর রাত জাগা। কাল আবার নীলুকে বলব তপসে মাছ আনতে। আমার জন্যও রাখব।

—কালও তুমি এই করবে, আমি জানি। হিমুর গলা থেকে অভিমান মরছে না। এমন ধারা করলে আমি দুদিনের বেশি থাকব না এখানে, বম্বে ফিরে যাব।

—এই ছাখো, পাগলের মতন বকছে। কী ছেলে রে আমার! নিভাননীর রুপালি গলার হাসি আর থামে না।

দাদার বাক্স-পেটরা গুছিয়ে রেখে বিছানাটা পেতে দিয়ে নীলু বড় বেতের ঝুড়িটা কাছে টেনে নিল। এখনও ওটা পরিষ্কার করা হয় নি। আয়না চিরুনি, ট্রেনে ব্যবহার করা হয়েছে দু-তিনটে ময়লা রুমাল, চামচ, কাচের গ্লাস সিগারেটের প্যাকেট কত কি যেমন তেমন করে ঠেসেঠুসে ভিতরে রাখা হয়েছে। সব টেনে টেনে বের করল নীলাদ্রি। প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার। এক এক করে সব ক'টা বাটি সে খুলে ফেলল। কোনটায় মাংসের ঝোল কোনটায় পাঁউরুটির টুকরো কোনটায় বা শুধুই ফলের খোসা। এর মধ্যেই খাবার গন্ধে একঝাঁক মাছি উড়ে এসেছে। খাবার কিছু নেই, উচ্ছিষ্ট, কিন্তু তার গন্ধই বা কম কি! আঙুর আপেল আম আনারসের খোসা—সত্যি তো ট্রেনে আর ছাইভস্ম তেমন কি খাওয়া হয়েছে। থাক না একটু মাংসের ঝোল কি দু-টুকরো পাঁউরুটি, মা-র হাতের রাঁধা তপসের ঝোল গরম ভাত তো আর পেটে পড়ে নি। বাটিগুলি এক পাশে সরিয়ে রাখল নীলু। সব ধুয়ে সাফ করতে হবে। দাদার অনুগত ভাই। ভাই বন্ধু খেলার সাথী।

দাদা খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছে। শব্দ শোনা গেল।—পান তো খাস না, সুপুরি মৌরী দেব।

—দাও, পান খাই না। আমার দাঁত দেখে বুঝতে পারছ না মা? ফকফকে দুধে দাঁত বের করে দিয়ে খোকা হাসছে। মা-র চোখে ছেলের বয়েস কোনদিনই বাড়ে না। হোক না চব্বিশ আর চুয়ান্ন, তখনও সে খোকা, হাঁটি-হাঁটি পা-পা।—এই বেলা তুমি দুটি মুখে দাও তো, সারাদিন আমার জন্য উপোস বসে আছ।

—খাব, তোকে মাথা গরম না করলেও চলবে। নীলু বোধ করি তোর বিছানা ঠিক করে দিয়েছে, শুয়ে পড় গে।

—উহুঁ আমি তোমার খাওয়া দেখব। যতক্ষণ না তুমি খেয়ে উঠবে পাশে বসে গল্প করব। তোমাকে বম্বে সিটির গল্প শোনাব। কী সুন্দর রাস্তা! কেমন ঝকঝকে ঘর বাড়ি—

—আচ্ছা তাই শোনা, পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বোস্!

দক্ষিণের হাওয়া লাগল নীলুর গায়ে। স্বাভাবিক। তার খুব ফুর্তি লাগছিল। তার খেলার সাথী যদি বাগানে ঢোকার মুখেই মালীর ধমক খেত চোখ রাঙানি খেত! নীলুর মন খারাপ লাগত না? ভীষণ লাগত। একটা সংসার মানে একটা বাগান। এক হিসেবে যেমন থিয়েটার হল, তেমনি এটাকে বাগানও বলা চলে। থিয়েটার-হলের দুজন গেট-কীপার। বাবা মা। আবার তারা এই বাগানের মালীও। একটি মালী হিমুকে সুনজরে দেখে। তাকে দিয়ে তার ভয় নেই। অধর চক্রবর্তী বড়ছেলের বেলায় উদার প্রশস্তহৃদয়। কিন্তু মা—এতকাল নীলু যা ভাবত! উহুঁ, মা আরো বেশি উদার, সহৃদয়া। নীলুর এত ভাল লাগছিল! দাদার মোজাটা সাবান কেচে পরিষ্কার করতে হবে। জুতোটা বুরুশ করতে হবে। ঝুড়ির তলায় খবরকাগজে মোড়া আরো দু-জোড়া জুতো বেরিয়ে পড়ল, নতুন একজোড়া চটি। খেলার সাথী বা বন্ধুটি যদি সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে তবে কি তার সঙ্গে খেলে সুখ পাওয়া যায়, না বেড়িয়ে? দাদা বাড়ি এসেছে, তাকে ছাড়া দাদা এক পা কোথাও নড়বে না জানা কথা, দুজনে এক-সঙ্গে এই সেদিনও গোঁসাইদের আমগাছ থেকে চুরি করে আম পেড়ে এনেছিল, পুকুরে সাঁতার কেটেছে, ঢিল ছুঁড়ে বাবুই পাখির নতুন নতুন বাসা ভেঙেছে।

—এখনি কি উনুনে আঁচ দেবে?

—বেলা আর নেই যে।

—না থাক, দুধের শিশু নেই বাড়িতে যে সন্ধ্যেসন্ধি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এই মাত্তর খেয়ে উঠলে, এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর গে।

—তুই, তুইও একটু শুয়ে নে, দু-রাত তোর চোখে ঘুম নেই, ট্রেনে কি ঘুমোনো যায়।

—বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। আমার ঘুমের অসুবিধে হয় নি।

—তাহলেও রেলগাড়ি, কী শব্দ রে বাবা!

রেলগাড়ির ঝমঝম শব্দ নীলুর কানে এল। শ্যামনগর ছেড়ে সে কোথাও যায় না। মাঝে-মধ্যে এটা ওটা কিনতে কলকাতায় যাওয়া আর বম্বে-দিল্লী যাওয়া এক কথা নয়। দূরের ট্রেনের অন্য রকম আওয়াজ। রাত দুপুরে গুমগুম করে ছোটে।

এক হাতে হিমুর ময়লা রুমাল মোজা ময়লা গেঞ্জি আর এক হাতে ঝোলের দাগ ধরা চামচ ডিশ ও টিফিন কেরিয়ারের চারটে বাটি তুলে নিয়ে নীলু তার ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যদি দাদা এসে শোয়। শোবে কি! বড় ঘরে দাদার কথা শোনা যাচ্ছে। মা যেন শুয়েছে। পান চিবোচ্ছে। দাদা পাশে বসে আছে। বম্বে সিটির গল্প করছে। টুকটুকে হলদে রোদ চালের মাথায়।

পুকুরঘাটের দিকে যেতে নীলু একবার থমকে দাঁড়ায়। বাইরের বারান্দায় বেতেরমোড়ায় বাবা। হাতে খবরের কাগজ। মুখোমুখি লোহার চেয়ারে বিপিন দত্ত না? বাবাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টার। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মাথায় টাক। অথচ বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। উঁহুঁ, অধর চক্রবর্তীর বড়-ছেলেকে বিপিন মাস্টার আগে দেখেনি। বছর তিন হল শ্যামনগরের স্কুলে চাকরি নিয়ে এসেছে।

—আমি মোদকপাড়ার কালভার্টের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুটো রিক্সা একসঙ্গে আসছে দেখে দাঁড়ালাম। বিপিন দত্ত হাসি হাসি গলায় বলছিল।

—আমি আপনাকে দেখিনি। বাবা একটু গম্ভীর।

—আমি আপনাকে দেখেছি পণ্ডিত মশাই। নেবুগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখলাম, আপনার বড়ছেলেকে দেখলাম। গাছের আড়াল না থাকলে আপনিও আমাকে দেখতে পেতেন। কৌটো থেকে নস্যি নিয়ে বিপিন দত্ত নাকে গুঁজল।—হুঁ, যা বলছিলাম, আপনার রিক্সাটা পেছনে ছিল মালপত্র নিয়ে। আমি জানতাম আপনি আজ স্কুলে ছুটি নিয়ে স্টেশনে গেছেন, বড়ছেলে বাড়ি আসবে, ছেলেকে আনতে গেছেন, বলব কি আপনার রিক্সার আগে আগে যে রিক্সাটা আসছিল, সেদিকে চোখ পড়া মাত্র আমি আকাশ থেকে পড়লাম—উহু, এ কী করে সম্ভব, এমন প্রিন্সের মতন চেহারা, ধবধব করছে গায়ের রং, আমি

আপনাকেও দেখি আপনার ছোটছেলেকেও দেখি—আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না এটি আপনার আর একটি সন্তান, বড়ছেলে, বম্বে থেকে সিনেমার ছবি তোলে, হা-হা।

—ওর মায়ের রং পেয়েছে। অধর চক্রবর্তী কাগজ থেকে মুখ তুলে খ্যাটো গলায় বলল, আমার মতন আমার ছোটছেলেও ময়লা।

—হুঁ সে তো দেখছিই, আপনার গিন্নীকে আমি দেখিনি অবিশ্যি।

—বাড়ি থেকে তিনি বড় একটা বেরোন না, সংসারের কাজকর্ম নিয়েই সারাদিন।

—ব্যস্ত। হুঁ, তা তো হবেই। বিপিন মাস্টার মাথা ঝাঁকায়। তাছাড়া আমাদের পাড়াগাঁয়ে বাড়ির মেয়েছেলেরা কোথায়ই বা বেরোবে। ঠিকই বলেছেন। না সেটা কথা নয়—আমি যা বলছিলাম, আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান—নাকি—ওদের ওপরে বোনটোন কেউ আছে? হঠাৎ সন্দিগ্ধ চোখে বিপিন অধর চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকাতে অধর জোর মাথা ঝাঁকালে।

—উহুঁ, দুটি ছেলে। মেয়ে সন্তান আমাদের হয়নি।

—খুব ভাল, দুই জোয়ান ছেলে মানে দু অক্ষোহিনী, আপনাকে পায় কে পণ্ডিতমশায়, আপনি রাজার রাজা।

—ছেলে বলতে ঐ একটি, বড়ছেলে, নাম হিমাদ্রি, ডাক নাম হিমু, ছোটটা কিছু না, একটি মেষ, গাধাও বলতে পারেন।

—না না তা কেন হবে। ছোট ছেলেও যে আপনার গ্র্যাজুয়েট। আজ হয়তো চাকরি-বাকরির সুবিধে করতে পারছে না, তাবলে কি আর চিরকাল ঘরে বসে—

—কোনদিনই কিছু করতে পারবে না ওটা। মেয়েছেলের বাড়া, সাহস নেই লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারে না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে হলে তার মাথায় বাড়ি…

—ও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, এখনো ওপরে আপনি আছেন, দাদা আছে বুঝতেই পারছেন। বিপিন দত্ত যে-কোন মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে পুকুর ঘাটের রাস্তার দিকে তাকাতে পারে চিন্তা করে নীলু অপরাজিতা ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াল।—হুঁ, যে কথা বলছিলাম। নতুন করে শ্যামনগর হাইস্কুলের অঙ্কের টিচার কথাটা তোলে: আগের রিক্সাটার দিকে চোখ পড়তে আমি এত বেশি অবাক হলাম পণ্ডিত মশায়—হঠাৎ যেন মনে খটকা লাগল, ভাবলাম, তবে কি রিক্সার মানুষটি অন্য কেউ, অধরবাবুর বড়ছেলে কি পেছনে আসছে—

অধর চক্রবর্তী শব্দ করে হাসল।

—অনেকেই এই ভুলটা করে দত্তবাবু, এমন সুপুরুষ, এমন দিব্যকান্তি চেহারার মানুষ এ-বাড়ির ছেলে হয় কি করে, যেখানে তার ছোটভাইটা একটা নেংটি ইঁদুরের মতন দেখতে, যেখানে আমি অধর চক্রবর্তীর এই রোগা খিটখিটে বিচ্ছিরি হাঁপানি রুগীর মতন একটা চেহারা, হুঁ, যারা আমার স্ত্রীকে দেখেনি তারা বিশ্বাসই করতে পারে না হিমাদ্রি আমাদের বড়ছেলে।

চুপ থেকে বিপিন মাস্টার আর এক টিপ নস্যি নিল। পকেট থেকে ময়লা রুমাল তুলে ঘটা করে নাক মুছল। এদিক ওদিক দুবার তাকাল। যেন ইতস্তত করছিল আবার কিছু বলতে। তারপর সরাসরি পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে তাকাল: তাই, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এটি অধর পণ্ডিতের ছেলে, এই বাড়িতে কিছুতেই এমন চমৎকার চেহারার মানুষটাকে মানায় না।

—তা কি করে মানাবে, এই তো আমার ঘর-দুয়ারের চেহারা, ভাঙা বেড়া ফুটো চাল, তেমনি আমাদের পোশাক-আশাক, আমার আর ওই মেয়টার, যেটার কথা একটু আগে বললাম, ছোটছেলেটার, কেউ কি দেখলে বলবে হিমাদ্রির আপন ভাই ও? কেউ না। ঠিকই বলেছেন, এ-বাড়িতে আমার হিমুকে মানায় না। তা খুব বেশিদিন সে এখানে থাকছেও না। মোটে একমাসের ছুটি, তা-ও ধরুন যেতে আসতে রাস্তায়ই দেড়দিন করে তিন দিন কেটে যাচ্ছে।

নীলুর এত ভাল লাগছিল শুনতে! এ-বাড়িতে হিমাদ্রিকে মানায় না। অথচ এ-বাড়ির একটা বড় তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে নিভাননীর সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে সে। অবেলায় ভাত খেয়ে উঠে নিভাননী তক্তপোষের ছেঁড়া মাদুরটায় গা এলিয়ে দিয়ে আলস্যের হাই তুলছে পান চিবোচ্ছে আর রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনার মতন ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে বসে শহরের গল্প শুনছে বড়খোকার মুখ থেকে।

—কত বড় হোটেলে থাকে, অধর চক্রবর্তী হাত নেড়ে বলছিল, দৈনিক কুড়ি টাকা চার্জ দিতে হয়। তবে হ্যাঁ, রাজার হালেই থাকতে পারা যায় সেসব জায়গায় যেমন পয়সা তেমন আরাম, দুবেলা রাজসিক খাওয়া, দুবেলা জলখাবার, ডাকের মাথায় চাকর-বাকর হাজির হয়, আমার ছোটছেলের কাছে চিঠিতে সবই লেখে হিমু, আমি শুনি।

—খুবই খুশি হলাম খুবই তৃপ্তি পেলাম শুনে। বিপিন মাস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তা এত রোজগার করছে, আরামে থাকবেই না বা কেন।

—একমাত্র নিজের চেষ্টায়, বাড়ি থেকে এক পয়সাও আমি পাঠাইনি, চেষ্টা উদ্যম ধৈর্য কষ্টসহিষ্ণুতা—এই গুণগুলো ছিল বলে আজ আমার হিমু বড় হয়েছে খ্যাতি পেয়েছে…

—ঐ তো, ইংরেজীতে যাকে বলে সেল্‌ফ-মেড ম্যান। ময়লা রুমালটা নাকে ঘষতে ঘষতে বিপিন দত্ত দাওয়া ছেড়ে নিচে ঘাসের ওপর নামে। নীলু পুকুরঘাটের দিকে চলে যায়।

ব্যস, আর কিছুর দরকার পড়ে না। বাগানের দু দুটো মালী হাতের মুঠোয়। হিমু খুশি। গলা ছড়িয়ে হাসে। নীলুও খুশী। মাথা গুঁজে দাদার জুতো বুরুশ করে।

—থাক, আর পালিশ করে দরকার নেই, দারুণ চকচকে হয়েছে মুখ দেখা যাচ্ছে। রঙিন সুজনি বিছানো তক্তপোষে গা এলিয়ে দেয় অধর চক্রবর্তীর বড়ছেলে। হাসে। নীলু চোখ তুলে হিমুর মুখ দেখে। তার হাতের বুরুশ তখনও চলছে।

—চকচকে জুতো পরে এখানে হাঁটবটা কোথায়? বালিশের তলা থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে দাদা সিগারেট ধরায়। নীলুর দিকে একখানা বাড়িয়ে দেয়। নে, সিগারেট খা, ওটা আর ঘষতে হবে না গাধা।

—হয়ে গেছে। বুরুশের আরও দুটো বাড়ি দিয়ে জুতোটা আনলার পায়ার কাছে ঠেলে দিয়ে নীলাদ্রি সিগারেটটা ধরায়। সেই ইস্কুলে থাকতে দু-ভাই সিগারেট খেতে শিখেছে। হিমু আগে শিখেছে। পরে নীলুকে শিখিয়েছে। সেদিনের মতন আজও সিগারেট ধরিয়ে মুখের ধোঁয়াটা একজন আর একজনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হি-হি করে হাসল। নীলুর ছোট ঘরটা এখন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

—কেন, হাঁটা যাবে না কেন, শ্যামনগরের রাস্তাঘাট কি জলে তলিয়ে গেছে? দেশলাইটা তক্তপোষের ওপর ছুঁড়ে দিল নীলু। চমৎকার মেটাল করা রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে বি. ডি. ও.।

—হুঁ, তা দিয়েছে। রিক্সা থেকে দেখলাম কাল, বুড়ো একটু কুঁজো হয়ে গেছে, যাই বলিস।

—রিটায়ার করার সময় হল যে অধর পণ্ডিতের। নীলু ফিক করে হাসল। তোর গর্ভধারিণীকে কেমন দেখছিস?

—একটু নরম হয়েছে, তা এখনো মোটামুটি ফিট আছে বলা যায়। একসঙ্গে এতটা ধোঁয়া গাল থেকে বের করে দিল হিমু।

—কেবল আমার গর্ভধারিণী কেন, তোর না ?

নীলু মাথা ঝাঁকাল।—পণ্ডিত স্বীকার করে না। রাতদিন নিভাননীকে খোঁচা দেয়, হিমাদ্রিকে তুমি গর্ভে ধরেছিলে, ঐ গাধাটাকে না, মেড়াটাকে না।

—গাধাটাকে কোথায় পেল চক্কোত্তিগিন্নী, কুড়িয়ে ? না কি চাল ফুটো করে কেউ ওপর থেকে ঘরে ছুঁড়ে দিয়েছিল ! হিমু গুজগুজ করে হাসে।

নীলু চুপ।

—তুই একদিন জিজ্ঞেস করতে পারিস, কি হে কর্তা, মা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিল, নাকি ওপর থেকে কেউ ছুঁড়ে নিভাননীর কোলে ফেলে দিয়েছিল।

হিমুর হাসি দেখে নীলু না হেসে পারে না—আমি থালা থালা ভাত খাই, অকাল-কুষ্মাণ্ড আমি মেয়েছেলের বাড়া।

—কেন, এতটা আক্রোশ কিসের তোর ওপর বুড়োর ?

—কিছু করছি না, একটা পয়সা ঘরে আনছি না। বলতে বলতে নীলু হাসছে এদিকে দুচোখ ছলছল করছে, যেন চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে অনেকদিন পর এক বন্ধুর কাছে খেলার সাথীর কাছে বাগানের বুড়ো মালীটার দুর্ব্যবহার নিয়ে নালিশ করছে।

—তোকেও কিছু রোজগার করতে হবে তার কথা কি। আমিই তো প্রচুর কামাচ্ছি। সংসারে সবাই সব কিছু করতে আসে না। সব কাজের জন্য সবাই না, পাল্টা ধমক দিতে পারিস না বুড়োকে ? হিমু আর হাসছিল না।

জোরে জোরে টেনে নীলুর সিগারেট এর মধ্যেই শেষ। দাদার দিকে হাত বাড়ায়।

—আর আছে ?

—আছে না মানে ! সুটকেসটা খুলে ছাখ। হিমু বালিসের তলা থেকে চাবির গোছা ছুঁড়ে দেয়। নীলু সুটকেস খুলে নতুন প্যাকেট বার করে।

—আঃ ফিলটারড উইলস, কী চমৎকার গন্ধরে হিমু ! নাকের কাছে বাক্সটা তুলে নীলু শোঁকে।

—সেই যে ইস্কুলের পেছনে হীরু মুদীর দোকানে ঢুকে টিফিনের ঘণ্টায় দুজনে লুকিয়ে চারমিনার খেতাম ! মনে আছে ?

নতুন প্যাকেট থেকে সিটারেট বের করে নীলু মুখে গুঁজল।

—মনে আছে, ক' বছরের কথা ! সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে দুটো টান দিয়ে নীলু গাল থেকে চাকা চাকা ধোঁয়া ছাড়ে। অল্পবয়সে কু-অভ্যাস করেই তো মরেছি হিমু, এখন বিড়ির পয়সা জোটে না।

—আমি যদ্দিন বাড়ি আছি প্রাণভরে উইলস খেয়ে যা।

—হুঁ, তা তো খাবই, তোর সিগারেটে ভাগ বসাব বলে না তোর এত কাজ করে দিচ্ছি। নীলু এবার হি-হি করে হাসল। কেমন? ঘরটা চমৎকার গুছিয়েছি না? দারুণ পরিষ্কার করেছি। এই এত জঞ্জাল জমে ছিল।

—ওয়াণ্ডারফুল! হিমু থুতনি নাচায়। চোখ বড় করে চারদিকে তাকায়। কেরাসিন কাঠের টেবিলের ওপর ফুলদানী বসিয়ে নীলু ওয়াটার লিলি গুঁজে দিয়েছে। সিগারেটের গন্ধ ছাপিয়ে লিলির গন্ধ নাকে ঢুকছে।

—বাড়িতে পা না দিতেই মা যে তোকে এত আদর করছে—খুশি খুশি চোখ করে নীলু দাদার মুখ দেখে, আমার এত ভাল লাগছিল তখন।

—তুই বুড়োকে বলবি ; দাদা রোজগার করছে, তুমি রোজগার করছ, আমাকে এখনই রোজগারে না নামলে চলবে।

—তা কি শোনে! নীলু বড় বড় দুটো শ্বাস ফেলল। ঘরের খুঁটি বদলাতে হবে। চাল ফুটো হয়ে গেছে। জল পড়ে আজই টিন পাল্টানো দরকার। বাজারে চাউল তেল ডালের দর রোজ আকাশে চড়ছে। ইস্কুলের মাইনেয় পণ্ডিত কুলোতে পারছে না। এক দমে নীলু বলে শেষ করল।

—ছেড়ে দে, নাকের ডগা কুঁচকে হিমু মাথা ঝাঁকিয়ে নতুন সিগারেট ধরাল। তা বলে এখনি তোকে ঘানি টানতে হবে এর কোন মানে হয়? কী এমন বয়েসটা তোর। এখন হল ওড়ার সময়, ফুর্তি করার বয়েস। ঠিক কিনা?

হিমুর চোখে চোখ রেখে নীলু মুচকি হাসে। পাড়াগাঁয়ে আর ফুর্তি করব কোথায়!

—তোর যেমন কথা! হিমু ভেংচি কাটল। ফুর্তি করতে জানলে সব জায়গায় ফুর্তি করা যায়।

—বাড়ি থেকে বেরোতেই এক এক সময় লজ্জা করে। হঠাৎ বেড়ার দিকে চোখ তুলে দিল নীলু।

—কেন! আকাশ থেকে পড়ল হিমু। তবে যে দেখছি পণ্ডিতের কথাই ঠিক। লজ্জা! তুই কি আসলেও মেয়েমানুষ হয়ে গেছিস!

—মেয়ে কি ছেলে এখনি দেখিয়ে দেব? ভাইয়ের দিকে নীলু চোখ ফেরায়।

—থাক, অনেক দেখা হয়েছে, গোঁসাইদের পুকুরে ন্যাংটো হয়ে দুজনে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কম শালুক তুলেছি!

—তবে আর কি। নীলু গম্ভীর হয়ে হাতের সিগারেটটা জোরে জোরে টানল। তারপর এক সময় হিমুর চোখে চোখ রেখে কেমন করে হাসল—একটা

মোটে শার্ট, তাও পিঠের দিকে দু জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, চটিটার এমন দশা হয়েছে না! কিন্তু করবটা কি। ওটা পরেই রাস্তায় বেরোতে হয়।

—অ, তাই বাড়ি থেকে বেরোতে লজ্জা! হিমু তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে চুক চুক শব্দ করল।—বেশ, আমার একটা শার্ট নিয়ে নে। আধ ডজন শার্ট বাক্সে পড়ে আছে।

—তোর জামা আমার গায়ে লাগবে? খুশি হয়ে নীলু বাক্সের দিকে হাত বাড়ায়।

—লাগালেই লাগে, একটু মুটিয়ে গেছি, তুই এখনো সেই নেংটি ইঁদুর—একটু ঢিলে হবে আর কি তোর গায়ে।

—তা হোক। স্যুটকেসের ডালা খুলে নীলু ফিকে নীল রঙের একটা টেরিলিনের শার্ট বের করল। দারুণ মানাবে আমাকে।

—জুতো, জুতোর কি করবি?

—তোর চার জোড়া স্যু ঝুড়ির ভিতর রয়েছে দেখলাম। তিন জোড়া চটি।

—এক জোড়া নিয়ে নে। তোর পায়ে লাগবে?

—দেখছি! নীলু তক্ষণি হাত বাড়িয়ে ঝুড়ির ভিতর থেকে খবরকাগজে মোড়া বেণ্টের জুতোজোড়াটা টেনে বের করল। হুঁ লাগবে। জুতোর ভিতর পা গলিয়ে নীলু উঠে দাঁড়ায়। হাঁটে। একটু ঢিলে হয়েছে। তাতে অসুবিধে হবে না। বেণ্টের হুকটা এক ঘর পেছনে এঁটে দিলেই চলবে।

—ব্যস, আর ভাবনা নেই তোর এখন। হিমু নিশ্চিন্ত হল। এখন খুব করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিকে ওদিক বেড়াবি। ভাল জামা হল জুতো হল। আর চাই কি?

—হুঁ, তা হয়েছে, তুই বাড়ি না এলে কতকাল যে ছেঁড়া শার্ট ছেঁড়া জুতো পরতে হত।

—এটা হল পাখা মেলে ওড়ার বয়স, আমোদ-ফুর্তি যত খুশি করে নাও, মা বলছিল সারাদিন মুখ গোমড়া করে তুই ঘরে বসে থাকিস।

—ঐ বুড়োর জন্য, রোজ এত ভাতের খোঁটা দেয়! নীলুর চোখ আবার ছলছল করে উঠল।

—আর দেবে না, আমি এসে গেছি। হিমু সান্ত্বনা দেয়। আমি বাপধনকে বুঝিয়ে বলব।

—হুঁ, বুড়ো তোর কথা শুনবে। তোকে ভালবাসে। দোকান ফেল পড়েছে

সে কি আমার ইচ্ছেয় বল্? নার্সারি করতে গিয়ে ছাই কিছুই হল না। বাগান আগাছায় ভরে উঠল।

বাগানের দিকে চোখ রেখে হিমু হাসল।

—জঙ্গল আর দেখছি না?

—সব কেটে সাফ করেছি। তোর জন্য কম পরিশ্রম করেছি? ব্যাং পোকা সাপ জোঁক কেঁচোয় তোর চিরকাল ঘেন্না ভয় হিমু, আমি কিছুই ভুলিনি।

—না ভুলবি কেন, নে আর একটা ফিলটার খা। হিমু হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নীলুর হাতে তুলে দেয়। হুঁ, খেটেছিস আমার জন্য, মা তখন বলছিল।

—তোর অনেকগুলো রুমাল দেখলাম বাক্সে? সিগারেট ধরিয়ে নীলু দাদার মুখের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল।

—তোর ক'টা দরকার নিয়ে নে। ধোঁয়ায় হিমুর চোখ দুটো হঠাৎ দেখা যাচ্ছিল না।

—একটাই যথেষ্ট। স্যুটকেসের ডালা খুলে নীলু খয়েরী চেকের ফিনফিনে একটা রুমাল তুলে নিল।

—বুঝলি, ফুর্তি করার ইচ্ছে থাকলে জঙ্গলেও ফুর্তি করা যায়। ধোঁয়া সরে গিয়ে হিমুর চক্‌চকে চোখ দুটো এখন আবার দেখা গেল। নীলুর মুখের দিকে ধরা। কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলছিল হিমু। আর এটা তো একটা গ্রাম। বেশ বড়সড়। হাইস্কুল হয়েছে, পোস্টাফিস হয়েছে। তাই না?

—হুঁ, তা হয়েছে, সিনেমা-হলও একটা শিগগিরই তৈরী হচ্ছে, বি. ডি. ও. অফিসের পাশেই জমি কেনা হয়েছে। রুমালটা ভাঁজ করে নীলু পকেটে পুরল।

—তবে আর পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ বলছিস কেন, পাখা মেলে ওড়বার ফুর্তি করার চমৎকার জায়গা এটা।

ফুর্তি ফুর্তি বলছিস, এবার নীলু মুখটা শুকিয়ে ফেলল। ফুর্তিটা করব কাদের নিয়ে, মানুষ কোথায়? এটা কি তোর বম্বে শহর পেয়েছিস?

—তোর যেমন কথা! হিমু হতাশ হল। একটু থেমে থেকে পরে থুতনি নেড়ে হাসল: ফুর্তি করার মানুষ খুঁজে নিতে হয়। বলছি কি তোকে, জঙ্গলে থাকলেও আমার ফুর্তি করার মানুষ ঠিক জুটে যেত। তোর মতন সারাদিন মুখ বেজার করে থেকে আয়ুর বারোটা বাজাতাম না।

—ফুর্তি না করলে আয়ু কমে যায়? নীলু চমকে উঠে দাদার মুখ দেখল।

—নিশ্চয়। শিয়রের বালিশটা কোলের কাছে টেনে নিল হিমু। আনন্দ না করলে মানুষ ক'দিন বাঁচে বল?

নীলাদ্রি চুপ করে রইল।

হিমাদ্রি চুপ করল না। তার চোখের মণি আবার চক্‌-চক্‌ করে উঠল।

—বলাছস মানুষ নেই, আমার ঠিক মনে আছে পালপাড়ায় গুচ্ছের মেয়ে ছিল, রাণী টুনি নীরা মীরা—আমাদের ইস্কুলের পেছনে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির শান্তি সুধা ছিল, খালধারে সতীশ পাকড়াশীর বাড়ির দু বোন বুটকি ছুটকি—আছে না ওরা এখনো? বামুনপাড়ার কুমুদ কোবরেজের মেয়ে ইরা হীরা—ওরা সব গেল কোথায়? সাধন মোক্তারের বোন সুনীতি?

—ওরা কি আজও বাড়িতে বসে আছে! যেন নীলু অনেক দুঃখে হাসল। বিয়ে-টিয়ে হয়ে সব একাকার।

—ওরা না হয় একাকার হল, বরের ঘর পেয়ে সব উড়াল দিল। কিন্তু তার পরের ধাপ? নিশ্চয় অ্যাদ্দিনে এরাও বড়-টড় হয়েছে, ডাগর হয়েছে, হয়নি? নীরার ছোট মণ্টি ছিল ইরার ছোট কুমকুম ছিল সুনীতির ছোট সুধা ছিল। ছিল না?

দাদার চোখে চোখ রেখে নীলু মাথা নাড়ল। আমার চোখে পড়েনি। আমি যেন কাউকেই দেখছি না।

—চোখ থাকলে ঠিক তোর চোখে পড়ত। চোখ বুজে মুখ কালো করে ঘরে বসে থাকলে কি করে আর কাকে চোখে পড়বে।

—তা ছাড়া বেকার মানুষ—নীলু বলতে আরম্ভ করেছিল। হিমু ধমক লাগাল।

—ভ্যাট্‌, বেকার-সাকার ওরা দেখে নাকি, পুরুষ পুরুষ, এটাই তোর পরিচয়।

—তা ছাড়া তুই যেমন সুপুরুষ, সাহেবদের মতন ধব-ধব করছে গায়ের রং, আমার তো তা নেই, কেলেকুচ্ছিত মানুষ। করুণ চোখ করে নীলু দাদার মুখটা দেখল।

—বেটাছেলের গায়ের রং ধুয়ে মেয়েরা জল খায় না। ওরা দেখে তার মন, মেজাজ, মানুষটা ফুর্তিবাজ কি না—হিমু গম-গম করে বলে শেষ করল।

—তা ছাড়া ছেঁড়া শার্ট গায়ে ছেঁড়া জুতো পায়ে, নীলু ঢোঁক গিলে বলল, তাকাবার ইচ্ছে থাকলেও কোন মেয়ে এতকাল আমার দিকে তাকায়নি।

—এবার তাকাবে। হিমু হি-হি করে হাসল। চক্‌চকে চোখ মেলে ছোট ভাইয়ের পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা দুবার দেখল। হুঁ, দারুণ মানিয়েছে টেরিলিনের শার্টটায়, পায়ে ছাব্বিশ টাকার জুতো, পকেটে সিল্কের রুমাল, একটু গন্ধ মেখে নে, ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিস।

—সত্যি, দাদা, তুই বাড়ি না এলে আমি ঠিক মরে যেতাম, বাবা রোজ যেমন করে না ভাতের খোঁটা দেয়, অকর্মার ঢেঁকি, অকাল-কুষ্মাণ্ড, নিভাননীর পেটে আমি জন্মাইনি, আস্তাকুঁড়ে আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিল।

—সব ঝেড়ে ফেল, এত সব কথা গায়ে মাখলে চলে বোকা! হিমু সাহস দেয়। আমি এসে গেছি, আর তোর ভাবনা নেই, আমি বুড়োকে বুঝিয়ে বলব।

॥ ৫ ॥

আর তার ভাবনা নেই। দাদা এসে গেছে, তার খেলার সাথী তার বন্ধু। বন্ধুটি বম্বে শহরে থেকে দারুণ দিলখোলা মানুষ হয়ে গেছে। যত খুশি ফিলটার টিপ্‌ড খেয়ে যা। তোর যদি আরো জামা লাগে আমি দেব, মোটে একজোড়া জুতো? দরকার হলে আর এক জোড়া নে। চটি বা পাম্পশু, যা খুশি। রুমাল? দু পকেটে দুটো রুমাল রাখবি। নীলুর যে কী ভাল লাগছিল!

দুপুরটা আজ আবার মেঘলা গেছে। সকালটা মোটামুটি ভাল ছিল। নীলুর সঙ্গে হিমু তখন বাজারে গেছে। উঁহু, অধর পণ্ডিতের দু টাকা হিমু ছোঁয়নি। নিজের পকেট থেকে দশ টাকার দুটো নোট বের করে ইলিশ মাছ কিনে নীলাদ্রির হাতে ঝোলানো থলেতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর আবার বারো টাকা কেজির গলদা চিংড়ি কিনেছে। তারপর আলু পটল বেগুন কুমড়ো। তারপর পাঁচ টাকা কেজির মিষ্টি দই। আট টাকা কেজির সন্দেশ। নীলু কি আর একলা এত বোঝা বইতে পারে। কাজেই সাইকেল-রিক্সা ডাক। দু ভাই রিক্সায় চেপে এত বাজার নিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরেছে। রাস্তার মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে বাড়ি এসেছে। কত টাকার বাজার করল ত্যাখো! মস্ত বড়মানুষ হয়েছে যে।

দেখে নিভাননীর দু চোখ কপালে উঠল।

—ডাকাত ছেলে! বাজারের নমুনা দেখে নিভাননী বুঝতে পারল হিমু দু হাতে খরচ করে এসেছে। একদিনে এত মাছ?

দুধদাঁত বের করে হিমু হাসছিল।

—তুমি সব মাছ আমাদের দিয়ে দাও। নিজের জন্য এইটুকুন রাখ না। এই কষ্ট সহ্য করা যায়! আজ যদি তুমি—

—না না, আজ আর ফাঁকি দেব কেন, এত মাছ এনেছিস, ঠিক খাব আমি নিভাননীর মুখে হাসি ধরছিল না।

—সরষে দিয়ে ইলিশ পাতুরি করবে মা।

—হুঁ, তাই করব। তুই যেমন বলবি করব।

—আর চিংড়ির মালাইকারী।

—বেশ আমি রান্না করব, তুই বসে দেখবি।

তাই দেখত না দু ভাই! খাল থেকে গামছা ছেঁকে দুটিতে কুঁচো চিংড়ি ধরে নিয়ে এসেছে। আর জঙ্গল থেকে এত কচুশাক। হাতের শাঁখা নেড়ে নিভাননী কচু-চিংড়ি রান্না করত। নীলু হিমু পাশে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করত, মা-র রান্না দেখত। রান্নার চমৎকার গন্ধে বাড়ির বাতাস তখন থৈথৈ।

—আজ আর কুঁচো চিংড়ি কেন?

হিমু এত উপায় করে! ব্যাগ ভরে টাকা এনেছে বম্বে শহর থেকে।

আজ গলদা চিংড়ি। গঙ্গার ইলিশ।

দিন বদলে গেছে।

কিন্তু হিমু সেই খোকা থেকে গেছে, যেমন নিভাননী সেই মা থেকে গেছে। কেবল অধর পণ্ডিত আগের চেয়ে অনেক বেশি খিটখিটে হয়েছে। আর কুঁজো হয়েছে কিছুটা।

তা কি হত! হয়েছে গাধাটার জন্য ঘোড়াটার জন্য। মেয়েমানুষের বাড়া। বি. এ. পাস করে ঘোড়ার ঘাস—

কিন্তু আজ আর বুড়োর গালাগাল নীলু গ্রাহ্য করছে না। তার পিছনে দাদা আছে। দাদা তাকে অভয় দিচ্ছে। বিকেল পড়তে বাদলা কেটে গিয়ে ঝিঙে ফুলের রঙের চমৎকার হলদে রোদ উঠল। দাদার দেওয়া ফিকে নীল টেরিলিন গায়ে চড়াল নীলু, ছাব্বিশ টাকা দামের ক্রোম লেদারের জুতো পায়ে পরল। দুটো রুমালে ইভিনিং-ইন-প্যারিস ঢেলে দু পকেটে ঢোকাল। দাদার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। দাদার ট্যালকমের কৌটো উপুড় করে ঘাড়ে গলায় ছড়াল। তারপর শিস দিতে দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এমন সেজে-গুজে বাড়ি থেকে বেরোবে কতদিন স্বপ্ন দেখছিল সে। হিমু না এলে নীলুর স্বপ্ন সফল হত? কোন দিনই হত না। নীলু এখন নিশ্চিন্ত। জুতোর মশ মশ শব্দ করে পালপাড়ার রাস্তা শেষ করে খালধারের দিকে সে হাঁটছিল। কদমগাছে লাখ লাখ ফুল ফুটেছে। বৃষ্টি-ভেজা বাতাস এখন বিকেলের হলদে রোদে মুড়ির মতন মুড়মুড়ে। কদমের গন্ধে ত্রিভুবন ম ম করছে।

হুঁ, নীলু দারুণ নিশ্চিন্ত।

অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে আমুদে ছেলে, যে কিনা বম্বে গিয়ে দশজনের একজন

হয়েছে, কর্মী পুরুষ, কাগজে যার ছবি ছাপা হয়, বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা হাসছে।

এবার নির্ঘাৎ নিভাননীর শূন্য গলা ভরবে। আড়াই ভরির জায়গায় তিন ভরির সোনার হার বড়ছেলে গড়িয়ে দেবে। অধর পণ্ডিতের ঘরের চালের ফুটো ভাঙা টিন সরে গিয়ে আনকোরা নতুন উঠবে।

যেমন নীলুর গায়ে নতুন জামা উঠেছে। পায়ে নতুন জুতো। পকেটে সেণ্টমাখা রুমাল।

সত্যি নীলু নিশ্চিন্ত। শিস দিয়ে মাথা দুলিয়ে হাঁটছিল সে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দেখে এসেছে দুধের দাঁত বের করে হিমাদ্রি আদুরে গলায় নিভাননীর সঙ্গে কথা বলছে। তালের বড়া ভাজছে অধরগিন্নী। অধর পণ্ডিত কান পেতে করিৎকর্মা ছেলের গল্প শুনছে।

খালপাড়ের রাস্তা শেষ করে নীলু বাঁকের মুখের কালভার্টটা লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে গেল। তারপর রাখহরি চাটুজ্যের মস্ত আমবাগান।

মনে মনে নীলু হাসল।

আমোদ-ফুর্তি করবি, তা না হলে আয়ুর বারোটা বাজবে। দামী কথা বলেছে তার দাদা হিমাদ্রিভূষণ। গোমড়া মুখ করে ঘরে বসে থাকলে অকালমৃত্যু। কথাটা মিছা কি। বম্বে থেকে এয়ার মেইলে কত চিঠি পাঠিয়েছে হিমু তার খেলার সাথী তার ছেলেবেলার বন্ধু নীলুর কাছে। নীলু কি ভুলে গেছে। কত ফুর্তি কী সাংঘাতিক উত্তেজনার আনন্দের জীবন না এই বম্বেতে! বাড়ি ফিরে তোকে সব বলব। অ্যালবাম ভর্তি করে ছবি নিয়ে আসছি। তোকে দেখাব।

কাল রাত্তিরেই নীলুর ছোট ঘরে রঙ্গিন সুজনি পাতা বিছানায় বসে সিগারেট ধরিয়ে হিমু তার বোম্বে থেকে তুলে আনা অ্যালবামের ছবিগুলি নীলুকে দেখাত। কিন্তু তখনি নিভাননী এসে ঘরে ঢোকে। নীলু কেমন করে তার দাদার বিছানা পেতেছে কেমন করে ঘরটা গুছিয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হতে এসেছিল।

কাজেই কাল সুবিধে হয় নি। আজ রাত্তিরে হিমু তার অ্যালবাম খুলে দেখাবে। কিন্তু সে তো যেন আমার কথা, বম্বের জীবন। তুই এখানে কী করছিস হাঁদারাম। পাড়াগাঁ। বলে কিনা জঙ্গলেও মানুষ ফুর্তির খোরাক পায়। পালপাড়ায় গুচ্ছের মেয়ে ছিল না। রাণী টুনি মীরা? খালধারের বটকি ছটকি, বামুনপাড়ার ইরা মীরা, ঘোষপাড়ার শান্তি সুধা সুগতি। বিয়ে হয়ে সব একাকার? হলই বা, তার পরের ধাপ আছে না? নীরার ছোট মন্টি ইরার ছোট কুমকুম।

অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে বম্বে শহরে মেয়ে নিয়ে লেপালেপি, আর এঁদো ডোবা

পানাপুকুরে ভর্তি ধেদ্দেড়ে শ্যামনগরে কিনা ছোটভাই নীলু একা একা ঝিমোচ্ছে এ কেমন করে হয়! এটা কি ঠিক? ফুর্তি কর ভাই ফুর্তি কর।

আর এক দফা খিক খিক হেসে নিয়ে নীলাদ্রিভূষণ এবার ছোট কালভার্টটা লাফিয়ে পার হল।

রক্তমাখা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলো পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে আছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের পিছনে মেহেদীর ঝোপ ঘেঁষে চালতা গাছটা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। যেন ক'দিন নীলু আসতে পারে নি বলে চালতে গাছটা মরে গেছে, মেহেদীর ঝোপটা সরে গেছে, তা কি হয়? অধর পণ্ডিতের টিনের ঘরে বসে নীলু খামকা আতঙ্কে মরে যাচ্ছিল।

সব ঠিক আছে। বেগুনক্ষেত মেহেদীর ঝোপ মাথার ওপর কালচে সবুজ চালতে পাতার ঝুপড়ি।

আর ঐ শ্যাওলা ধরা ইটের পাঁজা। এদিকে ইটের পাঁজা। ওদিকে মেহেদীর জঙ্গল। মাথার ওপর চালতে পাতার ছাদ। যেন চমৎকার একটা ঘরের ভিতর বসে আছ তুমি। যেন ভুবন ডাক্তারের কোঠাবাড়ির একখানা ঘর। তেলাকুচো ঝোপের পিছন থেকে ভুবন ডাক্তারের পাকা ঘর উঁকি দিচ্ছে না?

তা ভুবন একতলা করে থেমে গেল কেন? স্টেশন বাজারের কাছে মস্ত সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে টালির ঘরের কত বড় ডিস্পেনসারী। সকাল-সন্ধ্যে দু বেলা মাছির মতন রোগী গিজগিজ করে। এত পয়সা কামায় ভুবন তবু দোতলা করতে পারল না। সিমেন্ট জোগাড় করতে পারছে না বুঝি! তা না হলে ডাক্তারের জমানো ইটে এত ব্যাঙের ছাতা আর শ্যাওলা গজায়।

তা এক হিসেবে ভালই হচ্ছে। ইটের গাদা না থাকলে রাস্তার মানুষ নীলুকে ঠিক দেখে ফেলত। আর, অধর পণ্ডিতের বি. এ. পাস ছেলে এমন চোরের মতন ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের কাছে বসে আছে কেন! কি করতে এসেছে ছোঁড়া এখানে। নীলু আর একবার নিজের মনে হাসল। ভুবন ডাক্তার যেন এই জীবনে দোতলা ঘর করতে না পারে। ঈশ্বর ভুবন ডাক্তার ঐ একতলার কোঠাবাড়িতে থেকে থেকে বুড়ো হোক কুঁজো হোক, তারপর চোখে ছানি নিয়ে হাঁপানির ব্যারাম পেচ্ছাপের দোষ নিয়ে একদিন মরে যাবে।

যাকগে, ইটের আড়াল এখনি কিছু সরছে না। এখনি এই নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে।

বরং অনেকটা পথ হেঁটেছ।

এই বেলা বসে একটু জিরিয়ে নাও হে নীলাদ্রি। পকেট থেকে ভাঁজ করা খবর কাগজের টুকরোটা বের করে নীলু ইটের ওপর বিছিয়ে দিল। বর্ষার ভেজা শ্যাওলায় কাপড়ে দাগ লাগবে। হিমুর দেওয়া চমৎকার জামাটাও নষ্ট হতে পারে। চিন্তা করে সাবধানী ছেলে নীলাদ্রিভূষণ কাগজখানার ওপর বসল। ভাগ্যিস অধর পণ্ডিত রোজ একখানা কাগজ রাখে। পড়া হয়ে গেলে কাগজখানা ভাঁজ করে তক্তপোষের নিচে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভিতর রেখে দেয়। তাই থেকে লুকিয়ে একটা সীট ছিঁড়ে এনেছে নীলু। বেশি আনলে বুড়ো টের পাবে। এখন টের পাবে না। সেই যখন পুরোন শিশিবোতল কাগজওয়ালা ওজন দরে কাগজ কিনতে আসবে। আগের মাসে মোট দু কেজি দশ গ্রাম কাগজ হয়েছিল। এ মাসে দু কেজি দশ গ্রাম হচ্ছে না তো। বাড়িতে ফাটাফাটি লেগে যাবে। পয়লা চোটটা গিয়ে পড়বে নিভাননীর ওপর। হ্যাঁ, নির্ঘাৎ আমার খবর কাগজ জেলে উনুন ধরানো হয়। কাগজ কম হচ্ছে কেন? আমার জমানো খবরের কাগজ সঠিক ওজনে আসছে না তো, ব্যাপারখানা কি! নিভাননী তক্ষুনি অবশ্য আঙুলের কড় গুণতে লেগে যাবে। তারপর হাসবে। এ মাস তিরিশ দিনে কাবার হয়েছে। আগের মাস গেছে একত্রিশ দিনে। এ মাসে একখানা কাগজ কম এসেছিল সেই খেয়াল আছে! চক্রবর্তী তখন ঠাণ্ডা হবে।

কিন্তু যদি এ-মাসও একত্রিশ দিনে কাবার হয়! তাই তো হয়। জুলাই আগস্ট চিরকালই একত্রিশ দিনের মাস। নিভাননী ভীষণ ফাঁপরে পড়ে যাবে। অথচ বেচারী কোনদিন ভুল করেও খবর কাগজ জেলে উনুন ধরায় না। দুখানা পাটকাঠি জেলে কাজটা সেরে নেয়। কাজেই ওজন কমে গেলে মাকে নাকানি-চোবানি খেতে হবে। চিন্তা করে গোটা কাগজখানা না এনে নীলু একখানা মোটে সীট ছিঁড়ে এনেছে। বলা যায় না, তাতেও বুড়ো টের পেয়ে যেতে পারে। পুরোন শিশি-বোতল—কাগজঅলা বাড়িতে এলে কেরোসিন কাঠের বাক্স থেকে সব কাগজ তুলে এনে যেভাবে বাইরের উঠোনে মোড়া নিয়ে বসে অধর পণ্ডিত প্রত্যেকটা কাগজের ভাঁজ খুলে খুলে পাতা গুণতে লেগে যায়—দেখলে মনে হবে বুড়ো বুঝি নিজের বুকের পাঁজরের হাড় গুণছে। অর্থাৎ কাগজ কাঁটায় তোলার আগেই চক্রবর্তী এদিকের সন্দেহটা ভেঙে নেবে।

পকেটে লুকিয়ে এক সীট কাগজ আনে নি শুধু, আর একটা জিনিস এনেছে নীলু।

না, এখনি সেটা সে বের করছে না। আগে পকেট থেকে সিগারেট ও দেশলাই বের করল। হিমুর ফিলটার টিপ্‌ড। নীলু বেড়াতে বেরোবে বলে হিমু নিজের

হাতে ছোট ভাইয়ের পকেটে প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমন চমৎকার শার্ট পরে জুতো পরে রাস্তায় বেরিয়ে তুই বিড়ি খাবি নাকি—লোকে দেখলে হাসবে যে।

লোকে দেখলে হাসবে।

ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের পাশে মেহেদী ঝোপ ও ইটের পাঁজার আড়ালে বসে নীলু তো এত দামী সিগারেট ধরিয়ে নিল তাই বা এখন দেখছে কে!

না, রাস্তায় চলতে চলতে কোনদিনই বিড়ি সিগারেট টেনে সে সুখ পায় না। এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসে আরাম করে খাওয়া তার অনেকদিনের অভ্যেস।

হালকা নীলচে ধোঁয়া ছড়িয়ে নীলু পশ্চিমের আকাশটা দেখল। রক্তমাখা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলো কালচে রং ধরেছে। একটু পরে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। ঝিঁঝিঁর ডাক বাড়ছিল। ঘাসের ওপর বেন্টের জুতো পরা পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসল নীলু। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। মাথার ওপর চালতে পাতার ঝোপের মধ্যে একটা টুনি পাখি বুঝি বাসা বেঁধেছে। কুঁই কুঁই করে টুনির ছানাটা ডাকছে।

সিগারেটটা টেনে শেষ করতে না করতে চারপাশের অন্ধকারটা জমাট বেঁধে গেল। এইবেলা নীলু উঠে দাঁড়ায়। বেগুনক্ষেতের বেড়ার একটা খুঁটি ধরে উঁকি দিয়ে ওপাশটা দেখল। তেলাকুচোর জঙ্গলে ভুবন ডাক্তারের কোঠাবাড়ির সব ক'টা জানালা ঢেকে গেছে। ক'দিনের বর্ষার জল পেয়ে তেলাকুচো লতা এত বাড়ল। যাই হোক, নীলু অবাক হল না, একটা জানালার একটুখানি আলো তার চোখে পড়েছে। হুঁ, ওটাই শুমির পড়ার ঘর।

নীলু নিশ্চিন্ত হল।

ক'দিন আসছে না সে, বলা যায় কি, হয়তো মাসির বাড়ি কি পিসির বাড়ি শুমি বেড়াতে চলে গেল, মাঝে-মধ্যে ভুবন ডাক্তারের ছোটমেয়ের রাণাঘাট, নৈহাটি বা ব্যারাকপুর বেড়িয়ে আসা চাই। কুলের দিনে কুল খেতে যাবে, আমড়ার সময় আমড়া। এখন শ্রাবণ মাস। হয়তো ব্যারাকপুর দিদির বাড়ি পেয়ারা খেতেই চলে গেল। যাকগে, শুমি—শর্মিলা বাড়ি আছে। না হলে তার পড়ার ঘরে সন্ধ্যাবাতি লাগাতে আলো জ্বালবে কেন। ইতিহাস মুখস্থ করছে মেয়ে। না কি লজিক পড়ছে।

ভুবন ডাক্তার এক নম্বরের কঞ্জুষ। কোনদিন প্রাইভেট টিউটর রাখল না শুমির জন্য। আহা, তা হলে নীলুর কত সুবিধে হত। শুমির কত সুবিধে হত।

এভাবে লুকিয়ে চোরের মতন চালতে তলার অন্ধকারে দুজনের মিলতে হত না। যে কোন সময় তোমাকে সাপে ছোবল বসাতে পারে। নীলু আর একবার অধর পণ্ডিতের করিৎকর্মা ছেলের কথা চিন্তা করে গাল ছড়িয়ে হাসল। টানা দুবছর বম্বে শহর থেকে এসে হিমুবাবু শ্যামনগরের গুচ্ছের ছুঁড়িকে মনে রেখেছে! রানী, টুনি, মীরা, বুটকি, ছুটকি, ইরা, হীরা। দারুণ প্রতিভা নীলুর অগ্রজের! নীরার ছোট মণ্টি, ইরার ছোট কুমকুম—সব মনে আছে হিমাদ্রিবাবুর।

আহা তবু যদি কোনদিন খালধারের বড় সড়ক পার হয়ে পালপাড়া পিছনে ফেলে মুখুজ্যেপাড়ার বাঁক ঘুরে দু দুটো কালভার্ট ডিঙিয়ে ভুবন ডাক্তারের বেগুন-ক্ষেতের ধারে এসে দাঁড়াত হিমু।

না, কষ্ট করে এতটা পথ সে একদিনও আসে নি। তাহলে ভুবন ডাক্তারের পরীর মতন দু মেয়ে উর্মি শুমি—উর্মিলা শর্মিলাকে আজও ঠিক মনে রাখত।

উর্মির বিয়ে হয়ে গেছে। উর্মির পরের ধাপ শুমি এখন দারুণ ডাগর মেয়ে। ক্লাস টেনে পড়ে। যার সঙ্গে নীলুর গত দু বছর ধরে ইয়ে চলেছে।

না, এত গভীর কথা অধর চক্রবর্তীর জানবার কথা নয়, নিভাননীর জানবার কথা নয়। তারা শুধু দেখছে নীলু এমন চমৎকার স্টেশনারী দোকানখানা চালাতে পারল না, তারা দেখছে নীলু তার ঘরের পিছনে নার্সারি করতে গিয়ে আগাছার জঙ্গল তৈরি করল, তারা দেখছে নীলু শ্যামনগরের মাটি কামড়ে পড়ে আছে আর কোথাও নড়তে চাইছে না। দেখছে নীলুর শুকনো মুখ ছেঁড়া জামা।

সব দেখছে একটি জিনিস ছাড়া।

নীলুর বুকের মধ্যে লুকনো একটা টকটকে লাল গোলাপ। নীলুর বুকের ভিতর লুকনো একটা রঙিন মাছ। ভুবন ডাক্তারের ছোট মেয়ে শুমি।

এখন অন্ধকার আরও গাঢ়। নিজের হাতটাও যেন দেখা যাচ্ছে না। তেলাকুচো ঝোপে ঢাকা জানালার আলোটা আরও পরিষ্কার হয়েছে। চারিদিক নিঝুম। যেন ভুবন ডাক্তারের বাড়িটাও অতিরিক্ত চুপচাপ। ডাক্তার এখনো স্টেশন বাজারের ডিসপেনসারী থেকে ফেরেনি। শুমির মা কি রান্না করছে? রান্না করার আগে মা একটু গড়িয়ে নেয়। বাচ্চাকাচ্চা তো নেই বাড়িতে যে সন্ধ্যাসন্ধি রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে হবে। আমার পড়া শেষ হতে সেই রাত দশটা। ডিসপেনসারীর দরজা বন্ধ করে বাইরের কলগুলি সেরে বাবার বাড়ি ফিরতে সেই রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা। কাজেই মা ঘুমোয়। কাজেই এটাই সবচেয়ে সুন্দর সময়। দারুণ সুযোগ।

আর এই সুযোগ ফেলে রেখে নীলু কিনা ছেঁড়া শার্ট ছেঁড়া জুতোর জন্য ক'দিন ঘর থেকেই বেরোল না।

তুমি একশ বছর বেঁচে থাক হিমু, তুমি আমার ভাই, বন্ধু, খেলার সাথী। তোমার দেওয়া শার্ট পরে জুতো পরে গন্ধ-মাখা রুমাল পকেটে নিয়ে আজ বুক ফুলিয়ে আমি আমার শুমির কাছে এসেছি—ইস্, ক'দিন মেয়ের খুব মন খারাপ গেছে এ কি আর বলতে হয়।

নীলু পকেট থেকে সেই জিনিসটা বার করল। অধর পণ্ডিতের পুরনো খবর কাগজের বাণ্ডিল থেকে চুরি করে এক সীট কাগজ পকেটে পুরে যেমন নিয়ে এসেছে, তেমনি আর একটা জিনিসও নীলু পকেটে করে এনেছে। একটা হুইস্‌ল। নীলুর সেই স্টেশনারী দোকানের মাল। দেনা শোধ করতে না পেরে পায়রাডাঙার কিশোরীর হাতে দোকানশুদ্ধ তাকে তুলে দিতে হয়েছিল। কেবল এই একটা জিনিসই নীলু সরিয়ে রেখেছিল।

এত কাজ দেয় বাঁশীটা।

ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের এপারে মেহেদী ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার ঘোর ঘোর অন্ধকারে মিশে থেকে শুমিকে—শর্মিলাকে না হলে সে ডাকত কি করে! বাঁশী। যেন ঝিঁঝি ডাকছে, যেন কির কির করে মাঠে ব্যাঙ ডাকছে। যার কান আছে কেবলই সে-ই শুনতে পায় এই সঙ্কেতের ডাক। এই ডাক শুনে শুমি হিস্ট্রি বইখানা টেবিলে খুলে ফেলে রেখে চুপি চুপি পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে সাপের ছোবল খেতে ইটের পাঁজার কাছে ছুটে আসে। আজও আসবে। খুব আস্তে করে নীলু বাঁশীতে ফুঁ দিল। কিরকিরকির। ঝিঁঝিঁর ডাক ও ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে মিশে গিয়ে শব্দটা ভাসতে ভাসতে তেলাকুচো ঝোপে ঢাকা একটা আলো-জ্বলা জানালার ভিতর ঢুকে পড়ল।

ব্যস্, আর দরকার নেই। বাঁশীটা আবার পকেটে পুরে নীলু অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশে তারা দপ্‌দপ্ করছে। দীর্ঘশ্বাসের মতন শব্দ করে চালতে পাতার ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

নীলুর বুকের মধ্যে ঢুব ঢুব করছিল। প্রতি মুহূর্তে একটা নরম পায়ের শব্দ শুনবে আশা করছে সে।

কিন্তু পায়ের শব্দ শোনার আগে আবছা ফিকে মূর্তি পা পা করে তার দিকে এগিয়ে এল।

—শুমি—ডাকতে গিয়ে নীলুর গলা আটকে গেল। পাথর হয়ে গেল সে। তার মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে।

—আমি আমি—চাপা গলায় শুমির দিদি উর্মি হাসছে। 'শুমি নেই।' নীলুর কানের কাছে মুখ এনে বলল সে।

—কোথায় গেছে শুমি? ভয় পেল নীলু। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল।

—এই শুক্রবার শুমির বিয়ে হয়ে গেল।

ঠাণ্ডা শিরশিরে বাদলা হাওয়ায় নীলু ঘামতে লাগল।

—তুমি বুঝি ক'দিন আসনি? তেমনি চাপা হেসে হিসহিস করে উর্মিলা বলল, কিছু খবর রাখ না দেখছি।

—নাঃ। বুক ভেঙে চুরমার হয়ে গেল নীলুর। কোনরকমে শব্দটা সে উচ্চারণ করল।

—খুব ভাল বিয়ে হয়েছে শুমির। এঞ্জিনিয়ার বর। আমার শ্বশুরবাড়ি ব্যারাকপুরের কাছেই ওরও শ্বশুরবাড়ি। বোস। দাঁড়িয়ে কেন?

আগুনের ফুলকির মতন দেখাচ্ছিল আকাশের তারাগুলি! নীলুর কেমন তেষ্টা পেল।

—বসব না, বেড়ার খুঁটিটা ছেড়ে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তুমি কবে এসেছ শ্বশুরবাড়ি থেকে?

—এই তো সেদিন। শুমির বিয়েতে নায়েরী হয়ে এসে আজও বাপের বাড়ি থেকে গেছি—হি-হি। উর্মিলা হাসল।

—চলি। নীলু চলে আসছিল।

—ও কি! খপ্ করে উর্মি তার হাত চেপে ধরল। শুমি নেই বলে চলে যাবে—এ কেমন কথা।

নীলু চুপ।

—শুমি আমার আপন বোন। উর্মি আবার বলল, একদিন তুমি ওর লাভার ছিলে, তুমি কি আমার পর?

—কি করব আমি শুনি? তেতো গলায় নীলু উত্তর করল, অন্ধকারে উর্মির মুখটা দেখল সে।

উর্মি কথা না বলে ঝিরঝিরে গলায় হাসল শুধু, তারপর নীলুর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল। নীলু বিরক্ত হল।

—তুমি বিবাহিত, আর একজনের স্ত্রী, ভুলে যাচ্ছ কেন? নীলু না বলে পারল না।

—ছাই কথা, হলামই বা বিবাহিত, হলামই বা আর একজনের বৌ, তা বলে একটু আমোদ-ফুর্তি করতে নেই বুঝি? বোস। যেন জোর করে নীলুকে ইটের ওপর বসিয়ে দিল উর্মি। নীলুর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল।

॥ ৬ ॥

—আমি জানি, আমি জানতাম, তুমি নিজের জন্য কিছুই রাখবে না, সব আমাকে দিয়ে দেবে, সব বাবাকে দিয়ে দেবে, নীলুকে দেবে—হিমুর গলায় থমথমে অভিমান।

নিভাননী হাসছে। নিভাননীর গলায় রুপালি হাসি। পাগল ছেলের কথা শোনো। রেখেছি, আমার জন্যও রেখেছি। তুই খা না!

—উঁহু, আমি জানি, এতগুলো তালের বড়া ভাজা হয়েছে, একটাও তুমি নিজের জন্য রাখবে না। আমাকে সব দিয়ে দেবে, বাবাকে দিয়ে দেবে, নীলুকে দেবে—

—না রে, নীলুকে কি আমি দিচ্ছি কিছু, কিছুই দিতে ইচ্ছে করছে না ওই অকর্মা ছেলেকে। জীবনে কিছুই করতে পারল না যে। কোনদিন আর পারবে কিছু? কেবল জানে খাওয়া আর ঘুম আর হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

—করবে করবে, তেমন আর কি বয়স হল ছোট ভায়ের। তালের বড়া মুখে নিয়ে বড়খোকা হাসে। নিভাননী মাথা ঝাঁকায়। অনেক হয়েছে বয়েস, ওই ছেলের মুখের দিকে আমি এখন তাকাতে পারি না, চোয়াল দুটো বেরিয়ে পড়েছে, কপালের চামড়া কুঁচকে গেল এর মধ্যেই, কই, তোকে তো আমার চোখে ওর মতন এমন বুড়ো বুড়ো ঠেকছে না, অথচ তুই কিনা ওর দেড় দু বছরের বড়।

—হি-হি, আমাকে খুব কচি কচি লাগছে, তাই না মা? দুধদাঁত বের করে হিমু ফিক-ফিক হাসছে। রান্নাঘরের পিছনে আনারস ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে নীলু। হিমুর কথা শুনছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিভাননীর ফর্সা মুখের সুন্দর হাসি নীলু দেখছে। কেন কচি কচি দেখাবে না!

নিভাননী আবার দুটো তালের বড়া বড়খোকার বাটিতে ফেলে দিল। বম্বের জলহাওয়া যে চমৎকার শুনি।

—তোমায় আমি এবার চারভরি সোনা দিয়ে চন্দ্রহার গড়িয়ে দেব মা, বম্বে ফিরে গিয়ে টাকা পাঠাব!

—উঁহু, আমার হার না হলে কিছু হবে না। বুড়ো হয়েছি, সোনার হার পরে এখন করব কি। আরো দুখানা বড়া খা।

—আমায় সব দিয়ে দিচ্ছ মা, তোমার জন্য যে কিছুই—

—আছে আছে, অনেক তালের বড়া খেয়েছি এই জীবনে, বিদেশে থাকিস, তালের বড়া করে তোকে কে খাওয়ায়—কতদিন পর বাড়ি এলি, হুঁ, যে কথা বলছি, এখন বাড়িতে টাকাকড়ি পাঠিয়ে তোর দরকার নেই, বলে কি না! বম্বের মতন জায়গা, খরচের শেষ নেই, খাওয়া-থাকায় কত টাকা বেরিয়ে যায়, তার ওপর জামা আছে, কাপড় আছে জুতো আছে, এটা ওটা আছে, এই বয়সে নতুন করে হার না পরলে আমার কিছু হবে না।

—তুমি রাগ করছ মা ?

—ইস, তোর ওপর আমি রাগ করতে পারি—হিমু, তুই পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছিস, সারা গাঁয়ের মানুষ তোর গুণের প্রশংসা করে, দেশের মানুষ তোর নাম জেনে গেছে, লোকে বলে আমি রত্নগর্ভা—রাগ হয় ওটাকে দেখলে, এক এক সময় আমার মনে হয় কি, নীলু আমার পেটে আসে নি, যেন ভুল করে কোথা থেকে কোন্‌দিন ছোঁড়াকে কুড়িয়ে এনেছিলাম।

হি-হি, বাবার মতন বলছ—তুমি মা, বুড়োর মতন—

রান্নাঘরের পিছনে আনারস জঙ্গলে দাঁড়িয়ে নীলু মশার কামড় খেয়ে হাসে। বাগানের একটা মালীর চক্ষুশূল ছিলাম, এখন দুটো মালীর চক্ষু শূল—আমার দুঃখ নেই, বেকার বাউণ্ডুলে অকর্মার ঢেঁকি। তবু যে হিমু, আমার বন্ধু, আমার খেলার সাথী, কতকাল পর ফিরে এসে এক সঙ্গে দুটো মালীর আদর-যত্ন পাচ্ছে, দুজন গেট-কীপার এই সিনেমা হলের সবচেয়ে ভাল সীটে দামী সীটে ফ্রী-পাশ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছে—

—বুঝলেন বিপিনবাবু, শ্যামনগরের মাটি কামড়ে পড়ে আছে ছোঁড়া, বেতো ঘোড়া, হাজার বকুনি খেয়ে মুখঝামটা খেয়েও কোথাও নড়তে চাইছে না, রাণীগঞ্জ থেকে সেবার আমার শ্যালক চিঠি দিয়েছিল, নীলুকে কালই এখানে পাঠিয়ে দিন, কোলমাইনে একটা কেরানীর পোস্ট খালি হয়েছে, আমি তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারব, এখনি যদি চলে আসে সে—

—গেল না বুঝি ? নস্যির টিপ নিয়ে বিপিনমাস্টার হাসে। অধর পণ্ডিত মাথা নাড়ে। আনারস জঙ্গলের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীল দুটো মুখ একসঙ্গে দেখে।

—বাবুর জামা-কাপড় নেই, জুতো নেই পায়ের। ছুতো দেখিয়ে গেল না, নড়ল না কুলাঙ্গার বাড়ি ছেড়ে—

—কি করবেন দুঃখ করে। বিপিনমাস্টার আর হাসে না। বড় করে নিশ্বাস ফেলে। হাতের দুটো আঙুল সমান হয় না। তবু যে আপনার বড়ছেলে দশজনের একজন হয়েছে—

এখানেই আমার সান্ত্বনা, এখানেই আমার তৃপ্তি, আমার হিমাদ্রিভূষণ···

বুড়োর বাকি কথাটা আর কানে নেবার দরকার পড়ে না নীলুর। পা টিপে টিপে সে তার ছোট ঘরে এসে ঢুকল।

—এই নীলু, নীলু!

নীলু নড়ছে না। ঘরের মেঝেয় চাটাই বিছিয়ে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি মুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে ভোঁস ভোঁস।

—হেই নীলু, নীলু! হিমু এবার নুয়ে ছোটভাইয়ের হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। অ্যাঁ, মরে গেল নাকি! ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে হিমাদ্রিভূষণ নিজের মনে হাসল।—এই নীলু, এই মেড়া, এই অকালকুষ্মাণ্ড—ওঠ, উঠবি তো, ভাত খাবি না। যাঃ বাবা, মনে হয় নেশাভাং করে ঘুমিয়েছে। হিমু বিড় বিড় করে উঠল। কোথায় গিয়েছিল বেটা কে জানে, আমার জামা-জুতো পরে, আমার ইভনিং-ইন-প্যারিস রুমালে ঢেলে, আমার পাউডার স্নো মুখে মেখে—বেশ রাত করে তো ফিরল। নিশ্চয় তাড়ির আড্ডা-ফাড্ডায়, ওসব ছাড়া নীলুবাবুর আর যাবার জায়গাটা কোথায়। মেয়ে-টেয়ে? যেন কথাটা ভাবতেও হিমুর হাসি পেল। গলার নিচে হাসল। এত বদখত চেহারা, শেয়ালের মতন গায়ের রং, কোন্ মেয়েই বা ওর দিকে তাকাবে! তবে কিনা জোয়ান বয়েস, শ্যামনগরের কোন পেঁচী-খেঁদী যদি—এই নীলু, নীলু!

নীলু ধড়মড় করে উঠে বসল। এবার হাত বাড়িয়ে হিমু হ্যারিকেনের সল্‌তেটা চড়িয়ে দিল। লাল লাল চোখ মেলে নীলু দাদাকে দেখছে।

—কি রে, খাওয়া-টাওয়া হবে না? আদুরে গলায় হিমু শুধাল।

বড় করে একটা হাই তুলল নীলু। ঘরের বেড়াটা এক নজর দেখল, তারপর শোয়া ছেড়ে উঠে বসল।

—তুই খেয়েছিস?

—হুঁ, সেই কখন! হিমু ঘাড় কাত করল।

—বাবা খেয়েছে?

—হুঁ।

—মা?

—সব, সবাই। অধর পণ্ডিত ও হিমাদ্রিভূষণকে খাইয়ে-দাইয়ে নিভাননীও আজ খেয়ে নিয়েছে।

—আমায় ডাকল না! নীলু অবাক।

—হেঁসেলে তোর ভাত চাপা দিয়ে রেখেছে।

—হি-হি, এবার নীলু অনেকটা যেন ঘুমের ঘোরে হাসল। তুই আসার আগে বুঝলি দাদা, অধর পণ্ডিত আমার খাওয়া নিয়ে খুব খিস্তি-খেউড় করত, কিন্তু ভবানী চুপি চুপি আমায় ডেকে নিয়ে ভাত খাওয়াত। আমার খাওয়া শেষ না করে নিজে কোনদিন খেত না। আজ আর আমায় ডাকলই না মা জননী।

—তা না-ই বা ডাকল। এতকাল যে আমি বিদেশে পড়েছিলাম, আমায় ওরা কোনদিন ডেকেছিল খেতে? কিন্তু আমার খাওয়া আটকায়নি! বুঝেছিস নীলু। দামী হোটেলের টেবিলে বসে পাখার তলায় আরাম করে প্রিন্সের মতন খেয়েছি। কারো ডাকাডাকির ধার ধারিনি।

—সে তো আমি জানি। নীলু মাথা ঝাঁকাল। তোর চিঠি পড়ে আমি সবই জানতে পারতাম। তুই আমার কাছে কিছুই লুকোসনি দাদা।

—তবে আর কি, যা এখুনি খেয়ে নে গে।

—আমি আজ আর খাব না, আমার খিদে নেই! নীলু হঠাৎ হি-হি করে হাসল। আমি খেয়েছি। খুব খেয়েছি।

হিমু চমকে উঠল। ছুঁচলো চোখ করে নীলুর মুখটা দেখল।—কি খেয়েছিস?

—মশার কামড় জোঁকের কামড়।

—রাস্তা ছেড়ে কি তুই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলি গাধা! এবার হিমু না হেসে পারল না।

নীলু চুপ।

—এমন সেজেগুজে সেণ্ট-ফেণ্ট গায়ে মেখে বাড়ি থেকে বেরোলি, কিছুই করতে পারলি না গরু! হিমু আর হাসছিল না। ফুর্তি-টুর্তি করা যায় এমন কাউকেই কি তোর চোখে পড়ল না?

দাদার চোখে চোখ রেখে নীলু দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

—আরে সবে তো আজ বাড়ি থেকে বেরোলাম, মানে বেরোবার মতন করে বেরনো হয়েছিল, কী চমৎকার জামা দিয়েছিস একখানা, বাহারের জুতো, দুখানা ফিনফিনে রুমাল—আর এতকাল? ছেঁড়া জুতো পায়ে ছেঁড়া শার্ট গায়ে চোরের মতন ঘাড় নীচু করে রাস্তায় ঘাটে চলতে হয়েছে—

—হুঁ, তা ঠিক। হিমু মাথা ঝাঁকাল। আমি তোকে কতবার চিঠিতে লিখেছি, পুরুষের চেহারার জেল্লা পোশাকের জেল্লা মাছির মতন ওদের টেনে আনে, হি-হি আমার বয়ের জীবনে এই কেবল দেখলাম, যেমন, দু হাতে উপায় করেছি, তেমন

দু হাতে খরচ করেছি—চেহারাখানা রাখতে হবে, ভাল ভাল খাদ্য পেটে দিতে হবে, আর দামী দামী পোশাক, চব্বিশ ঘণ্টা সেজে-গুজে থাকবে তুমি—তবে তো মাছির ঝাঁক তোমার কাছে উড়ে আসবে।

চক্‌চকে চোখ করে নীলাদ্রি কথাগুলি শুনল। তারপর ফিসফিসিয়ে উঠল তোর বম্বের মাছিগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করছে হিমু, তখন বলেছিলি রাত হলে অ্যালবামটা খুলে দেখাবি।

—হুঁ, দেখাব বৈকি। কেমন ফুর্তিতে সেখানে আছে তোর দাদা ছবিগুলো না দেখলে বুঝবি কি করে। স্যুটকেসটা এখানে টেনে আন, দরজার খিলটা ভাল করে এঁটে দে।

মহা উৎসাহে নীলু দাদার ভারি স্যুটকেসটা বিছানার কাছে টেনে আনল। ছুটে গিয়ে দোরে খিল এঁটে দিল।

—বুড়ো-বুড়ি এখন আর এ-ঘরে উঁকি দিতে আসছে না তুই নিশ্চিন্ত থাক, চালকুমড়োর ঘণ্ট দিয়ে ভাত খেয়ে ভুস্‌ভুস নাক ডাকাচ্ছে দুটিতে। নীলু তক্তপোষের কাছে ফিরে এল। হিমু কথা না বলে প্রকাণ্ড অ্যালবামটা বাক্স থেকে টেনে বার করল। নীলু ছবির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—কেমন দেখছিস? হিমু শুধোয়।

—মন্দ না। নীলু উত্তর করে।

মেয়েটার নাম কি জানিস?

—আমি কি করে জানব। নীলু ফিক্ করে হাসল।

—মীরা, মীরা মালহোত্র, কোথায় দুজনে ছবিটা তুলেছিলাম বলতে পারিস?

—তুই বল। নীলু বড় করে শ্বাস ফেলল। আমি কি ছাই বম্বের কিছু চিনি!

—জুহু বীচ। এই ছাখ আর একটি মাছি। হিমু অ্যালবামের পাতা ওল্টায়। নীলু তাকিয়ে থাকে। গোলগাল চেহারার মেয়ে।

—এটা তোলা হয়েছিল, এলিফেন্টা কেভ-এ। ছাখ্ কেমন টানা টানা চোখ মেয়েটার।

—ইস, তোদের দুজনের গায়ে একেবারে কিচ্ছু নেই।

হিমু নাকে হেসে আবার পাতা ওল্টায়।

—এর নাম দুর্গা খোটে। ম্যারিন ড্রাইভে তোলা ছবি।

নীলু চুপ।

—এর নাম সাবিত্রী দেশাই। তারাপোরেবেলা একোরিয়ামে তোলা ছবি।

এটা শান্তি গোখেল। এই হল বেলা ইব্রাহিম, এর নাম ঝুমু গাঙ্গুলী, এটি অঞ্জলি ভাট, ছাখ কী ফিগার, এর নাম নিভা খাণ্ডেলওয়াল, এটা প্রমীলা ধাওয়ান, এটি মীনাক্ষী, এটি মধুমিতা, এটি মেহেরউন্নেসা…মেহের মেহের…কেবল পাতা ওল্টাচ্ছে অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে, নীলু চোখ মেলে দেখছে। পাতার পর পাতা। কমলা নেহেরু পার্কে তোলা ছবি। কমলা নেহেরু হেঙ্গিং গার্ডেনে তোলা ছবি। একটি সুন্দরী মিলিয়ে না যেতে আর একটি সুন্দরী এসে যাচ্ছে, বাইরে নিশুতির স্তব্ধতা, ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের ডাক,…দেখলি ? অ্যালবামের পাতা শেষ। হিমাদ্রি হাসল।

নীলাদ্রি মাথা ঝাঁকাল। তারপর হিমাদ্রির চোখের দিকে তাকাল।

—ওর কাছে কেউ না।

—কার কাছে ?

—উর্মিলার কাছে। উমি।

—কোথাকার উমি ?

—এই শ্যামনগরের মেয়ে, ভুবন ডাক্তারের মেয়ে।

হিমু এক সেকেণ্ড কথা বলল না। চট করে হাত বাড়িয়ে ফিলটার টিপডের প্যাকেট থেকে সিগারেট খুলে সিগারেট ধরাল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছাড়ল।

—হুঁ, কোন্ দিকে ভুবন ডাক্তারের বাড়টা যেন ? নীলুর দিকে ছুঁচলো চোখে তাকায় হিমু।

ম্যাপ আঁকার মতন সুজনির ওপর আঙুল বুলিয়ে নালু ভুবন ডাক্তারের বাড়ির রাস্তা এঁকে দেখায়—খালধারের বড় সড়ক পিছনে ফেলে পালপাড়া হয়ে মুকুজ্যেপাড়ার বাঁক ঘুরে তুটো কালভার্ট, তারপর মেহেদীর ঝোপ, বেগুনক্ষেত, ইঁটের পাঁজা, ভুবন ডাক্তারের একতলা কোঠা বাড়ি—মাঝখানে তেলাকুচো ঝোপ।

—হুঁ, তারপর ? সিগারেট টানতে ভুলে গিয়ে নীলুর অগ্রজ নীলুর মুখটা দেখে। অনেকদিন বম্বে থেকে এদিককার রাস্তা ঘাট ভুলে গেছি—

—খুব সোজা রাস্তা, এগিয়ে গেলেই হল। হেসে নীলু একটা ফিল্টার টিপ্‌ড ধরায়। গাল ভরে ধোঁয়া টেনে পরে সেটা দাদার মুখের ওপর ছড়ায়। ধোঁয়াটা কেটে যেতে নীলু বলল, দারুণ ফিগার, যেমন নাক-চোখ তেমন চুল, গায়ের রং, তোর ওই বম্বে শহরের সব ক'টা সুন্দরীকে হার মানিয়ে দেবে, উর্মির কাছে ওরা কেউ না। চোখের ইশারায় নীলু সুজনির ওপর পাতা খোলা অ্যালবামটা দেখাল।

—মাইরি? হিমু জুলজুল করে হাসে। নীলু ঘাড় কাত করে।

—ডাঁসা পেয়ারা, মোটে ক'দিন আগে বিয়ে হয়েছে। এখনো রসের রাজা।

—রাণী বল্ গাধা।

—হুঁ রাণী। রসের রাণী। নীলু বলল।

—তারপর? হিমু সিগারেট টানে।

—আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকল, এমন সেজেগুজে বেরিয়েছি তো, অন্যদিন দেখলে থু তু ছিটোত উর্মিলা।

—তা তো ছিটোতই, হিমুর দুচোখ গোল হয়ে উঠল। কেমন একখানা জামা চড়িয়েছিলি আজ, কত দামী জুতো পায়ে ছিল তোর···হুঁ, হাতছানি দিয়ে ডাকল, তারপর? তুই কি করলি?

—আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নীলু এবার মিট মিট করে হাসল।

—কেন? হিমুর গোল চোখ চ্যাপ্টা হয়ে গেল।

—এমন ভয় ভয় করছিল। সাহস পেলাম না আর এক পা এগোতে···

—রাস্কেল, তুই একটা ছাগল। হিমু হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল। সাধে কি বলে অকর্মার ঢেঁকি, তোর না আছে এদিকে কিছু করার ক্ষমতা, না আছে ওদিকের—দে মশারীটা খাঁটিয়ে, আলো নিভিয়ে দে—এক গ্লাস জল দে—খেয়ে শুয়ে পড়ি।

—তুই মন খারাপ করছিস হিমু!

—তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। অ্যালবামটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

—কাল যাব, বুঝলি, আজ একটুখানি সাহস হয়েছিল, কাল সাহসটা আরো বাড়বে। আজ পয়লা দিন তো। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে হিমুর হাতে তুলে দিয়ে নীলু মশারী খাটাতে লেগে যায়। কাল আর একটা ভাল জামা বের করে দিল, বাহারের একজোড়া জুতো। সেজেগুজে সোজা ভুবন ডাক্তারের মেয়ের কাছে চলে যাব।

—কালও তুই পারবি না, মশারীর ভিতর থেকে নিভাননীর বড় ছেলে ঘুমো ঘুমো গলায় উত্তর করল: কাল না, পরশু না, কোনদিনই না—তোর হিম্মত নেই মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করার।

—কাল যাব, কাল আবার তোর জুতো-জামা পরে···দাদার মশারী খাটানো শেষ করে নীলু মাটিতে নিজের বিছানা পাতে। বিছানা পাতা শেষ করে বলে,

আজ মেহেদীর ঝোপের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, কাল ঠিক বেগুনক্ষেতের বেড়ার কাছে চলে যাব। গিয়েই উর্মিকে খপ্ করে জড়িয়ে ধরে—

—পারবি না পারবি না, যেন টুক করে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়ে হিমু তখনি আবার জেগে উঠল। ঈশ্বর তোকে সেই ক্ষমতাই দেয়নি পাঁঠা, তোর মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো উচিত ছিল, ছোঃ···

—ঠিক পারব। আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে নীলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল: প্রমাণের জন্য কাল উর্মিলার মাথার একটা চুল ছিঁড়ে এনে তোকে দেখাব, দেখবি ওর গায়ের চমৎকার গন্ধ আমার গায়ে লেগে আছে।

—সে অন্য কেউ হলে পারত, হিমু হলে পারত, তুই না। ঘুমের গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে নীলুর দাদা বলল, তোকে আর আমার আপন ভাই বলতেই ইচ্ছে করছে না, হিমু তোর দাদা নয়, উঁহু নিভাননীর গর্ভে তুই···

—ইস্, তুইও আমাকে পর করে দিলি হিমু, কাল থেকে নিভাননীকে হারিয়েছি, বুড়ো তো কোনদিনই নিজেকে আমার বাপ বলে স্বীকার করল না। মাটির বিছানায় শুয়ে নীলু আক্ষেপ করল: সত্যি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি যখন এ বাড়ির কেউ না, এই বাগানের কেউ না, এই সিনেমা-হলে আমার যখন কোন সীট রইল না···

কিন্তু অধর পণ্ডিতের বড়ছেলে কি আর এসব পাগলের প্রলাপের উত্তর দেয়। তার তখন ভুস ভুস নাক ডাকছে। তার নাক ডাকছে, নিভাননীর নাক ডাকছে, অধর চক্রবর্তীর নাক ডাকছে; কেবল নীলু অন্ধকার চালের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ঝিঁঝির ডাক শুনছে, টিকটিকির আওয়াজ শুনছে, বাইরে রাত জাগা পাখির ডানা-ঝাপটা শুনছে। তার চোখে ঘুমের বিন্দুবিসর্গ নেই।

এক সময় সে পাশ ফিরে শুল। কেন না ঘুমের মধ্যে তার দাদা খিক্ খিক্ হাসছে। নীলু কান পেতে রইল।

তেইশ বছর এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে সে জেনে গেছে, মানুষ যেমন ঘুমের মধ্যে হাসে, তেমনি কাঁদেও।

না, নিভাননীর বড় ছেলে কাঁদছে না। কাঁদবে কোন্ দুঃখে? সুখী মানুষ। ঘুমের মধ্যে হিমু কথা বলছে, যেন ভীষণ রেগে গিয়ে কাকে গালাগাল দিচ্ছে··· আহাম্মক, তোর মতন বেকুব, আমি কাল ঠিক ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের বেড়ার কাছে গিয়ে···এমন ডাঁশা পেয়ারা, কামড় না বসিয়ে পারা যায়···

তাই যাস্ হিমু। নীলু খুশি হল। মনে মনে বলল, এই জন্যই আজ ল

দিয়ে রীতিমত এঁকে-জুখে ডাক্তারের বাড়ির রাস্তাটা তোকে দেখিয়ে দিলাম। চিনিয়ে দিলাম।

নিশ্চিন্ত হয়ে নীলু তার চাটাইয়ের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জামাটা গায়ে চড়ায়।

অন্ধকারে তার সব জানা আছে।

তা ছাড়া হিমু এখন সাত-হাত ঘুমের নিচে তলিয়ে আছে, কিছুই টের পাবে না। নীলু হাত বাড়িয়ে হিমুর শিয়রের কাছ থেকে কাগজের নোটে ঠাসা অ্যাটাচিটা তুলে নিল।

অনেক টাকা।

টাকা নিয়ে সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এই টাকায় সে অনেক দূরে যেতে পারবে।

এবার আমি বন্বে চললাম হিমু। ঘুমন্ত আজকে উদ্দেশ করে নীলু বলল, বিদেশে থেকে তুই অনেক আমোদ-ফুর্তি করেছিস্। এবার দেশের গাঁয়ে থেকে ফুর্তি কর। অনেকদিন ফুর্তিটা চালিয়ে যেতে পারবি। অধর চক্রবর্তীর ঘরে চালের ফুটো টিন দেখবি, নিভাননীর শূন্য গলা দেখবি, আর ছুটে ছুটে ভুবন ডাক্তারের বেগুনক্ষেতের পাশে মেহেদীর ঝোপের কাছে চলে যাবি। আজ উর্মি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, কাল উর্মি চলে গেলে পরশু শুমি আসবে বাপের বাড়ি বেড়াতে—শুমি চলে গেলে আবার উর্মি আসবে, উর্মি চলে গেলে শুমি। কাজেই শ্যামনগরের মাটিতে তোর শেকড়গাড়া হয়ে গেল হিমু, হি হি। অন্ধকারে নীলু হাসল। তারপর বড় বড় পা ফেলে রেলস্টেশনের দিকে চলল। যদিও সেই ভোরবেলা ট্রেন। আকাশের তারাগুলি ছলছল করছিল। নীলুর চোখ দুটোও ছলছল করছিল। অবশ্য একটু সময়ের জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে মনটাকে সে শক্ত করে ফেলল। এখানে তার কোন বন্ধন রইল না। না এ বাড়ি না ভুবন ডাক্তারের বাড়ি। সাংঘাতিক একটা মুক্তির স্বাদ নিয়ে সে হাঁটতে লাগল। বাতাসে ভোরের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল।

———

ম্যাজিক

॥ ১ ॥

অনবরত এটা হারাচ্ছে ওটা হারাচ্ছে অবিনাশ গাঙ্গুলী। হারাচ্ছে আবার খুঁজে পাচ্ছে, কখনো নিজে খুঁজে পাচ্ছে, কখনো বাড়ির ঝি পেয়ে দিচ্ছে, কখনো অফিসের বেয়ারা দারোয়ান বা কলিগ্‌দের কেউ—এই যে আপনার চশমাটা, এই তো মশাই এখানে আপনার লাইটারটা পড়ে আছে। ইস্, কী সাংঘাতিক ভুল!

সেদিন যোগেশ দত্ত, অবিনাশের অফিসের হেড ডেসপ্যাচার হেসে খুন। মশাই এত মনের ভুল হয় আপনার! আমিও তখন খেয়াল করিনি। আপনি কাল এলেন স্ট্যাম্প কিনতে আমার ডিপার্টমেন্টে, কাজে ব্যস্ত ছিলাম,

চট্ করে আপনার দিকে তাকাতে পারিনি, আপনি ওই চেয়ারটায় বসলেন, সিগারেট ধরালেন, আমার অ্যাসিস্টেণ্ট বিধু তালুকদারের সঙ্গে গল্পও করলেন খানিকক্ষণ, আমি ব্যস্ত রয়েছি দেখে বিধুই আপনাকে চা খাওয়াল। আপনার কাছে সিগারেট থাকা সত্ত্বেও বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেট কিনে আনিয়ে আপনাকে বিধু অফার করল। অবশ্য আপনি সিগারেট ধরাতে গিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করেছিলেন কি লাইটার, আমি ততটা খেয়াল করিনি। একসঙ্গে দু টাকার স্ট্যাম্প আপনি কিনলেন, বলেছিলেন আরো থাকে তো দিন মশাই, আমি হেসে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, এটা কি পোস্টাফিস পেয়েছেন মিঃ গাঙ্গুলী, অফিসের কাজে কিছু স্ট্যাম্প খাম পোস্টকার্ড রাখি—আপনাকে এখন উজাড় করে সব দিয়ে দিলে আমার যে এদিকের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে—বিকেলের মেল্ পাঠাতে অসুবিধে হবে, বরং কাল সকালে আসবেন, দেখি আরো কিছু স্ট্যাম্প দারোয়ানকে দিয়ে আনিয়ে রাখতে পারি কিনা। আপনি হেসে বললেন, থাক দরকার নেই—ধন্যবাদ, দু টাকার স্ট্যাম্পেই আমার অনেকদিন চলে যাবে। তারপর আপনি বললেন, আরে আমিও তো আমার বেয়ারাকে দিয়ে একসঙ্গে কিছু ডাকটিকিট আনিয়ে রাখতে পারি, মনে থাকে না, বুঝেছেন মিঃ দত্ত রোজ ভুলে যাচ্ছি বেটাকে বলতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলাম, হঠাৎ যে এত চিঠিপত্র লেখার দরকার হল আপনার? আপনি হাসলেন। বললেন, আমার জন্য না, গিন্নীর জন্য, আমি চিঠিপত্র একদম লিখি না মশাই, গিন্নী ক'দিন ধরে স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প করছেন—অফিসে বেরোবার সময় রোজ একবার করে কথাটা মনে করিয়েও দেন, আর বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভুলে যাই। রোজ ভুলে যাচ্ছি।

তারপর নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে রোজ মিসেসের বকুনি খেতে হচ্ছে? আমি হেসে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিলাম। তা আর বলতে, যেন ঈষৎ লজ্জা পেয়ে আপনি ঘাড় কাত করেছিলেন। এবং যেহেতু আমার কাছ থেকে একসঙ্গে দু টাকার স্ট্যাম্প পেয়ে গেলেন, ভুলো মনের জন্য বাড়ি গিয়ে আজ আর গিন্নীর বকুনি খেতে হবে না—দ্বিতীয়বার আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হৃষ্টমনে আমার কামরা থেকে আপনি বেরিয়ে গেলেন। ভুলো মন। তাই যাবার সময় আবার একটা মস্ত ভুল করলেন। আপনার চমৎকার জাপানী লাইটারটা কাল বিধুর টেবিলে ফেলে গেছেন। বিধু ততটা খেয়াল করেনি। আজ সকালে অফিসে আসতেই দারোয়ান ওটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, একাউণ্ট সেক্‌সনের গাঙ্গুলীসাহেব কাল ফেলে গেছেন। নিন মশাই আপনার জিনিস।

অবিনাশ হাত বাড়িয়ে যোগেশের হাত থেকে হারানো লাইটার তুলে নিয়ে পকেটে পুরেছিল এবং গম্ভীর মুখে আবার একটা ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

না, অফিসের লোক যোগেশ দত্ত কি করে জানবে এই লাইটার নিয়ে আগের রাত্রে বাড়িতে কী তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। স্ট্যাম্প পেয়ে গিন্নী খুবই তুষ্ট হয়। আহ্লাদ করে তখনি অবিনাশকে কফি তৈরী করে দেয়। কিন্তু কফির কাপে চুমুক দিয়ে লাইটার খুঁজে না পেয়ে অবিনাশ সিগারেট ধরাবার জন্য টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা তুলে নিয়ে যখন কাঠি ঘষতে গেছে তখন গিন্নীর দু চোখ কপালে উঠল।—আবার তুমি ম্যাচিসের কাঠি নষ্ট করছ, কেন তোমাকে তো লাইটার কিনে দিয়েছি, ওটা ব্যবহার করছ না কেন? একটা দেশলাইয়ের দাম এখন ক' পয়সা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই? অবিনাশের মুখ চুন। কিন্তু ধরা পড়লে তো চলবে না। চট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ভুল করে লাইটারটা অফিসে আমার টেবিলের টানায় রেখে এসেছি। হ্যাঁ, এ কখনো হয়! আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না। যেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি সিগারেট ফুঁকছ, প্রতি মুহূর্তে তোমার আগুনের দরকার, ভুল করে ওই জিনিস অফিসে রেখে এসেছ? কেন, বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলে, তখন তুমি সিগারেট ধরাওনি? বাস থেকে নেমে আমাদের বাসায় পৌঁছতে পাক্কা সাত মিনিট সময় লাগে। তখন তুমি আবার একটা সিগারেট ধরাও। তোমার সঙ্গে বেরিয়ে ক'দিনই আমি লক্ষ্য করেছি। কাজেই এর মধ্যে তোমার লাইটারের কথা নিশ্চয় মনে পড়েছিল। না কি অস্বীকার করবে? আসলে জিনিসটা তুমি হারিয়ে এসেছ। গিন্নী লাফালাফি শুরু করেছিল।—

আরে না না! মাথা নেড়ে অবিনাশ বার বার প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তার প্রতিবাদের মধ্যে তেমন কী জোর ছিল? রোজ এটা-ওটা হারাচ্ছে সে। তার বুক ঢিব ঢিব করছিল। আর পাঁচটা জিনিসের মতন লাইটারটাও যে সে হারিয়ে এসেছে—কিছুতেই মনে মনে সে তা অস্বীকার করতে পারছিল না। সুদীপা রীতিমত চিৎকার করছিল।—আমি মরে যাব, আমি পাগল হব, এভাবে মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে, বারো মাস ত্রিশ দিন, বছরের পর বছর কেউ যদি কেবল জিনিস হারাতে থাকে, সেই লোকের সঙ্গে কোন মেয়ে ঘর করবে আর! না সেই সংসারের কোনদিন উন্নতি হয়? অলক্ষ্মীর ঘর এটা। বাউণ্ডুলের সংসার।

উঃ, ধরতে গেলে সারাটা রাতই কী অবস্থার মধ্যে না কাটাতে হয়েছিল অবিনাশকে। এমন যার ভুলো মন, পদে পদে যে এত অসতর্ক এত অসাবধানী —আমার তো মনে হয় এই মানুষ একদিন নিজেকেও হারিয়ে ফেলবে।

নিজেকে হারানো, কথাটা শুনে দুঃখের মধ্যে কেমন হাসি পেয়েছিল অবিনাশের। লাইটারের শোকে রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করেছিল গিন্নী। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। ক'দিন হয় জিনিসটা কেনা হয়েছিল? এই তো সেদিন এক শনিবার বিকেলে অবিনাশের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ধর্মতলার একটা দোকান থেকে নিজে পছন্দ করে সুদীপা সুদৃশ্য জাপানী লাইটারটা অবিনাশকে কিনে দেয়। রোজ দেশলাইয়ের দাম বাড়ছে—দেশলাইয়ের অনেক খরচ। আজকাল একটা লাইটার সঙ্গে রাখা, হরদম যাকে সিগারেট ধরাতে হয়, বুদ্ধিমানের কাজ। একসঙ্গে ক'টা টাকা গেল বটে, কিন্তু সারা বছরের মোট দেশলাইয়ের খরচ যোগ করলে দেখা যাবে যে—

অর্থনীতি ঘটিত ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করার পর সুদীপা তখনই অবিনাশকে সাবধান করে দিয়েছিল—দেখো এটা না আবার কোনদিন হারিয়ে এসো।—না না, অবিনাশ মাথা নেড়েছিল, তুমি আদর করে কিনে দিয়েছ, এ-জিনিস কখনো হারাতে পারি!—যদি হারাও, তো তোমার একদিন কি আমার একদিন! সুদীপা চোখ পাকিয়েছিল।

সেই একদিন—একটা রাত শ্রীমতী যা দেখাল না! ভাগ্যিস, পরদিন অফিসে গিয়ে হারানো লাইটার, কিছুটা দারোয়ানের কল্যাণে কিছুটা ডেসপ্যাচের যোগেশ দত্তর কল্যাণে অবিনাশ ফিরে পায়। ওরা যদি তেমন লোক হত জিনিসটা মেরে দিতে কতক্ষণ ছিল!

হুঁ, অনবরত এটা হারাচ্ছে, ওটা হারাচ্ছে সে। এই জীবনে আধ ডজন ফাউন্টেন পেন হারিয়েছে, দুটো ঘড়ি হারিয়েছে, ছাতা হারিয়েছে গোটা চারেক, বর্ষাতি হারিয়েছে, চটি হারিয়েছে। পায়ে থাকা অবস্থায় চটি আবার হারায় কি করে লোকে? তা-ও হারায়। অসতর্ক হলে যা হয়। অফিসে কি বাইরে কোথাও বেরোতে অবিনাশ স্যু পায়ে বেরোয়। কিন্তু ঐ যে সকালে লুঙ্গির ওপরে একটা হাফশার্ট চড়িয়ে চটি পায়ে বাজার করতে বেরোয়। দুধের ডিপোতে দুধ আনতে যায়। কোনটাই তো বাড়ির দরজায় না। দুধ আনতে কি মাছ-তরকারী আনতে অবিনাশকে বাসে চাপতে হয়।

একদিন ভিড়ের বাসে উঠ্‌তে গিয়ে তার ডান পায়ের চটিটা খসে কোথায় যে পড়ে গেল।

না, অবিনাশের যদি পায়ের দিকে খেয়াল থাকত তখনি বাস থেকে সে লাফিয়ে নেমে পড়ত, হয়তো চটিটা রাস্তায় পেয়ে যেত, কিন্তু তার তখন দিশাই নেই তার ডান পা খালি। গাড়ির ভিতর ক্রমাগত ভিড় ঠেলে সে এগোচ্ছে।

যদি একটু বসবার জায়গা পাওয়া যায়। তা কি আর পাওয়া যায়। সেই ভোর পাঁচটার পয়লা বাস থেকে আরম্ভ করে কলকাতা শহরের রাত এগারোটার লাস্ট-বাস—কোন গাড়িতেই বসবার জায়গা থাকে কি! অবিনাশকেও শেষটায় রড ধরেই ঝুলে থাকতে হল। তখন তার হুঁশ হয় তার এক পায়ে জুতো নেই। পায়ের তলায় কাঠ ঠেকছে: কিরকম হাস্যকর ব্যাপার বুঝুন! কেমন ভুলো মন তার! ঘাড় নুইয়ে তক্ষুণি অবশ্য সে চটি খুঁজতে লেগে যায়। কোথায় পাবে ছাই! চটি সে অনেকক্ষণ আগেই বাসে ওঠার মুখে পেছনে রাস্তায় ফেলে এসেছে। কিন্তু সে কি তা মনে করতে পারছিল। তার ধারণা জুতোটা বাসের মধ্যেই তার পা থেকে আলগা হয়ে কোথাও সরে সরে গেছে। এদিকে এত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে সব প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে—কাউকে সে বলতে পারছে না, একটু সরে দাঁড়ান ভাই, আমি চটি খুঁজব! চোখ দুটো নামিয়ে বাসের পাটাতনের এদিক-ওদিক দুবার খুঁজে দেখার চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়। তারপর আর কি। কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতন চেহারা করে তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারপর বাজারের স্টপে বাস ধরতে নেমে পড়ে। নেমেই বাঁ-পায়ের চটিটা তাড়াতাড়ি বাজারের থলের ভিতর ঢোকায়। পরিচিত কে একজন যেন জিজ্ঞেস করেছিল, এ কি! আপনার খালি পা কেন মশাই? গম্ভীর হেসে অবিনাশ উত্তর করেছিল, আত্মীয়-বিয়োগ ঘটেছে, অশৌচ চলছে।

উঁহু, জিনিস চুরি যাওয়া আর হারানো এক কথা নয়। অবিনাশ ক্রমাগত এটা ওটা হারাচ্ছে। ভুল করে কোথায় কখন কোনটা রাখছে মনে করতে পারছে না। বাথরুমের তাকে হাতঘড়ি খুলে রেখে শোবার ঘরের আলমারী খুঁজছে, টেবিলের টানা খুঁজছে। শোবার সময় বালিশের কিনারে চশমাজোড়া এক সময় খুলে রেখেছিল হয়তো। কিন্তু খোঁজার সময় দেখা গেল খাবার টেবিলের এপাশ দেখছে ওপাশ দেখছে সে, বারান্দায় ছুটছে, কি জানি যদি বারান্দার ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রেখে এসে থাকে, দরকার হলে কিচেনে ঢুকছে—যেন হঠাৎ তার আবার মনে পড়ল, সুদীপার মাছের চপ তৈরি করা দেখতে গিয়ে চশমাটা তখন মশলাপাতির শিশির-কৌটার পাশেই যেন সে সরিয়ে রেখেছিল।

যেমন আর একদিন। সেটা আরও মজার ঘটনা। একটা সেলুন থেকে চুল কেটে বাড়ি ফিরে অবিনাশ গায়ের শার্টটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর বাথরুমে ঢোকে। বাথরুম থেকে বেরোবার মিনিট পাঁচেক পর সদরের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে দরজা খুলে দেয়। কাগজওয়ালা কাগজের দাম নিতে

এসেছে। তৎক্ষণাৎ শার্টের পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল তাই তো, তার গায়ে শার্ট নেই শুধু গেঞ্জি পরে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় চুল কাটার সময় জামাটা খুলে সে নাপিতের হাতে দিয়েছিল। নাপিত তার দেওয়ালের হুকে জামাটা ঝুলিয়ে রাখে। লোকটার তামাটে রঙের হাতের পিঠের নীলচে সবুজ উল্‌কিটা পর্যন্ত অবিনাশের মনে পড়ে যায়। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি!—তুমি একটু দাঁড়াও হে—শার্টটা ভুল করে চুল কাটার সেলুনে রেখে এসেছি। পাড়ার দোকান। পরিচিত লোক। খুবই বিশ্বাসী। টাকা-পয়সা শুদ্ধ জামাটা তার দোকানে রয়ে গেছে। কিছু করবে না জানি। সবই ফেরত পাব। বলে কাগজওয়ালার দিকে তাকিয়ে হেসে অবিনাশ তক্ষুণি আবার সেলুনের দিকে ছুটছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে সুদীপা রান্নার পাঠ চুকিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো অবিনাশের শার্টটা দেখতে পায়। অবিনাশ যে কী লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

কিন্তু এমন লজ্জা তো রোজই পাচ্ছে সে! তাতে কি তার ভুলো মন শোধরাচ্ছে!

রোজ এটা এখানে রাখছে ওটা ওখানে রাখছে, আর ভুলে যাচ্ছে। কখনো সুদীপা খুঁজে দিচ্ছে, কখনো ঝি। অফিসে যদি কিছু ফেলে আসছে বেয়ারা দারোয়ান বা অফিসের কলিগদের কেউ যত্ন করে সেটা তুলে রাখছে, পরদিন সে অফিসে গেলে তার জিনিস তারা তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

যেমন সেদিন লাইটারটা সে ফিরে পেল। কোন কোন জিনিস ফিরে পায়, আবার এমন অনেক জিনিস অবিনাশ হারিয়েছে, যা কোনদিনই আর সে খুঁজে পেল না, বা অন্য কেউ পাইয়েও দিল না। কি করে দেবে? পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয়। বাদলা দিনে চিঠি ফেলতে কি রেজিষ্ট্রি করতে গিয়ে কতবার যে পোস্টাফিসে ছাতা বর্ষাতি ভুল করে রেখে এসেছে—তার মনে নেই কোথায় রেখে এসেছে—সুদীপা মনে করিয়ে দিতে তখনি ছুটে পোস্টাফিসে গেছে। ইতিমধ্যে ছাতা বা বর্ষাতিটা কেউ তুলে নিয়ে সরে পড়েছে। তখন আর কি, মুখ চুন করে অবিনাশ বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে ব্যাঙ্কে গিয়ে কতদিন ক'টা দামী কলম ব্যাঙ্কের কাউন্টারে রেখে এসেছে, রেখে এসেছে মানে চিরদিনের জন্য সে সব হারিয়ে এসেছে। বাজার করে একদিন বাড়ি ফেরার পথে একটা ডিসপেনসারিতে ঢুকেছিল সুদীপার মাথা ধরার কি একটা ট্যাবলেট কিনতে—ব্যস, বাজারের থলেটা ডিসপেনসারিতে রেখে শুধু ট্যাবলেট হাতে অবিনাশ বাড়ি ফিরে আসে। পরে আর ফিরে গিয়ে থলেটা পায়নি। মাসের প্রথম দিকে

সেটা। কাঁচাবাজার ও স্টেশনারী জিনিস নিয়ে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ টাকার সওদা ছিল থলের মধ্যে। অবিনাশের কাণ্ড দেখে সুদীপা সেদিন মাথা ধরা ছাড়ানোর ওষুধ খাবে কি—রাগে দুঃখে দেওয়ালে মাথা ঠোকবার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তার।

রোগটা যেন দিন দিন বাড়ছে।

তাই এখন ক'দিন ধরে অবিনাশের গিন্নি উঠতে বসতে চমৎকার কথাটা তাকে শোনাচ্ছে: এটা ওটা হারাতে হারাতে একদিন দেখব তুমি নিজেও কোথাও হারিয়ে গেছ। ব্যঙ্গ করে বলা। বিদ্রূপ করে বলা। শুনে অবিনাশ চুপ করে থাকে। প্রতিবাদ করে না। যদি এই বলে সুদীপা শান্তি পায় মন্দ কি। তা না হলে এক একটা জিনিস সে হারাচ্ছে—ভুল করে কোথায় ফেলে আসছে, আর এই নিয়ে ঘরে কী তুমুল অশান্তি। ঝগড়া-চেঁচামেচি। কখনো চোখের জল ফেলছে গিন্নী। বা অভিমান করে দুদিন হয়তো কর্তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ রাখছে। হয়তো একদিন রান্নাই করল না। নিজে উপোস থাকল। অবিনাশও না খেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরে খিল এঁটে গিন্নী শুয়ে পড়েছে। অবিনাশও আর ডাকল না। অশান্তি বাড়বে। বাইরের ঘরে অফিসের পোশাক ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে আবার হয়তো জামাটা গায়ে চড়িয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন খেটে-খুটে এসে এ-বেলাও কি উপোস থাকা চলে! কলকাতা শহর। দু-পা এগোলে যেখানে হোটেল, দু-পা এগোলে রেস্তোরাঁ। যা হোক একটায় ঢুকে পড়ে পেটে কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এল। হয়তো তখন লোডশেডিং চলছিল! যখন ঘরে ফিরল দেখা গেল তার হাত শূন্য। তার খেয়ালই নেই ভুল করে খাবার দোকানে বা হোটেলে টর্চটা ফেলে এসেছে। অন্ধকারেই গায়ের জামা ছাড়ল। পাজামা ছেড়ে লুঙ্গি পরল। তার একবার মনে হল না অন্ধকারটা খারাপ কিছু বা অন্ধকারে অসুবিধে হচ্ছে। তাহলে তো তক্ষুণি সে একটা আলো খুঁজত। আর আলো খুঁজতে গিয়ে টর্চের কথা তার নির্ঘাৎ মনে পড়ে যেত। পড়ল না। অন্ধকারেই হাতের আন্দাজে সোফাটা একদিকে একটু ঠেলে দিয়ে তার ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ব্যাপারটা আবিষ্কার করল সেই তার গিন্নী। টর্চ কোথায়, টর্চ তো ঘরে নেই—আবার নতুন করে লাফালাফি চেঁচামেচি শুরু হল। অ্যাঁ, যদি চোর-ডাকাত এসে ঘরের জিনিসপত্তর নিয়ে যেত—মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম। এভাবে রাস্তায়-ঘাটে মাঠে-ময়দানে ট্রামে-বাসে এটা ওটা ফেলে আসা, হারিয়ে আসা—ওফ্, আমি পাগল হয়ে যাব!

না, সুদীপা পাগল হয় নি। চেঁচামেচি লাফালাফিটাও ক'দিন ধরে বন্ধ। কান্নাকাটি করছে না। বা ঘরের কাজকর্ম বন্ধ রেখে রাগ করে শোবার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে শুয়ে থাকছে না। আর এর মধ্যে অবিনাশ আর একটা ফাউণ্টেন পেন হারিয়েছে, দুটো রুমাল হারিয়েছে। এসব সাধারণ জিনিস। দামী জিনিস যেটা সেটা হল তার বিয়ের আংটি। বুঝুন, সোনার কত দাম এখন! তা ছাড়া এই আংটির সঙ্গে সুদীপার জীবনের শুভাশুভের একটা অদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে যে! বিয়ের জিনিস। এই জিনিস হারানো মোটেই মঙ্গলের চিহ্ন নয়।

আংটিটা হারাবার পর থেকেই, অবিনাশ লক্ষ্য করেছে, কী ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছে গিন্নী। ঝগড়া না, চেঁচামেচি না, একফোঁটা চোখের জল ফেলা নয়। রাগ করে অভিমান করে গোঁসাঘরে ঢুকে খিল আঁটার মতন কোন রকম নাটকই আর করছে না।

বরং অবিনাশকে কফি করে দিচ্ছে, কি ভাত বেড়ে খেতে দিচ্চে, ঐ অবস্থায় পাতলা ঠোঁট দুটো সামান্য বেঁকিয়ে চোখ দুটো অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন একটা নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলার স্বর করে একটা কথাই ক'দিন ধরে বলছে। এটা ওটা হারাতে হারাতে অবিনাশ কোন্‌দিন না নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

মন্দের ভাল। অবিনাশ কথাটা শুনে যায়। কোনরকম মন্তব্য করে না। চেঁচামেচি হৈ-চৈ-এর হাত থেকে তো বাঁচা গেল। মনে মনে বলে সে। গিন্নীরা এইটুকুন ঠাট্টা হজম করার ক্ষমতা তার আছে।

হুঁ, ঝগড়া-চেঁচামেচি মানে-অভিমানে কোনরকম কাজ হচ্ছে না দেখে সুদীপা যে শেষ পর্যন্ত অন্য রাস্তা ধরেছে—অর্থাৎ এভাবে ক্রমাগত ঠাট্টা বিদ্রূপের খোঁচা খেয়ে যদি অবিনাশের চৈতন্য উদয় হয়। তার ভুলো মন যদি শোধরায়।

তা কি আর শোধরায়! অবিনাশ চিন্তা করে। তাহলে আমিও যে বেঁচে যাই। এতে ক্ষতিটা যে আমারই হচ্ছে বেশি। কলম হারিয়ে আবার কলম কিনতে হয়, চশমা হারিয়ে চশমা কিনতে হয়। তেমনি ছাতা জুতো—কোন্‌টা ছাড়া ভদ্রলোকের চলে।

এত ভুলো মন নিয়ে কি করে যে একটা লোক রাস্তাঘাট চিনে বাড়ির নম্বর মনে রেখে রোজ অফিস থেকে ঘরে ফেরে এটাই আমার কাছে অবাক লাগে।

অর্থাৎ এত জিনিস হারাচ্ছে অবিনাশ, একদিন রাস্তাঘাট হারিয়ে নিজেও সে হারিয়ে যাবে—হারানো উচিত—কথাটা সরাসরি না বলে এভাবে ঘুরিয়ে সুদীপা সময় সময় তাকে শোনাতে ছাড়ছে না।

একদিন অবিনাশ আর চুপ থাকতে পারল না। হেসে বলল, সব কিছু আমি হারাচ্ছি সত্য, কোথায় কোনটা কখন রাখছি ফেলছি মনে রাখতে পারছি না—কিন্তু একুশের বি গাঙ্গুলীবাগান রোয়ের এই দু কামরার ফ্ল্যাটটা আমি ঠিক মনে রেখেছি, কখনও ভুলছি না, মন থেকে হারাতে দিচ্ছি না—কাজেই রোজ সন্ধ্যায় এখানে না ফিরে এই শহরের ভিড়ে আমি হারিয়ে যাব—এটা একেবারে অসম্ভব।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের গিন্নী নাক সিঁটকাবার মতন চেহারা করে ঘুরে দাঁড়াল। হুঁ, খুব একটা দামী ফ্ল্যাটে আছ কিনা, খুব একটা ভাল জায়গায় আস্তানা গেড়েছ। অষ্টপ্রহর ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে, ছাদ বেয়ে জল পড়ে—কাজেই এই বাড়ি, বাড়ির নম্বর, বাড়ির সামনের রাস্তা কিছুতেই ভুলতে পারছ না, ওদিকে দুনিয়ার সব কিছু ভুলছ, আর বিকেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একুশের বি গাঙ্গুলীবাগান রো হিড় হিড় করে তোমায় ঠিক টেনে নিয়ে আসছে। তা হবে।

এটাও একটা ঠাট্টা। অবিনাশ গায়ে মাখল না।

—বাড়ি কি আর টানছে, বাড়ির সুন্দর মানুষটি আমাকে টানছে! অবিনাশ এবার রীতিমত শব্দ করে হাসল।—সব কিছু আমি হারাই, সব কিছু ভুলে যাই, সুদীপা নামের মেয়েটিকে আমি হারাতে পারি না, ভুলতে পারি না। হি-হি।

—তাই বা কি করে জানব, কি করে বিশ্বাস করব! অবিনাশের মুখের দিকে তাকায় না সুদীপা। অন্যদিকে চোখ রেখে মুখ ভার করে বলল, কোনদিন তো আর পরীক্ষা হয়নি, কোনদিন বাইরেও যাই নি, ভিড়ের মধ্যেও থাকি নি, বিয়ের পর থেকে আজ চার বছরের ওপর এই একটা পায়রার খোপের মধ্যে আটক আছি।

—বাইরে গেলেও তোমাকে আমি হারাব না, ভিড়ের মধ্যেও ঐ নাক ঐ চোখ ঐ চুল ঐ সুন্দর শরীর আমি ঠিক চিনে নেব, একটুও ভুল হবে না। যেন একটুও বাড়িয়ে বলল না অবিনাশ।

—হবে হবে, এত যার ভুলো-মন। বিরক্ত হয়ে অবিনাশ-গিন্নী উদাস একটা হাই তুলল। তুমি নিজেও একদিন হারাবে আমাকেও হারাবে, এ আমি আয়নার মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

—বেশ তো, এবারই পরীক্ষাটা হয়ে যাক। উৎসাহের গলা অবিনাশের। পুজোর ছুটিতে পুরী বেড়াতে যাচ্ছি তোমাকে নিয়ে। সব ঠিক করে ফেলেছি। দারুণ ভিড় এই সময়টায় সেখানে—ভিড়ের মধ্যে আমি হারাই কি তোমাকে হারাই দেখা যাবে।

ঠিক কিছুই ছিল না। অনেকটা যেন জেদ করে অথবা গিন্নীকে খুশি রাখতে পরদিন অফিস থেকে একফাঁকে বেরিয়ে রেলওয়ে অফিসে গিয়ে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা পাকা করে অবিনাশ হাসতে হাসতে ঘরে ফিরল।

সুদীপা খুশিই হল। ছুটিতে বাইরে যাবার নামে সব গিন্নীরই প্রচুর আহ্লাদ হয়। এবারের কেনা-কাটাটা সুদীপাই করল। ইচ্ছা করেই অবিনাশ গিন্নীকে করতে দিল। কারণ এক জায়গায় তারা বেড়াতে যাচ্ছে। বাড়তি কিছু জিনিসপত্রের দরকার হবে। আর সে-সব কিনতে গিয়ে অবিনাশ ভুল করে এটা দোকানে ফেলে আসবে, ভুল করে ওটা বাসে কি ট্যাক্সিতে রেখে আসবে, কি হয়তো তার হাত থেকেই দুটো জিনিস ফসকে রাস্তায় পড়ে গেল, আর খুঁজে পেল না, অর্থাৎ যাত্রার আগেই লোকসানের পালা শুরু হবে, দরকার কি। অবিনাশ সাবধান হয়ে গেল। তাছাড়া বাইরে যাওয়া মানেই একরাশ টাকা খরচ। সুদীপার হাত থেকে ছুঁচটিও হারাবার উপায় নেই। সব ব্যবস্থা নিপুণ হাতে গিন্নী সুসম্পন্ন করবে।

নির্দিষ্ট তারিখে ঘরে তালা লাগিয়ে হৃষ্টমনে অবিনাশ সস্ত্রীক পুরী এক্সপ্রেসে চাপল।

হোটেলটা ভাল। তাদের ঘরখানাও সুন্দর পাওয়া গেছে। জানালা খুললেই সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউ দেখা যায়। আর মস্তবড় আকাশ। তার ওপর দিনটাও দারুণ মাজা-ঘষা। কাচের মত ঝক ঝক করছিল রোদ।

রিক্সা থেকে মালপত্র তুলে দোতলায় আনা হয়েছে। সব গুছোবার আগে সুদীপা এককাপ চা খেয়ে নিচ্ছে। ট্রেন-জার্নির ক্লান্তিতে তাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে। অবিনাশ হোটেলের চাকরটাকে নিচে পাঠিয়েছে সিগারেট আনতে। সঙ্গে যে ক' প্যাকেট আনা হয়েছিল ট্রেনে বসে সব শেষ করেছে। ট্রেন থেকে নেমে হোটেলে আসার পথে আবার সিগারেট কেনা হবে। মনে মনে ঠিক করা ছিল। কিন্তু হোটেলে পৌছবার পর দেখা গেল সিগারেট কেনা হয়নি। কি করে এতবড় কথাটা অবিনাশ ভুলে গেল এই নিয়ে সুদীপা এইমাত্র হাসাহাসি করেছে। যা হোক, হালকা ধরনের ভুল এটা। যে জন্য গিন্নী বিন্দুমাত্র রাগা-রাগি করল না। তাছাড়া অবিনাশ যদি এভাবে ভুলে থেকে থেকে সিগারেটটা আস্তে আস্তে একটু কমিয়ে দিতে পারে, সুদীপা খুশীই হয়। তা কি আর সে কমাবে! কত পয়সা বাঁচত।

সিগারেট আনার পর অবিনাশ নিশ্চিন্ত হয়ে তার চা-টা শেষ করল। তারপর হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দু-একটা জরুরী কথা সারতে আবার নিচে নেমে গেল।

এবার সুদীপা ঘর গুছোতে লেগে যায়। বাঁধা-ছাঁদা খুলে জিনিসপত্র বার করতে থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর অবিনাশ ওপরে উঠে আসে। ঘরে ঢুকেই গিন্নীর চেহারা দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। অবিকল ঝড়ের আগের মুহূর্তের থমথমে আকাশ। বেডিং সুটকেস খোলা, জামাকাপড় জুতো ছাতা টর্চ টিফিন-ক্যারিয়ার স্টোভ আয়না চিরুনী বুরুশ স্নো পাউডারের কৌটা সাবানের বাক্স মাথার তেল সারা মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে সুদীপা চুপ করে বসে আছে। একঝলক দেখে অবিনাশ একটা চোরা ঢোঁক গিলল।—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? ভয়ে ভয়ে সে প্রশ্ন করল।

—আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—কেন? অবিনাশ আবার একটা ঢোঁক গিলল।

—তোমার সঙ্গে যতদিন আছি প্রতি মুহূর্তে আমার মরণ-চিন্তা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

অবিনাশ চুপ। তার হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করছে।

—থার্মোফ্লাস্কটা কোথায়? সুদীপার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিল।

—কেন, প্লাস্টিকের ওই নীল ঝুড়িটার মধ্যে নেই? অবিনাশ এক পাশে দাঁড় করানো ঝুড়িটার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। ওটার মধ্যে বসিয়েই তো ফ্লাস্কটা আনা হয়েছিল।

—না, ঝুড়িতে ফ্লাস্ক ছিল না।

—তবে কোথায় ছিল?

—তাই তো বলি, রাতারাতি কি আর তুমি শুধরে যাবে, ভাবলাম তখন সিগারেটের ওপর দিয়েই বুঝি এবার ভুলের চোটটা গেল।

—আমার তো মনে হয়, অবিনাশ আমতা আমতা করে বলল, ঝুড়ির মধ্যেই ফ্লাস্কটা ছিল। মাখনের টিন ও বিস্কুটের বাক্সটার সঙ্গেই ওটা রেখেছিলাম।

—না। সুদীপা মাথা ঝাঁকাল। এত জোর ঝাঁকুনি দিল মাথায় যে তার খোঁপা ভেঙে চুরমার। পিঠময় কালো কুচকুচে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের ব্যাগটার মধ্যে আমি নিজের হাতে থার্মোফ্লাস্কটা রেখেছিলাম। উত্তেজনা নিয়ে সুদীপা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল।

—কাপড়ের ব্যাগ! অবিনাশের দু'চোখ গোল হয়ে গেল।

—খদ্দরের কাপড়ের হলুদ রঙের বড় ব্যাগটার চেহারাই মনে হয় তুমি ভুলে গেছ। সুদীপার কপাল ভুরু কুঁচকে উঠল।

অবিনাশ চোখ নামিয়ে মেঝেয় ছড়ানো স্যুটকেস হোল্ড-অল্ ঝুড়ি সাবান চিরুনি আরসি তেলের শিশি স্টোভ টর্চ টিফিন-ক্যারিয়ার জামাকাপড় ছাতা বুরুশ দেখতে লাগল।

—ব্যাগটা কোথায় ফেলে এসেছ? সুদীপার দু'হাত কোমরে উঠে গেল। অবিনাশ কিছু হারিয়ে এলে এভাবে কোমরে হাত রেখে বাড়িতে গিন্নী ঝগড়া করে অবিনাশের পরিষ্কার মনে পড়ল। তার বুক কাঁপতে লাগল।

—ব্যাগের মধ্যে আর কি কি ছিল? ভয়ে ভয়ে শুধাল সে।

—হ্যাণ্ড ক্যামেরাটা ছিল, পকেট-ট্রান্‌জিস্টারটা ছিল।

—ব্যাগটা তো দেখছি না। অবিনাশের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে মেঝেয় ছড়ানো জিনিসগুলি সে আবার দেখতে লাগল।

—অ্যাঁ, সেই বাড়ি থেকে রওয়ানা হবার মুখে পই পই করে বলে রেখেছি, ব্যাগটা হাতে হাতে রাখবে, ওটা যেন হাত-ছাড়া না হয়, আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে স্যুটকেস কি ঝুড়ির মধ্যে ঢোকালে ঝাঁকুনি-টাকুনি লেগে ক্যামেরাটা নষ্ট হতে কতক্ষণ। ট্রানজিস্টারটার গায়েও চোট লাগতে পারে। সাবধানে আনা হবে বলে ঐ দুটো জিনিসের সঙ্গে ফ্লাস্কটাও ব্যাগের মধ্যে বসিয়ে দিলাম—আর সেই ব্যাগই হাওয়া? সুদীপার গলায় হাহাকার ফুটল।

—হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে কুলির মাথায় করে সব মাল যখন ট্রেনে তোলা হয় তখন ব্যাগটা আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম। কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম এখন মনে পড়ছে। কাঁপা গলায় অবিনাশ বলল।

—ট্যাক্সি থেকে নামার সময় আমিই তো বলেছিলাম ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাও, সুবিধে হবে। তারপর কী হল? সুদীপা চেঁচিয়ে উঠল। যেমন সে বাড়িতে চেঁচাত। এটা যে হোটেল নিশ্চয় গিন্নী ভুলে যাচ্ছে। অবিনাশ ভাবল।

—চুপ করে আছ কেন?

সুদীপা আবার জোর মাথা ঝাঁকায়। তার পিঠের চুল বুকে চিবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

—হোল্ড-অল ও স্যুটকেস দুটোর মাঝখানে বাঙ্কের ওপর ব্যাগটা বসিয়ে রেখেছিলাম, মনে পড়ছে। টাইফয়েড রোগীর মতন গলার স্বর অবিনাশের। আওয়াজ প্রায় বেরুচ্ছে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম, ওটা ওখানে ওভাবে রাখ, ঝাঁকুনি লেগে এদিক-ওদিক গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুদীপার চোখ থেকে যেন একসঙ্গে জল ও আগুন ঠিকরে বেরোতে দেখল অবিনাশ।

—তারপর ? তারপর ব্যাগটা কোথায় গেল ?

—তবে কি ওটা ট্রেনে রেখে এলাম ! প্রায় কান্নার মতন চেহারা হল অবিনাশের।

—নিশ্চয়ই, তা না হলে জিনিসটা যাবে কোথায় ? চিবুক শক্ত করে সুদীপা এক সেকেণ্ড অবিনাশের মুখটা দেখল। তারপর দেওয়ালের দিকে চোখ ঘুরিয়ে হাউ-হাউ করতে লাগল।—যেমন করে ভদ্রমহিলার দিকে বার বার তাকানো হচ্ছিল, তখনই আমার ভয় হয়েছিল ট্রেন থেকে নামবার সময় ভুল করে না একটা দুটো জিনিস ট্রেনের বাঙ্কেই রেখে আসা হয়। এখন দেখছি তাই হল।

—না, ভদ্রমহিলার দিকে আমি তেমন করে তাকাইনি। অবিনাশ প্রতিবাদ করতে গেল।

সুদীপা তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে আনল।

—নিশ্চয় তাকিয়েছিলে, আমি দেখেছি। পুরী স্টেশনে যখন ট্রেন ধরল ছোট ছোট জিনিসগুলো জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমি একটা কুলির হাতে তুলে দিয়েছি, বড় ভারি জিনিস ক'টা বেডিংটা সুটকেসটা আর একটা কুলির সঙ্গে ধরাধরি করে তুমি বাঙ্ক থেকে নামাচ্ছিলে, তখনো দেখলাম তোমার চোখটা বার বার সেই মহিলার দিকেই ঘুরে যাচ্ছে, তখনই আমার আশঙ্কা হল কিছু দরকারী জিনিস সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা এবার ট্রেনে রেখে যাব। তাই হল। ব্যাগটা আর বাঙ্ক থেকে নামানোই হল না। ফলে এমন চমৎকার থার্মোফ্লাস্কটা গেল, ক্যামেরাটা গেল, পকেট ট্রান্‌জিস্টারটা চিরকালের জন্য হারাতে হল। কত ভাল জিনিস ছিল ওটা ! ফরেন গুড্‌স।

অবিনাশ চুপ।

—অ্যাঁ ! সুদীপা থামছিল না। আজ আমি বুঝতে পারছি রাস্তায় ঘাটে চলতে, বাজার করতে গিয়ে, দোকানে ঢুকে বা দোকান থেকে বেরোবার সময় কোন্‌দিকে তোমার চোখ দুটো থাকে—তা না হলে এত মনের ভুল হয় মানুষের। উঠতে বসতে এত জিনিস কেউ হারায় ? হাতের জিনিসের দিকে তোমার মন থাকে না চোখ থাকে না, তুমি অন্য কিছু খোঁজ—

—না না, এমন অপবাদ তুমি আমায় দিও না। কাতর চোখে অবিনাশ গিন্নীর চোখ দুটো দেখল।

—উপায়ই বা কি অপবাদ না দিয়ে ? সুদীপার চেহারাটা অসম্ভব থমথমে হয়ে উঠল।—হাওড়া স্টেশনে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের কামরায় উঠলেন, তখন থেকে আরম্ভ করে সারাটা রাস্তা কতবার যে তুমি মহিলাকে

দেখলে, পুরী স্টেশনে গাড়ি ধরল, কথায় কথায় জানা গেল আমরা যে হোটেলে উঠেছি তাঁরাও সেই হোটেলেই ঘর রিজার্ভ করেছেন—মানে পুরীতে এসে একসঙ্গেই আমরা থাকছি, উঠতে বসতে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে, এতৎসত্ত্বেও এমন রাক্ষসের মতন হাঁ করে বার বার ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেখছিলে, কুলির সঙ্গে ধরাধরি করে মালপত্র নামাচ্ছ, ঐ অবস্থায়ও তোমার চোখ দুটো কিনা—

—আমি একটা সত্য কথা বলব? কাঁচুমাচু হয়ে অবিনাশ বলল, জানি না বিশ্বাস করবে কি না।

—ঐ তো, যখনই কোন কিছু হারিয়ে আস, নিজের দোষ ঢাকবার জন্য একটা না একটা অজুহাত খুঁজে-পেতে তুমি বার করবেই—

অবিনাশ মাথা ঝাঁকাল।—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, একশোবার স্বীকার করছি, এমন সুন্দর একটা থার্মোফ্লাস্ক, আর সেই সঙ্গে দু' দুটো বেশ দাম দিয়ে কেনা ফরেনমেড্ জিনিস—হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ও পকেট ট্রান্‌জিস্টারটা হারিয়ে ভয়ানক অপরাধ করেছি, একটা কাপড়ের ব্যাগের ভেতর সেগুলো ছিল, বাঙ্ক থেকে হোল্ড-অল ও সুটকেসটা নামাবার সময় আমি বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রমহিলাকে দেখছিলাম খুব সত্য কথা, আর তাই করতে গিয়ে ব্যাগটা ট্রেনে রেখে এসেছি, বাঙ্ক থেকে নামাতে একদম ভুলে গেলাম, কিন্তু এটাও সত্য, যতবার আমি ভদ্রমহিলাকে দেখেছি, ততবার আমি তোমাকেও দেখেছি—

—আমাকে তুমি কী দেখছিলে? সুদীপা ফুঁসে উঠল, আমাকে কি তুমি নতুন দেখছ?

—আমার চোখে তুমি সব সময় নতুন। বোকা বোকা একটা হাসি ফুটল অবিনাশের মুখে। আমি দেখছিলাম ভদ্রমহিলার গায়ের রং বেশ্রায় ফরসা, নাক চোখ ভুরু সবই ভাল, মাথায় প্রচুর চুল, কিন্তু হলে হবে কি তোমার লাবণ্য তোমার নাক চোখ চুল ভুরু—সব মিলিয়ে যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য, হাসিতে চাউনিতে যে একটা স্বাভাবিক গ্ল্যামার ফুটে বেরোচ্ছে, ভদ্রমহিলার মধ্যে তার ছটাকও নেই, রূপসী হয়েও কেমন যেন ডাল্ ডাল্ ঠেকছিল মানুষটাকে।

—তাতে হল কি? সুদীপা মোটেই চেহারাটাকে প্রসন্ন করল না। আমার লাবণ্য আমার গ্ল্যামার—এসব কথা শুনলেই ভেবেছ আমি তোমাকে ক্ষমা করব, ঘরের তিন তিনটে সুন্দর জিনিস দরকারী জিনিস হারিয়ে এসেছ, কী কষ্ট হচ্ছে আমার মনে!

অবিনাশ চুপ।

গিন্নী চুপ থাকল না।

—নাকি বলতে চাইছ, প্রমাণ করতে চাইছ, ঐ যে সেদিন এখানে আসার আগে আমাকে বুঝিয়েছিলে, গাঙ্গুলীবাগান রোয়ের পায়রার খুপরী থেকে বেরিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে এসে এটা ওটা হারালেও তুমি আমাকে হারাবে না—আমার তিন তিনটে শখের জিনিস ট্রেনের কামরায় ফেলে এসেও আমাকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করে হোটেলে এনে তুলেছ, আর সেই আহ্লাদে আমি বিভোর হয়ে আছি, এই তো ?

অবিনাশ ঘাড় গুঁজে আঙুলের নখ খুঁটতে লাগে। যেন এ ছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না।

—অ্যাঁ, এত ভুলো মন তোমার ! যেন রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এমন একটা চেহারা করল সুদীপা। অথচ আর একটি ভদ্রলোককেও তো এতটা রাস্তা দেখলে। তুমি যদি মিনিটে তিনবার করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিলে, তিনিও কম যাচ্ছিলেন না, আমি আমার রিস্টওয়াচ ধরে হিসেব করেছি, মিনিটে অন্তত দুবার করে চোখটা ঘুরিয়ে ভদ্রলোক আমাকে দেখছিলেন।

—হুঁ। যেন কি ভেবে অবিনাশ হঠাৎ খানিকটা আশ্বস্ত হল। —আমিও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি। সারাটা পথ বড্ড ঘন ঘন তিনি তোমার দিকে তাকাচ্ছেন। যেন ভাল করে একটা সিগারেট খাবারও ভদ্রলোকের সময় ছিল না।

—কিন্তু তাকালে কি হবে—ট্রেন থেকে নামার সময় হোল্ড-অল সুটকেস থেকে আরম্ভ করে ছুঁচটি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোক নেমেছেন, আমাদের তিনগুণ বেশি লটবহর সঙ্গে নিয়ে কলকাতার মনোহরপুকুর রোড থেকে তিনি সস্ত্রীক পুরী বেড়াতে এসেছেন। কুটোটিও তিনি রাস্তায় ফেলে আসেন নি বা হারিয়ে আসেন নি।

অবিনাশ ছোট করে একটা ঢোঁক গিলল। তারপর বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে গিন্নীর মুখটা দেখতে লাগল।

—কি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? চোখ দুটো ছোট করে সুদীপা ঘাড় নাড়ল। —তুমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পার, খুব বেশি দূরে যেতে হবে না, আমাদের পাশের ঘরেই তাঁরা উঠেছেন।

—হুঁ, আমাদের তেরো নম্বর ঘর, বারো নম্বরে তাঁরা উঠেছেন। শুকনো গলায় অবিনাশ বলল।

—তবে আর কি, খোঁজ নিয়ে দেখ, ট্রেনে সারাটা পথ কোটি বার আমার

দিকে তাকালেও ট্রেন থেকে নামবার সময় ভদ্রলোক কী ভীষণ হুঁশিয়ার ছিলেন, একটা ঝিনুকের বোতামও গাড়িতে ফেলে আসেন নি, হারিয়ে আসেন নি।

—না, তা হলে টের পেতাম। তেমনি শুকনো গলায় অবিনাশ বলল, হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বারো নম্বর ঘরের পাশ দিয়েই আমাকে এইমাত্র আসতে হচ্ছিল। মনে হল খুব চুপচাপ ঠাণ্ডা ওই ঘরের ভেতরটা। যদি ভদ্রলোক কিছু হারিয়ে আসতেন কি ট্রেনে ভুল করে কিছু ফেলে টেলে আসতেন, এতক্ষণে হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে যেত। ভদ্রমহিলা খুব গালমন্দ করতেন হাজব্যাণ্ডকে—

—হুঁ হাজব্যাণ্ড! গালের মাংস দলামোচা করে ভুরু কুঁচকোল সুদীপা। হাজব্যাণ্ড যদি হাজব্যাণ্ডের মত না হয়—গালমন্দ করবে না তো কি তাকে পূজো করবে মেয়েরা? রেখে আসতেন ভদ্রলোক একটা ট্রানজিস্টার একটা হ্যাণ্ড ক্যামেরা কি একটা ফ্লাস্ক ওই ট্রেনের কামরায়—দেখতাম ভদ্রমহিলা কী করেন তখন? এতক্ষণে ঝড় বয়ে যেত না বারো নম্বর ঘরে! তুলোধুনো করে ছাড়তেন তিনি অমন স্বামীকে।

—হুঁ তা করতেন। অবিনাশ ঘাড় কাত করল।—সেই তুলনায় বলতে গেলে তুমি আমায় প্রায় কিছুই করছ না, কিছুই বলছ না। তোষামুদে গলায় বলল সে।

সুদীপার তাতে মোটেই মন গলল না।

—আজ পুরী এক্সপ্রেসে যা কাণ্ড করে এসেছ, কেবল তাই না, সারাজীবন, বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছি, কত কি যে হারালে তুমি—ওফ্ এমন স্বামী কারো হয়! তোমাকে কী করতে ইচ্ছে করে বলতে পার! অবিনাশ দেখল চোখে আঁচল চাপা দিতে গিয়েও গিন্নী তা করল না, হাতটা নামিয়ে ফেলল, বরং জলের বদলে দু চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিল সুদীপার।

—ঐ যে! গলার স্বরটা আর একটু নরম করল অবিনাশ, চোখে-মুখে আর একটু কাতরতা ফুটিয়ে বলল,—বার বার সেই মহিলার দিকে তাকাতে গিয়ে, মানে এত রূপসী তিনি, তবু তোমার সঙ্গে তাঁর তফাতটা কোথায়, তোমার পাশে তিনি দাঁড়াতে পারছেন না কেন, খুঁটিয়ে এসব দেখতে গিয়ে বিচার করতে গিয়ে তিন তিনটে দামী জিনিস আজ আমি হারিয়েছি, খুব সত্য কথা, একসঙ্গে এত জিনিস আর কোনদিন হারাই নি, এত ভুল আর আমার কখনো হয় নি।

—সেই এক কথা! এবার আগুনের বদলে অনুকম্পা ঝরাল সুদীপা তার চোখ থেকে। চেহারাটা ভেঙে-চুরে আরও বিকৃত করে ফেলল। —আমার জন্যে উনি সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন, আমার কথা ভেবে ভেবে সব কিছু হারিয়ে

আসছেন, স্ত্রীর রূপলাবণ্যের চিন্তায় আমার স্বামী চব্বিশ ঘণ্টা বুঁদ—এসব খোশামুদে কথার কোন মানে হয় ?

—এর মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে নেই সুদীপা, আমি ঠিকই বলছি, আমার কথায় এতটুকু ভেজাল নেই। তোমার জন্যে—স্রেফ তোমার জন্যে…

—চুপ কর !—গিন্নী জোরে ধমক লাগাল। অবিনাশ থতমত খেল।—আমার জন্য, আমাকে খুশি করতে তিনি উঠতে বসতে এটা ওটা হারাচ্ছেন। দু' হাত শূন্যে ঘুরিয়ে সুদীপা আবার চেঁচাতে আরম্ভ করল। যেন আমার কানে এসব ঢাললে আমি সাত খুন মাফ করব !

—আস্তে ! অবিনাশ সঙ্কুচিত, ভয়ার্ত গলায় বলল, মনে রেখো এটা হোটেল, আমাদের গাঙ্গুলীবাগান রোয়ের বাড়ি না, এত চেঁচামেচি করলে লোকে ভাববে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বুঝি কেবল ঝগড়াই করি, আমাদের দাম্পত্য-জীবনে সুখ-শান্তি বলে কিছু নেই। যে-কোনদিন ডাইভোর্সের মামলা করে আমরা একজন আর এক জনের কাছ থেকে খসে পড়ব।

—ভাবুক না লোকে তাই। আমিও তাই চাইছি। সুদীপার গলার স্বর একটুও নরম হল না।—লোকের ভাবাভাবি আমি খুব গ্রাহ্য করি কিনা! দাম্পত্য-জীবনের সুখ-শান্তি, গাল-ভরা কথা ! কেমন জীবন আমি কাটাচ্ছি, কতবড় অপদার্থ পুরুষ নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়, লোকে একবার এ ঘরে উঁকি দিয়ে এসে দেখুক।

পাশের ঘরেই ওঁরা রয়েছেন। মিঃ সেন আর তার ওয়াইফ। অবিনাশ স্ত্রীকে সতর্ক করে দিল। ওঁরা মনোহরপুকুর রোডের মানুষ—আমাদের পাড়া থেকে খুব একটা বেশি দূরে না, একসঙ্গে ট্রেনে আসতে আসতে মোটামুটি আলাপ-পরিচয়ও হল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে-কোনদিন দেখা হয়ে যেতে পারে।

—হোক দেখা ! নতুন করে সুদীপা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।—মিঃ সেন আর তাঁর ওয়াইফ। মানে তাঁর ওয়াইফটিকে এখনও আমার ঘরের কর্তা ভুলতে পারছেন না। লক্ষবার ওর দিকে তাকাতে গিয়ে আমার এমন শখের তিন তিনটে জিনিস তিনি রাস্তায় খুইয়ে এসেছেন ! এই ব্যথা আমি কাকে জানাব।

—আহা, আবার তুমি ভুল করছ, আমার ওপর অবিচার করছ। অবিনাশ নতুন করে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।—বলছি, ওই মহিলাকে দেখতে গিয়ে বার বার তোমাকেই দেখেছি, তোমার পাশে উনি কোন দিক থেকেই দাঁড়াতে পারেন না—না কমপ্লেকশন না ফীগার না চোখ-মুখ…

—আর আমার মন ভেজাতে হবে না, তোমার পায়ে ধরি, এ সমস্ত ছুতো আমি একদম শুনতে চাই না।

—চুপ চুপ! অবিনাশ ঠোঁটে আঙুল রাখল। সুদীপা চুপ থেকে দু' কান খাড়া করে ধরল। দরজার কড়া নাড়ছে কেউ।

—কে?

—আমি…

আসুন আসুন অবিনাশ দরজা খুলে দিল!

॥ ২ ॥

ট্রেনের সেই সহযাত্রী, সস্ত্রীক যিনি হোটেলের বারো নম্বর ঘরে উঠেছেন—ভোলা সেন। উঁচু লম্বা জবরদস্ত চেহারার পুরুষ। টাই-স্যুট পরা। খাড়া নাক। তেজী ধারালো দুটো চোখ। ত্রুটির মধ্যে এই বয়সেই, অর্থাৎ অবিনাশের মতন বয়সেই মাথায় টাক পড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাঁর প্রগল্‌ভ হাত নাড়া চোখ নাড়া বুদ্ধিদীপ্ত হাসি ও চমৎকার বাচনভঙ্গির কাছে মাথার টাকটা যেন নিতান্তই তুচ্ছ—চোখে পড়ার মতন নয়। এইটুকুন খুঁত অন্য আর দশটা গুণের কাছে চাপা পড়ে গেছে।

—বসুন। অবিনাশ সমাদর করতে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো বিদঘুটে চেহারার বেতের চেয়ারটা দেখাল।

—উঁহু। ভোলা সেন মাথা ঝাঁকাল। অবিনাশ ভাবল, নিশ্চয় ছারপোকার ভয়ে ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে রাজী হচ্ছে না। পৃথিবীর সব জায়গায় সব হোটেলে চেয়ার টেবিল খাট আলমারী ছারপোকার ডিপো। কিন্তু পরক্ষণে অবিনাশ বুঝল ঠিক তা নয়।

—আপনাদের কিছুই দেখছি এখনো গুছনো হয়নি। প্রথমটা অবিনাশের চোখে চোখ, পরে সুদীপার দিকে চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়ে ভোলা সেন বন্ধুর মতন হাসল। এই অবস্থায় আর বসি কি করে। ঘরময় ছড়ানো জিনিসপত্রের দিকে আর এক পলক তাকিয়ে নিয়ে উঁচু লম্বা মানুষটা তৎক্ষণাৎ আবার সুদীপাকে দেখল। সুদীপা ঈষৎ সঙ্কুচিত আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। রাগারাগির দরুন বেণী খুলে গেছে, গায়ের আঁচল-টাচলটাও ঠিক নেই। তা হলেও সহজাত মেয়েলী পটুতা নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সে সামলে নিল। কেবল তাই না, খুব কাছের একটি আত্মীয়ের মতন ভদ্রলোক সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েছেন দেখে এক সেকেণ্ডের

কম সময়ের মধ্যে চোখের জল আগুন ঘেন্না বিদ্বেষ, অর্থাৎ ততক্ষণ অবিনাশের ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে যা যা বর্ষিত হচ্ছিল চট করে সরিয়ে নিয়ে অপূর্ব হাসির ছটায় মুখখানাকে দীপান্বিতার রাতের মতন ঝলমলে করে তুলেছে।

—টায়ার্ড। ট্রেন-জার্নির বিচ্ছিরি ধকল সামলাতে দেরি হচ্ছে। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। মিষ্টি গলার স্বর সুদীপার! সেই সঙ্গে একটা লাজনম্র মনোহর কটাক্ষ ভোলা সেনকে উপহার দিতেও সুদীপা ভুল করল না।

—বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। ভোলা সেনের সুগোল পরিপুষ্ট খাঁজ-কাটা থুতনি নেচে উঠল। হাসল।—হোটেলের নিরিবিলি ঘর পেয়ে কপোত কপোতীর আলস্যের কুজন-গুঞ্জন চলছে এখনো।

রক্তাভ হয়ে উঠল সুদীপা। যে জন্য তাকে আরও সুন্দর দেখাল। অবিনাশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিল। তার ঠোঁটের কোণায় নিশ্চিন্ত আরামের হাসি ফুটে উঠেছে।

—আপনাদের নিশ্চয়ই এর মধ্যে গোছানো-টোছানো হয়ে গেছে? আস্তে বলল সে।

—না না! চতুর কাকের মতন ভোলা সেন অবিনাশের দিকে ঘাড় ঘোরাল।

—আমার উনি এখন পর্যন্ত বাঁধা-ছাঁদাই খোলেন নি। রিক্সা থেকে তুলে এনে যে যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল সেই অবস্থায় পড়ে আছে। বেডিং স্যুটকেশ থলে বাস্কেট ঝুড়ি পাহাড়ের মতন মেঝেয় স্তূপ করে ফেলে রেখে মিসেস প্রকাণ্ড ঘুম দিয়েছেন।

'প্রকাণ্ড' শব্দটা বলতে গিয়ে ভোলা সেন মুখের হাঁ-টাকে এতটা ছড়িয়ে দিল। দেখে অবিনাশের হাসি পেল। সুদীপা হাসছে কি না দেখতে অবিনাশ সেদিকে চোখ ঘোরাতে গিয়ে থমকে গেল, সাহস পেল না, যদি এই মুহূর্তে এভাবে তাকালে গিন্নী অসন্তুষ্ট হন।

—আপনাদের জিনিসপত্তর ঠিক ঠিক সব এসে পৌঁছেছে নিশ্চয়ই? রূপালি গলায় সুদীপা প্রশ্ন করছিল—মিঠে আওয়াজে অবিনাশের দু' কান জুড়িয়ে গেল।

—হ্যাঁ, তা আর বলতে। দরাজ গলা ভোলা সেনের। সেই সঙ্গে হাসি-খুশির চুমকি মিশে গলার আওয়াজটা ঝলমল করছিল। অবিনাশ যেন সেদিকে ভাল করে তাকাতেই পারছিল না। দেওয়াল দেখছিল।—আমার হল শ্যেনের দৃষ্টি—বাজের চোখ, সেফটিপিনটিও রাস্তায় ফেলে আসব হারিয়ে আসব সেটি হবার জো নেই। অবিনাশ দেখল না বিশাল হাত শূন্যে ছড়িয়ে দিয়েছে ভোলা সেন।—এই হাত দিয়ে বাড়িতে একলাই সব বাঁধা-ছাঁদা করেছি, তারপর

টেনে টেনে সব ট্যাক্সিতে তুলেছি, ট্যাক্সি থেকে কুলি ডেকে ট্রেনে, ট্রেন পুরী স্টেশনে ধরল কি সঙ্গে সঙ্গে কুলি ডেকে সব আবার তাদের মাথায় চাপিয়েছি, রিক্সা ডেকেছি, রিক্সা থেকে সোজা হোটেলের বারো নম্বর ঘর—উঁহু, কাগজের টুকরোটিও আমি হারাতে দিই নি।

সুদীপা সম্মোহিতের মতন শুনছিল। অবিনাশ সেদিকে না তাকিয়েও অনুমান করল। ভোলা সেন থামতে গিন্নীর গলা আবার রুপোর ঘণ্টার মতন শব্দ করে উঠল।

—মিসেস সেন ভাগ্যবতী। তাঁর সংসারে কুটোটিও হারায় না।

—হুঁ, তা বলতে পারেন। এমন বাজের মতন চোখ যার স্বামীর। ভোলা সেন আর এক দফা হাসল। যেহেতু ছুঁচটিও রাস্তায় ঘাটে কোনদিন ফেলে যেতে হারিয়ে যেতে দিতে আমি রাজী নই।

—চমৎকার! সুদীপা উচ্ছ্বাস জানাতে গিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

—হুঁ, চমৎকার বটে। ভোলা সেন আর হাসল না।—ওপর থেকে দেখে তাই মনে হয়, বাইরে থেকে দেখলে তাই বোঝা যায়। যাওয়া উচিত। কিন্তু এই নিয়ে অশান্তিও কম যায় না আমার সংসারে। এক একদিন ঝড়। ভূমিকম্প।

—কেন কেন? সুদীপার চোখে-মুখে কৌতূহল উপচে পড়ল। পর্যন্ত অবিনাশের চোখে। ভোলা সেনের কথা শুনে এবার সে সেদিকে ঘাড় না ঘুরিয়ে পারে না।

—দিন, আপনার আগুনটা দিন। ভোলা সেন অবিনাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।—আপনাকে বিরক্ত করতে আসা। অনেকক্ষণ সিগারেট খাই নি।

উঁহু, এতে বিরক্ত হবার আছে কি। অবিনাশ খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে লাইটার বের করে ভোলা সেনের হাতে তুলে দিল। সুদৃশ্য প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা ঠোঁটে গুঁজে আর একটা অবিনাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভোলা সেন হৃষ্ট মনে নিজেরটা ধরিয়ে নিল। তারপর অবিনাশের লাইটার অবিনাশকে ফিরিয়ে দিল। অবিনাশ সিগারেট ধরাল।

—আপনি কিছু মনে করবেন না, মিসেস গাঙ্গুলী। একটু বেয়াদপী হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভোলা সেন হাসল।

—কিছু না। সুদীপা ঘাড় নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে অবিনাশকে দেখাল।

—ও ও-তো খাচ্ছে।

—তা হলেও ঘরের লোক উনি, নিজের মানুষ। আমি যে তৃতীয় ব্যক্তি।

প্রায় চোখ টেপার মতন চোখ করে ভোলা সেন সুদীপাকে দেখল। গুজ গুজ করে হাসল।

—না না। একসঙ্গে এতটা পথ এসেছি, এক হোটেলে উঠেছি। অবিনাশ দেখল সুদীপার চোখের পাতা হঠাৎ মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে।—প্রায় আত্মীয়ের মতন বন্ধুর মতন হয়ে গেছি আমরা দুটো পরিবার। মাটির দিকে চোখ রেখে সুদীপা কথাগুলি শেষ করল।

—বাঁচালেন। ভোলা সেন আর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী মুখ থেকে বের করে আকাশে ছড়িয়ে দিল।—আমার লাইটার এখনো বাক্সবন্দী হয়ে ওঘরে পড়ে আছে। সারা রাস্তা ওটা আর খোলাই হল না।

—অতিরিক্ত সাবধানী, পাছে হারিয়ে যায়। চোখ তুলে সুদীপা চিকন করে হাসল। আমি লক্ষ্য করেছি, ট্রেনে বার বার ওরটা জ্বেলে কাজ চালিয়েছেন।

—হুঁ, সিগারেট ধরিয়েছি। কাজেই বুঝুন আমার গিন্নী কেনই বা আমাকে হিংসা করবে না ঈর্ষা করবে না, সময় সময়, লক্ষ্য করি, আমার চালচলন দেখে মৃদুলার যেন ঘেন্নাই হয়, আমি ওর চাউনি দেখে টের পাই।

—সেকি। সুদীপার মতন অবিনাশও অবাক হয়। অনেকক্ষণ পর অবিনাশ কথা বলল।—সাবধানী হওয়া তো ভাল। অসাবধান হলেই এটা ওটা হারায়।

—হুঁ, ভাল, কিন্তু এতটা সাবধানী হওয়া ভাল না! কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি তুলে শরীরটা একটু নাচিয়ে ভোলা সেন বলল, এই যে বলেছি সুতোটা আলপিনটা, এমন কি কাগজের টুকরোটা আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাবে সরে যাবে হারিয়ে যাবে এ আমি হতে দিই না। আর মৃদুলার, আমার গিন্নীর চোখের সামনে দিয়ে হাতিটা চলে গেলেও টের পায় না। মানে হাতির মতন প্রকাণ্ড কিছু হারিয়ে গেলেও ধরতে পারে না। যে জন্য আমাকে ওর এত ঈর্ষা হিংসা বিদ্বেষ।

অবিনাশ ও সুদীপা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল।

—মৃদুলা বলে, ভোলা সেন বলে চলল, পৃথিবীর সব কিছু সব সময় তুমি হাতের মুঠোয় ধরে রাখবে, কিছুই হারাবে না—হারাতে দেবে না, এ হয় না, হওয়া উচিত নয়। কোন না কোন সময় কিছু না কিছু তোমাকে হারাতেই হবে, মাঝে মাঝে এটা ওটা হারিয়ে যেতে দেওয়া ভাল।

—তারপর? রুদ্ধশ্বাস সুদীপা। অবিনাশ দেখল কৌতুকে বিস্ময়ে গিন্নীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। সে নিজেও কম মজা পাচ্ছিল না। এ-ঘরে

বোতামটা হারালে সুদীপা কুরুক্ষেত্র বাধায়, ওঘরের পুরুষ বোতামটাও হারান না বলে স্ত্রীর ক্রোধ বিরক্তি মনস্তাপের শেষ নেই।

—ঐ তো বললাম। হাতের কাছে অ্যাসট্রে জাতীয় কিছু দেখতে না পেয়ে ভোলা সেন সিগারেটের শেষ টুকরোটা বারান্দার দিকে ছুঁড়ে দিল।—কিছুই আমি হারাচ্ছি না বলে মৃদুলা আমাকে সময় সময় ঘেন্নাও করে, ওর চোখ দেখে আমি টের পাই।

—এটা ভাল নয়। সুদীপা ধীরে মাথা নাড়ল।

—অবুঝের মতন এমনটা করা মিসেস সেনের উচিত নয়। হারানো মানেই তো লোকসান হওয়া—যা দিনকাল। যেটা গেল চিরকালের মতন গেল। আবার একটা কেনা হবে, যোগাড় করা হবে তবে তো! কিন্তু তেমনটা যে হবে—অর্থাৎ যেটা হারিয়েছে অবিকল সেই রকম আর একটা যোগাড় করা কি কিনতে পারা সব সময় সম্ভব না-ও হতে পারে। বক্তৃতার মতন করে বলল অবিনাশ।

—কে একথা বোঝাবে আমার গিন্নীকে। ভোলা সেনের মুখটা থমথমে হয়ে হয়ে উঠল, ভক করে একটা ভারি নিশ্বাস ফেলল।—পারেন তো আপনারা বোঝাবেন আমার গিন্নীকে। সুদীপা ও অবিনাশকে একসঙ্গে দেখল ভোলা সেন। কাতর দৃষ্টি।—একসঙ্গে আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, কলকাতার মানুষ, এক হোটেলে আছি—বন্ধুর মতন আত্মীয়ের মতন মিলেমিশে দুটো পরিবার সমুদ্রের ধারে ক'দিন কাটিয়ে যাব, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে!

—নিশ্চয়। সুদীপার দেখাদেখি অবিনাশ মাথা ঝাঁকাল।

—চলি, দেখা হবে।

ভোলা সেন তড়বড় করে বেরিয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

ভিড়। লোকের মাথা লোকে খায় এই সময়টায় পুরীতে। তার ওপর দুদিন ধরে আবহাওয়াটা অদ্ভুত ভাল যাচ্ছে।

শোনা গেল এর আগে ক'দিন একটানা ঝড়-ঝাপটা গেছে। ভাদ্রের শেষটায় নাকি বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। আশ্বিন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁপরভাজার মতন শুকনো মুচমুচে হয়ে গেছে দিন। পদ্মপাপড়ির রং ধরে সকাল হয়, বিকেল পড়তে রঙীন ফুলের ছটা লাগে পশ্চিম আকাশে।

খুব বেড়াচ্ছেন ওঁরা। সস্ত্রীক ভোলা সেন। সস্ত্রীক অবিনাশ গাঙ্গুলী। উঁহু, ভিড়ের সঙ্গে মিশছেন না।

কলকাতার মানুষ কম এসেছে? গিসগিস করছে। পায়ে পায়ে চেনা-মুখ পড়ে যাচ্ছে। তা যাক, কারো সঙ্গে ওঁরা এখানে এসে মোটে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। না গাঙ্গুলী পরিবার। না সেন ফ্যামিলী।

সব ভিড়, সমস্ত চেনা-মুখ এক দিকে ঠেলে দিয়ে দুটো পরিবার আত্মীয়ের মতন বন্ধুর মতন একত্র হয়ে হাত-ধরাধরি করে সমুদ্রের ধারে ঝাউবনের আনাচে-কানাচে বালির ঢিবির আশে-পাশে ছুটছেন হাঁটছেন বেড়াচ্ছেন বা গোল হয়ে বসে গল্প করছেন। দরকার হলে বালির বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ছেন।

তাছাড়া গরমের দেশ। মাজাঘষা পরিষ্কার আকাশ পেয়ে আশ্বিনের রোদ এক এক সময় যেন গায়ে ছেঁকা লাগায়। কাজেই সান-বাথ মোটে চলে না।

যেখানে ঠাণ্ডা ঝাউয়ের ছায়া সেখানে ওঁরা বসছেন, শুয়ে পড়ছেন।

ভোলা সেনের পাশে অবিনাশ গাঙ্গুলী। সুদীপার পাশে মৃদুলা। যেন দুটি ভাই। দুটি বোন।

একবয়সী হয়েও উঁচু লম্বা জবরদস্ত শরীর ভোলা সেনকে মনে হবে বড় ভাই। রোগা পাতলা চেহারার অবিনাশকে মনে হয় ছোট ভাই।

তেমনি সুদীপা মৃদুলা।

ফরসা টুকটুকে ছোটখাটো মৃদুলা। সারাক্ষণ চোখে-মুখে ঘুম ঘুম ভাব। যেন এই মাত্র ঘুমিয়ে উঠেছে। হাই তুলছে। শ্বেতকরবীর পাপড়ির মতন গোল ভারি চোখের পাতা ঘুমের রসে টুসটুসে হয়ে আছে। ঘুমিয়ে উঠে হাই তুলছে, তার মানে এখনি আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে মহিলা খুশি। ঢিলেঢালা দেহ।

তুলনায় আঁটসাঁট সতেজ দীর্ঘ কাঠামো সুদীপাকে কত জাগ্রত সচেতন দেখায়। যেন একটি রজনীগন্ধার ডাঁটি। অনুক্ষণ বাতাসে হেলছে দুলছে। আলস্য জড়তার প্রশ্রয় নেই।

মৃদুলাকে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে কি এক জায়গায় বসছে, সুদীপা একাই তখন ঠোঁট নাড়ছে। চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরিয়ে এদিক দেখছে ওদিক দেখছে। এই চোখকে ফাঁকি দেবে, এই মনকে ধোঁকা দিয়ে পৃথিবীতে কেউ কিছু করে সারতে পারবে, এ যেন প্রায় হিমালয় টপকানোর মতন ব্যাপার। অর্থাৎ কিছুতেই যা সম্ভব নয়। আর এমন এক সখী, সখী কেন, বড় বোন মেনে নিয়ে সেই প্রথম দিন থেকে অবিনাশের স্ত্রীকে দিদি ডাকতে আরম্ভ করেছে মৃদুলা—যেন একান্ত নির্ভরযোগ্য একটি অভিভাবিকা পাওয়া গেছে। এই

মানুষের ছায়ায় উঠতে বসতে পেরে, সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ঝাউবনের ছায়ায় অকাতরে বিশ্রাম করার সুযোগ পেয়ে মৃদুলা যে কত নিশ্চিন্ত, কত আরামবোধ করছে তার ঘুমো-ঘুমো প্রসন্ন পরিতুষ্ট মুখখানার দিকে তাকালে বোঝা যায়।

বেড়াতে বেরিয়ে তারা অনেক সময় হোটেলে ফিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এইজন্য সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়ে বেরোচ্ছেন। হাঁটতে হাঁটতে কখন কতটা দূরে চলে যেতে হবে তার ঠিক কি। তাই দেখা যায় যখন দুটি পুরুষ জোড়া বেঁধে হাঁটেন তখন তাঁদের হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার, কাঁধে দুটো-তিনটে করে ব্যাগ ঝুলছে।

শুকনো খাবার। পাউরুটি ডিমের বড়া মাখন কলা সন্দেশ আপেল কিসমিস। বা হোটেলের ঠাকুরকে পয়সা দিয়ে মাছ কিনে মাছ ভাজিয়ে আনা।

সেন পরিবার কলকাতা থেকে আসার সময় বুদ্ধি করে সঙ্গে একটা কেরোসিনের স্টোভ এনেছে। তা সেটাও কাঁধে করে কিছু-হাঁটা-চলা করা সম্ভব না। যদি তা পারা যেত তবে অবশ্য কথাই ছিল না। নিরিবিলি ঝাউবনের এক কিনারে বসে রান্নাবান্না করে দারুণ পিকনিক জমিয়ে দেওয়া যেত।

—আমার মাংস রান্নার হাত যা না। আপনাকে বোঝাতে পারব না মিঃ গাঙ্গুলী। আমার মিসেস তো, ঐ যে বলেছি, আমি অতিরিক্ত সাবধানী অতিরিক্ত হুঁশিয়ার বলে আমার ওপর বেজায় খাপ্পা—ভেতরে ভেতরে রাগ-ঘেন্নারও অন্ত নেই, কিন্তু হ্যাঁ, মুখ ফুটে উনি স্বীকার করেন, আমার ওই একটা গুণের জন্য আজও নাকি আমার সঙ্গে তিনি ঘর করছেন—আমার রান্না মাংসের তুলনা নেই।

অবিনাশ হাসে।—তাহলে যেদিন রাগারাগিটা বেশি হয় বা জোর মন-কষাকষি চলতে থাকে সেদিন নিশ্চয়ই গিন্নীকে ঠাণ্ডা করতেও আপনাকে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। মাংস রেঁধে খাইয়ে দিলেই, ব্যস্—

হেসে ভোলা সেন মাথা ঝাঁকাল।—যা বলেছেন। হুঁ, তাই তো আমি করি।

—আহা, আমার যদি এই গুণটা থাকত। 'অবিনাশ হাসি-হাসি মুখ নিয়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ও তো খুব একটা কঠিন কাজ নয় মশাই। রান্নার কথা বলছি। একটু চোখ নামালেই হল, একটু খেয়াল করলেই হল। খানিকক্ষণ থেমে থেকে ভোলা সেন প্রশ্ন করল, কেন, আপনাদের মধ্যেও লটখটীও বাধে বুঝি?

—খুব।

—কারণ?

—আপনি যেমন অত্যধিক হুঁশিয়ার, তেমনি আমি ঠিক উল্টো, অতিরিক্ত অসাবধানী, অনবরত এটা হারাচ্ছি, ওটা হারাচ্ছি।

—এই ছাখো। কথাটা শুনে ভোলা সেন দারুণ মজা পেল। আমি যদি আপনি হতাম তো আমার গিন্নী আমাকে মাথায় তুলে নাচতেন।

—তা তো বটেই। আমি আপনার মতন হলে আমার মিসেসও তাই করতেন, ঠিক মাথায় নিয়ে না নাচলেও ঝগড়াঝাঁটিটা কম করতেন। কিন্তু মুশকিল—আপনার যেমন রান্নার হাত আছে, বিশেষ করে মাংস, আমার এই গুণটা একেবারে নেই।

—মাংস না পারেন মাছ রেঁধে খাওয়ান। তেমন করে রাঁধতে জানলে—মাছের ঝোল হোক ঝাল হোক, বুঝেছেন মিঃ গাঙ্গুলী, গিন্নীর মন জয় করতে, ঘরের ঝগড়া মেটাতে অভিমান ভাঙাতে একফোঁটা বেগ পেতে হবে না আপনাকে।

—তা হয়তো হবে না। কিন্তু মাছই কি ছাই আমি রাঁধতে জানি! এই জীবনে কোনদিন উনুনের ধারেই যাইনি।

—এটা আপনারা ভুল করেন। আর না হেসে গম্ভীর হয়ে ভোলা সেন বলল, পুরুষকে রান্নার ব্যাপারটা রপ্ত করতেই হবে—মানে মেয়েদের যা নিয়ে চব্বিশঘণ্টা থাকতে হয়। সেখানে আগু বাড়িয়ে আপনি যদি এটা-ওটা উনুন থেকে নামিয়ে দেন—গিন্নীরা মনে মনে খুশি থাকেন। আর, একটা আধটা পদ ভাল রান্না করতে পারলে তো কথাই নেই।

—আমার আর এই জিনিস হল না। হতাশ হয়ে অবিনাশ মাথা ঝাঁকাল। হয়তো কোনদিন হবেও না।

—চেষ্টা করেছিলেন?

—একদিন করেছিলাম।

—কি রকম? ভোলা সেন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—একদিন—বলতে গিয়ে অবিনাশ হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। মিসেস সেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে সুদীপা হাঁটছে—ওদের দু'জনের কি নিয়ে গল্প হচ্ছে জানতে অবিনাশের ভয়ানক ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা আর কি করে সম্ভব।

সুদীপার কাঁধে জলের ফ্লাস্ক। মিসেস সেনের কাঁধে গরম কফি ভর্তি থার্মোফ্লাস্ক ঝুলছে। অবিনাশের ওটা, যেটা ট্রেনের কামরায় রেখে এসেছে, হলদে ছিল, মিসেস সেনের কাঁধের ওটার টকটকে কমলা রং।

একটু পরেই ঝাউবনের ছায়ায় বসে ওই চমৎকার কমলা রঙের ফ্লাস্ক থেকে সেন-গিন্নী কফি ঢেলে দেবেন ভেবে অবিনাশ ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভব

করছিল। হুঁ, যেমন কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দুটিতে গল্প করতে করতে হাঁটছে। যেন দুটি সখী। দুটি বোন। সুদীপা বড় বোন। মিসেস সেন যেন ছোট। পিছন দেখা শেষ করে অবিনাশ এদিকে ঘাড় ফেরায়।

বুঝেছেন? ভোলা সেনের চোখের দিকে তাকিয়ে সে মাথা ঝাঁকাল। একদিন গিন্নীর জ্বর হল। অসুখ করে ঝিটাও কামাই করল। তা না হলে ও-ই রান্নার ঠেকা দেয়। যাই হোক, কি করা যায়, ভাগ্যিস আমার ছুটির দিন সেটা, দিলাম চোখ-মুখ বুজে ভাত চাপিয়ে। ওফ্, যা ভাত হয়েছিল না! ভাগ্যিস গিন্নী খায়নি।

—কি হয়েছিল? পোড়া লেগেছিল তাতে? ভোলা সেন নাকে হাসল।

--গলে সাগু হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর?

—ভাত তো হল, সঙ্গে আলু-সেদ্ধ। কিন্তু কেবল সেদ্ধ দিয়ে খাওয়া যায় না। মুগের ডাল চাপিয়ে দিলাম।

—হুঁ, চমৎকার। ভোলা সেন চোখ পাকাল। মশাই, মাছ-মাংসের কথা বললাম, কিন্তু ওই ডাল, বিশেষ করে মুগ ডাল, যদি তেমন করে ফুটিয়ে জিরে-লঙ্কার ফোড়ন দিয়ে নামাতে পারেন—আপনার হাতের ওই ডাল খেয়েও আপনার মিসেস ঝগড়া বিবাদ রাগ অভিমান ভুলে যেতে পারেন, অন্তত সেদিনকার মতন একটু স্পেশাল খাতির যত্ন আদর সোহাগ গিন্নীর কাছ থেকে পেতে পারেন। পাবেনই।

—আমি পাইনি, আদরের বদলে গিন্নী আমাকে, কি বলব—গলার স্বরটা চেপে গিয়ে অবিনাশ একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।—আপনার কাছে লুকোব না। ডাক্তারের কথা মতন দু স্লাইশ পাঁউরুটির সঙ্গে একটু মুগের জুস খেতে দিয়েছিলাম গিন্নীকে। ব্যস, ডালের বাটিতে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে গিন্নী বাটিটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

—তারপর?

—আমার পরনের লুঙ্গি গেঞ্জি ডালে ছোপাছুপি হয়ে গেল।

—হুঁ, তা তো হবেই, হলুদ একটা ছোপ ধরল সঙ্গে সঙ্গে, তাই না? ডালে হলুদ দিয়েছিলেন নিশ্চয়?

—হুঁ, তা দিয়েছিলাম।

—তবে বিস্বাদ হল কেন, বলছেন ডালে চুমুক দিয়ে আপনার মিসেস মুখ বিকৃত করে বাটিটা ছুঁড়ে মারলেন। হাঁটা থামিয়ে ভোলা সেন দাঁড়িয়ে পড়ল। অবিনাশও দাঁড়াল।

—ঐ যে, আমার ভুলো মন, ভুল করে এটা ওখানে রেখে আসি, ওটা সেখানে ফেলে আসি, আর তাই করে ক্রমাগত এটা-ওটা হারাচ্ছি—তেমনি সামান্য একটা ডাল রাঁধতে গিয়ে ডালে নুন দিতে ভুলে গেলাম—

—এই সেরেছে! ভোলা সেনের ঠোঁট দুটো পানসী নৌকোর মতন বেঁকে গেল। একে তো জ্বরের মুখ, জিভটা পচে ছিল ভদ্রমহিলার, তায় কিনা নুন ছাড়া ডাল।

—তাই বলছিলাম, রান্না আমাকে দিয়ে হবে না, জ্বরে ভুগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন সেদিন গিন্নী, নয়তো ডালের বাটিটাই আমার মাথায় ভাঙতেন।

যেন অনেক দুঃখে অবিনাশ হাসল। আর কথা না বলে, কোনরকম মন্তব্য না করে ভোলা সেন হাঁটতে থাকে। দেখাদেখি অবিনাশ পা চালায়। হাঁটতে হাঁটতে ভোলা সেন বলে, তবে অন্য আর কোন রাস্তায় গিন্নীর মন পেতে পারেন কিনা চেষ্টা করে দেখুন। অবিনাশ শব্দ করে না।

॥ ৪ ॥

চারদিক ঘিরে বালির ঢিবি। জায়গাটা চমৎকার। সমুদ্রের গর্জন শোনা গেলেও সমুদ্র এখান থেকে চোখে পড়ে না।

মাথার ওপর জমাট ছায়া ছড়িয়ে একসারি ঝাউ।

আমরা একটা দুর্গের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলাম, কি বলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

ভোলা সেন ডিমের বড়া ভেঙে মুখে পুরল।

সুদীপা অল্প শব্দ করে হেসে ঘাড় কাত করল।

সুদীপাই পরিবেশন করছে। যে জন্য খেতে বসে অবিনাশ একটু দমে গেল। মিসেস সেন অন্তত কফিটা সার্ভ করবেন, অবিনাশ মনে মনে আশা করেছিল। কিন্তু দেখা গেল মহিলা সব কিছু সুদীপার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। যেন তিনি এসবের কিছুই বোঝেন না, কেমন করে দুটি পুরুষের সামনে খাবার-টাবারটা সাজিয়ে দিতে হয় এই ব্যাপারে তিনি একেবারে আনাড়ী। অথবা যেন বড়দিকে—মানে সুদীপাকে পেয়ে তিনি ছোট বোনটি সেজে কিছুই করবেন না এমন একটা পণ করে রীতিমত আহ্লাদী চেহারা করে কেবল টুকটাক এটা ওটা মুখে পুরছেন।

দু-পরিবারের দুটো টিফিন-ক্যারিয়ার এখন একত্র মিলে গেছে। স্বাভাবিক। একসঙ্গে চারজন বসে খাচ্ছে। ওরা, মানে ভোলা সেন ও মৃদুলা ডিম পাঁউরুটি ও

কলা-টলাটা এনেছে বেশি। আর অবিনাশ ও সুদীপা এনেছে মিষ্টি। ছানার সন্দেশ শোনপাপড়ি ও কিছু নোনতা খাবার।

উহুঁ, ভোলা সেন বাসন-কোসন কিছুই আনে নি। হুঁশিয়ার লোক। কি জানি যদি কাপটা ডিশটা হারিয়ে যায় বা ভেঙে যায়। সব হোটেলে বাক্সবন্দী করে রেখে এসেছে। তাছাড়া বোঝা বেড়ে যায়। এই নিয়ে তাঁদের কর্তা-গিন্নীর মধ্যে বেশ একচোট কথা কাটাকাটি রাগারাগি হয়ে গেছে এই মাত্র। এখন খাবে কিসে করে শুনি? মৃদুলা বলছিল, জলটা কফিটা না হয় ফ্লাস্কের মুখের ক্যাপে ঢেলে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু খাবার টাবারটা?

ভোলা সেন তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ভাঁজ করা দুসীট খবর কাগজ বের করেছে। এই তো, চমৎকার ডিশ হবে। শুনে লজ্জায় মৃদুলার মুখটা টুকটুকে লাল হয়ে ওঠে। ছি ছি, ভদ্রসমাজে তোমাকে নিয়ে চলা যায় না। অতিরিক্ত হুঁশিয়ার অতিরিক্ত সাবধানী হতে গিয়ে এমন ছোট লোকের মতন এক একটা কাজ কর না তুমি! আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে।

—খুব ভাল করেছেন মিঃ সেন। সুদীপা তৎক্ষণাৎ মুখ খুলেছে। রাস্তাঘাটে কাপ-ডিস বয়ে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের থলে থেকে দু'জোড়া কাগজের ডিশ ও কাপ বের করে সে বালুর ওপর রাখল।

—ওয়াণ্ডারফুল! ভোলা সেনের চোখ দুটো তখন গোল হয়ে ওঠে। কেমন গোছানো গৃহকর্ত্রী আপনি বোঝা যায়।

—গোছানো কি আর সাধে হয়েছি! আড়চোখে অবিনাশকে এক পলক দেখে নিয়ে সুদীপা ভোলা সেনকে এক ঝলক হাসি উপহার দিয়েছে। আমার অনেক কাপ ডিশ ভেঙেছে হারিয়েছে। যে জন্য, কেবল রাস্তায় না, ঘরেও আমি এখন এসব ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। কাচের জিনিস সব তুলে রেখেছি।

যা স্বাভাবিক, অবিনাশের মুখটা ঈষৎ কালো হয়ে উঠছিল। কিন্তু কাউকে বুঝতে দিল না। ওপর ওপর একটা হাসি ঝুলিয়ে মুখের কালোটা ঢেকে রাখল।

—এখন তা হলে দক্ষিণ হাতের কাজটা সারা যাক। পেট চোঁ-চোঁ করছে। মোটা গলায় অবিনাশ বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না মিসেস সেন। ক্ষুধার মুখে কাগজের ডিস যা রূপোর থালাও তাই।

—না, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না মিঃ গাঙ্গুলী। থমথমে গলার স্বর ভোলা সেনের গিন্নীর। অবিনাশের মুখের দিকে টগরফুলের মতন অপরূপ চোখ দুটো মেলে ধরে বলল, সংসারের প্রয়োজনটাই সব সময় বড় করে

দেখতে আমি রাজী নই। রুচি ও শোভনতার একটা প্রশ্ন আছে। সেটা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।

—কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ভোলা সেন স্ত্রীর দিকে তাকায় না, ঝাউগাছের মাথার দিকে চোখ রেখে বলল, কারো কারো কাছে প্রয়োজনকে ছাপিয়ে রূপ রুচি শোভা সৌন্দর্যটাই বড় হয়ে ওঠে। এটা ঠিক নয়।

—হ্যাঁ, ঠিক, আমার কাছে ঠিক। এবার আর অবিনাশের দিকে না, সরাসরি ভোলা সেনের কপালটার দিকে দু'চোখ ধরে রেখে মৃদুলা বলল, মোটা চট পরে শরীরটা ঢাকা যায়। তার মানে কাপড় পরার প্রয়োজন সেখানেও মেটে, তাই বলে সিল্ক সিফন বেনারসী ছেড়ে সর্বদা চট পরে থাকতে হবে এই যুক্তি পাগল ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না।

—কিন্তু যেখানে সিল্ক সিফন নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, আগুন লেগে পুড়ে যেতে পারে, চুরি হতে পারে—খসখসে গলায় ভোলা সেন হাসল—সেখানে চট বা গাছের বাকলই বা খারাপ কি। আমি তো তাই পরি—সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কি বলেন মিসেস গাঙ্গুলী ?

—বুদ্ধি করে বাঁচব, আর লোকে আমায় দেখে হাসুক, এমন বাঁচায় আমার দরকার নেই। মৃদুলা নাক সিঁটকোল। চুরি হবে ভয়ে গায়ের গয়না ব্যাঙ্কের লকারে তুলে রাখব, ছিঁড়বে নষ্ট হবে ভয়ে জামাকাপড় কোনদিন বাক্স থেকে খুলব না, ভাবতে আমার কেমন ঘেন্না করে, এভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। ঐ যে বলে, চোরের ভয়ে বাসন কেনে না, মাটিতে রেখে ভাত খায়, এমন কিছু কিছু কিপটে কঞ্জুষ এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে বৈকি।

—থাক আর ঝগড়া করতে হবে না ভাই। সুদীপা হেসে মৃদুলাকে বোঝাল, তোমাকে মাটিতেও খেতে দেওয়া হচ্ছে না, আমার রূপোর ডিশে খাবারটা সাজিয়ে দেব সেই ব্যবস্থাও যখন এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন মাঝামাঝি অবস্থাটাই মেনে নিতে হবে। নাও, আজকাল এসব বাসনের খুব চল হয়েছে।

অবিনাশ লক্ষ্য করল সুদীপার কথায় মিসেস সেন খুব একটা যেন খুশি না। তা হলেও রুটি ডিম সন্দেশ শোনপাপড়ি দেখে আর যেন লোভ সংবরণ করতে পারছে না। কাগজের ডিশটা সুদীপার হাত থেকে তুলে নিয়ে টপাটপ এটা ওটা মুখে পুরতে লাগল।

মিসেস সেন একটা বড় রকমের ঝড় ঠেকাতে পেরেছেন, যেন এই জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—এমন একটা চেহারা করে, অবিনাশ লক্ষ্য করল,

ভোলা সেনের চকচকে খুশির চোখ বার বার সুদীপাকে দেখছে, আর কলার সঙ্গে সন্দেশ শোনপাঁপড়ি ভেঙে এতটা করে ভদ্রলোক গালে পুরছে।

—আহা, সব আমাদের দিয়ে দিচ্ছেন, আপনি কিন্তু কিছুই খাচ্ছেন না মিসেস গাঙ্গুলী। আপনার নিজের জন্য কিছুই রইল না। আর এক দলা খাবার মুখে ঠেলে ভোলা সেন কথা বলে। ফলে চপ চপ শব্দের সঙ্গে কথাগুলি বিশ্রী জড়িয়ে যায়। কিছুই প্রায় বোঝা যায় না, শোনা যায় না। কেবল ফোলা ফোলা গাল দুটো উঠছে নামছে আর দু'চোখের দৃষ্টি যেন আরও মারাত্মক প্রখর হয়ে উঠছে। সে জন্য মন খারাপ করে অবিনাশ অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। মানুষটার ওপর তার রাগও কম হয় না।

—আপনি কিন্তু তেমন কিছু খাচ্ছেন না মিঃ গাঙ্গুলী। মৃদুলা বলল। অবিনাশ শুনল। এবার তার মনটা মোটামুটি ভাল হয়। দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাসের মতন মোলায়েম ঠাণ্ডা মহিলার গলার স্বর।

—খুব খাচ্ছি, দারুণ খাচ্ছি, কে বলে খাচ্ছি না। যেন ভোলা সেনের ওপর টেক্কা দেবার জন্য চোখ দুটোকে শান দেওয়া রেজারের মতন ঝকঝকে করে তুলে অবিনাশ মিসেস সেনের সুন্দর মুখখানা দু'বারের জায়গায় চারবার করে দেখে আর খাবার তুলে মুখে ঠাসে।

অর্থাৎ পুরো আধঘণ্টা ধরে সমুদ্রের খুব কাছাকাছি বালির ঢিবি দিয়ে ঘেরা একটা চমৎকার নির্জন ঝাউবনের ভিতর ভাল ভাল খাবার মুখে নিয়ে পরস্পরের রূপসী স্ত্রীর দিকে আসক্তির দৃষ্টি নিয়ে তাকাবার ও মিষ্টি কথা বলার রীতিমত একটা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল কলকাতার দুই ভদ্রলোকের মধ্যে।

স্ত্রীরা এটা বুঝলেন। বুঝে প্রচুর রোমাঞ্চিত শিহরিত হলেন।

এর নাম চেঞ্জে আসা। রোজকার গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ক'টা দিনের জন্য হাওয়া বদলানো, রুচি পালটানো। এই নিয়ে কারো কিছু বলার থাকে না।

॥ ৫ ॥

চারজনের দলটা এক সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এখন রোদের কটমটে চেহারা অনেক নরম। এই মাত্র ক'টা পাখির কিচিরমিচির শোনা গেছে ঝাউয়ের মাথায়। কিন্তু আর ঝাউবন নয়।

বিকেলের বাতাস গায়ে লাগছে।

এখন সমুদ্র হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে লবণগন্ধী হাওয়া নাকে লাগছে।

—চলুন, এবার নিচের দিকে যাওয়া যাক।

—হুঁ, তাই চলুন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমরা যাব না মিঃ সেন। অবিনাশ আঙুল দিয়ে উত্তর দিক দেখাল। ওদিকে এগনো যাক, ওদিকটা ফাঁকা।

—কিন্তু আপনি যে মশাই রুমাল ফেলে যাচ্ছেন। এটা কি ঝাউগাছটাকে উপহার দিয়ে যাবেন?

অবিনাশ লজ্জা পেল। তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছতলা থেকে রুমালটা তুলে পকেটে পুরল।

ভোলা সেনের চোখ। কেউ কিছু পিছনে ফেলে যাবে রেখে যাবে তার উপায় আছে?

ওদের সকলের মতন অবিনাশও বালুর ওপর রুমাল বিছিয়ে খেতে বসেছিল। ওঠার সময় যে যার রুমাল তুলে নিয়েছে। একমাত্র ভুল হল তার। বালুটা ঝেড়ে নিয়ে চট করে রুমালটা পকেটে ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপার চোখ দুটো দেখতে সে ঘাড় ফেরায়।

উঁহু, গিন্নী এদিকে তাকাচ্ছে না, ইচ্ছে করে তাকাচ্ছে না। মুখ ঘুরিয়ে মিসেস সেনের সঙ্গে কত যেন কথা। অনর্গল হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে।

অবিনাশ বুঝল এই মাত্র আবার একটা ভুল করতে যাচ্ছিল সে, এমন চমৎকার সুতোর কাজ করা ক্যালিকোর রুমালটা হারাতে যাচ্ছিল। এই জন্য সে যত না লজ্জা পেল, তার চেয়ে তার গিন্নী লজ্জা পেয়েছে ঢের বেশি। এবং তার ওপর রেগেও গেছে যথেষ্ট। এসব ক্ষেত্রে সুদীপা যা করে সব ক'টা লক্ষণ অবিনাশের মুখস্থ। রেগে গিয়ে তার গিন্নী ঠিক এভাবে হাঁটে, এভাবে জেদ করে ঘাড়টা ঘুরিয়ে রাখে। এবং কেউ তখন কাছে থাকলে তার সঙ্গে তড়বড় করে কথাও বলে এভাবে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোলা সেনের সঙ্গে পা ফেলে অবিনাশ হাঁটে।

—বুঝেছেন, আমার মহিষীকে যদি একথা বলতাম, রুমালটা ফেলে যাচ্ছ তুলে নাও—ভয়ানক অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে তুলতেন তিনি।

—বুঝেছি বুঝেছি। খামকা মন খারাপ করে এখন লাভ নেই চিন্তা করে। অগত্যা ভোলা সেনের সঙ্গে একটু হেসে টেসে কথা বলতে অবিনাশ তৈরি হল। বলল, আমার মত আপনার মিসেসও এটা-ওটা হারাবার অভ্যেস বুঝি?

—আহা, আপনি তো মশাই কিছু একটা হারিয়ে দুঃখ পান, এই জন্য অনুতাপ

হয় আপনার, তার ওপর আপনার মিসেসের ভয়। হারানো টারানো তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না বলছিলেন তখন। আমার গিন্নীর যুক্তি অন্যরকম।

—আনন্দ পান। একটা কিছু হারিয়ে তিনি খুশি, তাই না?

—খুব। ভোলা সেন লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করল।

—মানে পুরোনটা, যেটা ব্যবহার করা হচ্ছিল সেটা হারিয়েছে ভালই হয়েছে, এই বেলা নতুন একটা রুমাল বাক্স থেকে খোলা যাবে—ব্যবহার করা যাবে, আপনার গিন্নীর যুক্তিটা এই রকম, তাই না? অবিনাশ নাকে হাসল।

—ঠিক ধরেছেন। আপনি কত সহজে, কত অল্প সময়ের মধ্যে আমার ঘরের মানুষটার ধাত ধরতে পেরেছেন। হুঁ, আমার ওপর তিনি বেজায় খাপ্পা। বলেছি আপনাকে। যদি সব কিছু সারাক্ষণ কেবল ধরে রাখি, যত্ন করে তুলে রাখি, এক সময়ও মুঠো আলগা হতে দিয়ে কি ভুলে থেকে এটা-ওটা হারাতে না দিলাম তো নতুন আর একটা ব্যবহার করার সুযোগ পাব কখন—এই আমার মহিষীর যুক্তি।

—ওয়াণ্ডারফুল! তার মানে শুধু নতুনের মোহ আপনার স্ত্রীর? অবিনাশ আর হাসল না যদিও। কেন না মুখটাকে বেজায় থমথমে করে ফেলেছে তার পাশের পুরুষটি। তা বলে ভোলা সেন কিন্তু চুপ করে থাকল না।

—দিন আপনার লাইটারটা। অবিনাশের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ভোলা সেন সিগারেট ধরাল। অবিনাশকেও একখানা উপহার দিল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের দিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে বলল, মিসেসের মুখে এতক্ষণ সব শুনলেন, নতুনের মোহ, অভিনবত্বের চমক, রুচি শোভনতা—এসবের জন্য আমার গিন্নী অতি মূল্যবান পুরনো জিনিসটিও হাত-ছাড়া করতে হারিয়ে যেতে দিতে রাজী।

এবার ভোলা সেনের গলার স্বরে কেমন যেন একটা হাহাকার ফুটল। অবিনাশ চমকে উঠল। আড়চোখে ভদ্রলোকের মুখটা দেখল। চোখে জল-টল এসে গেল কিনা কে জানে।

অথচ দু'দিন ধরে, অবিনাশ চিন্তা করল, নানারকম রসের গল্প করে ভদ্রলোক তাদের এই ছোটখাটো দলটাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছেন। একটু আগে পুরুষের রান্না রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেমন চমৎকার চমৎকার কথা না শোনালেন। কিন্তু হঠাৎ 'অতি মূল্যবান' জিনিস বলতে সেন মশাই এখন কী বোঝাতে চাইছেন?

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরতে গিয়েও হেসে ফেলল অবিনাশ। অর্থাৎ

চেহারাটা গম্ভীর করল না, বরং ভদ্রলোকের এই কথার ওপর তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না, এমন একটা ভাব দেখাল সে। পাছে মানুষটা মন খারাপ করে।

হেসে সিগারেটে টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া আকাশের দিকে ছেড়ে দিয়ে অবিনাশ বলল, ঘরের কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিন্নীরা, সব দেশে সব সমাজেই এটা দেখা যায়, দারুণ ভালবাসেন। কাজেই আপনি আমি চটতে পারি এমন সব কথা তাঁদের মুখ থেকে বেরোবেই। এগুলো যে সব সময় গিন্নীদের মনের কথা, তাঁদের অন্তরের ভাষা, আমার কিন্তু মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি না।

—মানে আপনার ওপর চটে গিয়ে আপনার ওয়াইফ যখন কড়া ভাষায় এটা ওটা আপনাকে শোনান, আপনি সে-সবের ওপর তেমন গুরুত্ব দেন না, সবটাই হাল্কা করে দেখেন। এই তো?

—হুঁ।

—কি রকম কড়া কথা বলেন তিনি আপনাকে শুনি? একটা দৃষ্টান্ত বলুন। কৌতূহলী চোখ নিয়ে ভোলা সেন হাঁটা বন্ধ করে আবার অবিনাশের দিকে তাকায়।

অবিনাশ দেখল মিসেস সেন ও সুদীপা তাদের দু'জনকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিক। চিন্তা করল সে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে পুরুষ দুটির মধ্যে, বিশেষ করে নিজেদের গিন্নীদের নিয়ে, এই অবস্থায় তাদের দু'জনের হাঁটার গতি খানিকটা মন্থর হবে জানা কথা। তার ওপর ভোলা সেন কিনা এখন একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—বলুন। কতটা কড়া কথা শোনান আপনার মিসেস? ভোলা সেনের চোখের পলক পড়ছিল না।

—বলেন উঠতে বসতে এত ভুল করি আমি, কোথায় কোন্ জিনিসটা কখন ফেলে আসি হারিয়ে আসি বলতে পারি না, এই করে করে একদিন নাকি আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলব, আমাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—ভারি চমৎকার কথা বলেন আপনার গিন্নী! ভোলা সেন হাঁ করে আরও কিছুক্ষণ অবিনাশের মুখটা দেখল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে সুদীপাকে দেখল। মিসেস সেনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। ফুলের ডাঁটির মতন লম্বা শরীরটা দুলছে। আরও খানিকটা রাস্তা দু'জনে এগিয়ে গেছে।—বোঝা গেল আপনার স্ত্রী বেশ রসিকা, বুদ্ধিমতী। ওদিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে ভোলা সেন এদিকে তাকাল। অবিনাশের চোখে চোখ রেখে বলল, জিনিসপত্র ক্রমাগত হারান বলে

আপনাকে দারুণ খোঁচা দেন উনি, তবে খোঁচাটার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, উইট আছে, স্বীকার করতেই হবে।

—হুঁ, তা আছে। অবিনাশ অল্প হাসল। তেমনি আমিও চুপ থাকি না। বলি যে, এটা ওটা আমি হারাই বটে, কিন্তু তোমাকে কোনদিন হারাব না। হারাতে দেব না। আর তা দেব না বলেই আমিও হারাব না। তোমার দিকে সর্বদা চোখ রেখে চলব, চলি। তুমি যেন আমার অনন্তকালের একটা ঠিকানা। যার ঠিকানা চিরকাল ঠিক থাকে সেই মানুষ, ছাতা হারাক, কলম হারাক, রুমাল হারাক, ঘড়ি বা জুতো, নিজেকে কখনো হারায় না। কেমন উত্তরটা হয় মিঃ সেন?

—মন্দ না। ভোলা সেন গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। একটু ভাবল। তারপর আবার অবিনাশের দিকে চোখ তুলল।—কিন্তু ওকথা যখন বলেন, তোমাকে হারাব না, তোমার দিকে সারাক্ষণ চোখ রেখে চলি, চলব—আপনাকে তিনি তখন 'স্ত্রৈন' 'বৌ-নেওটা' ইত্যাদি বলেন না?

—হয়তো মনে মনে বলেন, মুখে বলেন না। তবে হাবভাবে বুঝি কথাটা শুনে খুশি হন। ঝগড়া-টগড়াটা তখনকার মতন বন্ধ হয়।

ভোলা সেন ঘাড় নাড়ল।—ঐ, আমি যেমন মাংস রেঁধে খাইয়ে ঝগড়া থামাই। গিন্নীকে খুশি রাখি। একদলা থুতু ফেলে ভোলা সেন হাঁটতে আরম্ভ করল। অবিনাশও হাঁটে।

—হুঁ, একটা অস্ত্র রাখতে হয়, তা না হলে গিন্নীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা মুশকিল। আমার মুখ হল অস্ত্র। মুখের বুলি। আপনার হল হাত। হাতের রান্না। অবিনাশ বলল। ভোলা সেন কিছু বলল না।

॥ ৬ ॥

—জলের ধারে চলে গেছে দুটিতে।

—নারী। জলের মতন চঞ্চল, তাই জল ভালবাসে। ভোলা সেন বালুর ওপর বসে পড়ল। মোটা শরীর। অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত। অবিনাশও বসল।

—এদিকটায় আর আমরা আসিনি। দারুণ নির্জন।

—সমুদ্রকে ভাল করে দেখতে হলে বুঝতে হলে নির্জনতা চাই। দিন আপনার লাইটারটা।

—আপনি পারবেন না ধরাতে। অবিনাশ পকেট থেকে লাইটার বার করল। হাওয়ার জোর বেশি। আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

ভোলা সেন ঠোঁটে সিগারেট গুঁজল। এক হাতে লাইটার জেলে আর এক হাতের তেলো বাটির মতন গোল করে ভোলা সেনের মুখের সামনে ধরে অবিনাশ সিগারেট ধরিয়ে দিল।

—আপনি ধরাবেন না? নিন একটা।

—এত হাওয়ার মধ্যে আমি স্মোক করে সুখ পাই না। অবিনাশ বলল।

—কেন বলুন তো? ভোলা সেন অবাক। হাওয়ার সঙ্গে সিগারেট খাওয়ার সম্পর্ক কি?

—আছে। অবিনাশ অল্প হাসল। ধোঁয়াটা মুখ থেকে বের করতে না করতে হাওয়ার ঝাপটায় কোথায় যে উড়ে যায় নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না।

—মানে সিগারেটে টান দেওয়ার পর গল গল করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে চোখে সেটা দেখা চাই, না হলে ধূমপানের সুখ নেই—এই আপনার বক্তব্য?

—নিশ্চয়। রেজাল্টেন্ট এফেক্ট বলে একটা কথা আছে যে। অবিনাশ বলল, কাজ করে যদি তার ফলটা দেখতে না পেলাম তো সেই কাজে আনন্দ কোথায়?

এবার ভোলা সেন হাসল। থমথমে গম্ভীর চেহারা আবার রসাল হয়ে উঠল।

—যা বলেছেন। গীতার ঐ নিষ্কাম কর্মে আমারও আস্থা কম। কাজ করে ফলটা হাতে-নাতে পাওয়া চাই, চোখে দেখা চাই। চুমু খাবার সঙ্গে সঙ্গে গিন্নী যদি মুখটা ঘুরিয়ে নেন, তাঁর ঠোঁট গাল দৃশ্যের আড়ালে চলে যায় তো সেই চুম্বনে তৃপ্তি আহ্লাদ শিহরণ কোথায়। ঠিক বলেছেন।

—চমৎকার! উত্তেজিত উৎফুল্ল গলায় অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল। এমন উপমা কালিদাসের মাথায়ও আসত না।

কথা শেষ করে ভোলা সেন টেনে টেনে হাসে। যা হোক এতক্ষণ পর মানুষটার যে মেজাজে এসেছে দেখে অবিনাশের ভাল লাগল।

—ওদিকে গিন্নীরা কি করছে দেখুন। অবিনাশ আঙুল তুলে দেখাল।

দেখবার মতন ছবিই বটে। যেন দুটো রঙিন ফুল। বালুর ওপর কিছুটা বা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটোছুটি করছে। দু'জনের শাড়ির রং আজ লাল। দূর থেকে ফুলের মতন ছোট্ট দেখাচ্ছে মূর্তি দুটো। বড় বড় ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে

কূলে। সাদা ফেনার এক একটা বিশাল ফুল তৈরী হচ্ছে। চোখের পলকে আবার সেই দুধ রঙের ফুল সরে গিয়ে চিকচিকে বালু জেগে উঠছে। তার ওপর দুই গিন্নী যেন দুটি ছোট্ট শিশু। খিল খিল করে হাসছে, ছুটছে, আছাড় খাচ্ছে। আবার ছুটছে। ভয়-ডর নেই! দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই।

—কেমন পবিত্র দৃশ্য। ভোলা সেন বিড় বিড় করে উঠল।

—প্রকৃতির কাছে এলে আমরা সবাই এমন হই, পবিত্র হই। অবিনাশ বলল।

—এখন আর ভাবাই যায় না, ঐ গিন্নীরা কলকাতায় ফিরে যাবেন, ফিরে গিয়ে আবার ঘরকন্নায় লাগবেন।

উঁহু, ভাবা যায় না, ফিরে গিয়ে ইনারা আবার ঘর-দোর গুছোবেন, রান্নার তদারক করবেন, মার্কেটিংয়ে বেরোবেন, আর এটা ওটা নিয়ে ঘরের কর্তাদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি বাধাবেন। ঠিক বলেছেন। অবিনাশ মাথা ঝাঁকাল।

—আহা, যদি এখানে এমন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত! ভোলা সেন আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলল।

—প্রস্তাব দিলে হয়। অবিনাশ বলল।

—কি?

—যে আমরা দু'জন রোজ বিকেল পড়তে বালুর ওপর এসে বসে থাকব, আর তোমরা দুটিতে জলের কাছে গিয়ে দুধের মতন ফেনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে টুকটুকে দুটি রঙীন ফুল হয়ে ছুটোছুটি করবে, নাচানাচি করবে, আর খিল খিল হাসবে।

—আপত্তি করবে না। বলবে, যদি কলকাতার অফিস-কাছারি ছেড়ে এসে এখানে বসে তোমরা রেস্তর যোগাড় করতে পার, হোটেল-ভাড়া চালাতে পার, আমাদের কি—আমরা তো চাইছিই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কেবল ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা, আর তৈরী খাবার খেয়ে তৈরী বিছানায় শুয়ে পড়া। খিটিমিটি করে সংসার চালানো কি আমাদেরই পছন্দ?

—দেখুন। ঘাড় উঁচু করে বলল অবিনাশ। আঙুল তুলে দেখাল। মনের আনন্দে দুটিতে কেমন ঝিনুক কুড়োচ্ছে।

—হু, তাই তো দেখছি। ভোলা সেন ঘাড় উঁচু করে ধরল।—ইস, শাড়ি সায়া ভিজিয়ে একাকার।

—রীতিমত আড়াআড়ি লেগে গেছে, কে কত বেশি ঝিনুক কুড়োবে।

—হু, ভোলা সেন মাথা ঝাঁকাল। অথচ আমার উনি কিন্তু কুঁড়ের বাদশা। বললাম, রাণী। আলস্যেমীতে জুড়ি নেই। আপনার ওয়াইফের পাল্লায় পড়ে

দারুণ স্মার্ট ছটফটে হয়ে গেছে। ঢিলেঢালা শরীর নিয়ে এতটা ছুটোছুটি করবেন গিন্নী ভাবতে অবাক লাগে।

—দেখে ভাল লাগছে? অবিনাশ কেমন যেন চোখ টেপার মতন করে প্রশ্ন করে।

—ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা নয়, তবে অন্য রকম লাগছে। ভোলা সেন মোটা গলায় বলল, এত বদলে গেছে মৃদুলা, চেনাই যাচ্ছে না।

—চেঞ্জে এসে এটা হয়েছে। যেন ভাল মন্দ লাগার প্রশ্নটা সেনের মনঃপুত হয়নি, একটু রুষ্ট হয়েছে হয়তো, চিন্তা করে অবিনাশ সঙ্গীকে খুশি করতে একগাল হাসল। যা বলেছেন, চেঞ্জে এলে আমরা সবাই কম বেশি বদলে যাই, অন্যরকম হয়ে যাই।

—আমি হই না। আমি একরকম থাকি। ভোলা সেন মাথা ঝাঁকাল!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ও বটে। পুরুষ খুব বেশি বদলায় না। আমি আমার নিজেকে দিয়ে বুঝছি। মেয়েরা। গিন্নীরা বদলান। তাঁদের পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। অবিনাশ না বলে পারল না।

—তা যতই বদলাক, কলকাতার ট্রেনে চাপবে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বমূর্তি ধরবে। ভোলা সেন বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল। সেই ঝগড়াঝাঁটি। অঙ্গার শত ধুলেও কালো রং থেকে যায়।

—আপনি অতিরিক্ত হুঁশিয়ার, হিসেবী, কিছুই হারান না, এই নিয়ে মিসেসের মেজাজ খারাপ, রাগারাগি?

—হুঁ।

—আমার উনিও তাই। অবিনাশ বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল। সমুদ্রের জলে চুবিয়ে তুললেও কলকাতার ট্রেনে চাপবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার পেছনে লাগবেন। এটা হারাই ওটা হারাই, ভুলে গিয়ে কোথায় কোন্‌টা ফেলছি, রাখছি—

—দেখুন দেখুন! অবিনাশের কাঁধ ধরে সাংঘাতিক একটা ঝাঁকানি দিল ভোলা সেন। আঙুল তুলে দেখাল। ভোলা সেন শ্বাস ফেলতে পারছে না।

—হি-হি! অবিনাশ হাসল। সমুদ্রে সাঁতার কাটবেন গিন্নীরা। পোশাক বদলাচ্ছেন।

—রীতিমত সুইমিং কস্টিউম। কোথায় পেল মৃদুলা এই জিনিস! চক্ষু ছানাবড়া করে ভোলা সেন দূরে বালুর দিকে চেয়ে থাকে। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গ জানতাম না।

—মশাই আমিও তাই। অবিনাশ যদিও খুব একটা অবাক হয় না। গুজ-গুজ

করে হাসে। আমিও টের পাই নি আমার গিন্নী কলকাতা থেকে আসার সময় এই জিনিস সঙ্গে করে এনেছিল। এখানে আসার আগে কোন্ ফাঁকে ওটা কিনেছিলেন কে জানে! একেবারে ব্র্যাণ্ড-নিউ।

—অ্যাঁ! ভোলা সেন বিড় বিড় করতে থাকে। মৃদুলা লুকিয়ে লুকিয়ে বট্‌ল-গ্রীন কলারের কস্টিউম কিনে এনেছে! আমার স্বপ্নের বাইরে।

—গিন্নীদের দস্তুর এটা। অবিনাশের হাসি থামছিল না। আমাদের স্বপ্নের বাইরে লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁরা অনেক কিছু করেন।

—ইস্, গোলগাল নরম শরীর, আকাশের মতন রং। তার ওপর ওই পোশাক। আমি আর তাকাতে পাচ্ছি না। যেন দু'চোখ বুজে ভোলা সেন মাথা ঝাঁকাল।

—জায়গাটা ফাঁকা। একদিক থেকে আমরা নিশ্চিন্ত। আর না হেসে অবিনাশ আস্তে বলল।

—এদিকে সমুদ্র, ওদিকে ধু ধু বালু, মাথার ওপর নীল আকাশ। যেন কবিতা আওড়াচ্ছিল ভোলা সেন। বট্‌ল-গ্রীন আঁটো পোশাকে কী মূর্তি ধরেছে না আমার অর্ধাঙ্গিনী।

আমার উনিও কম কি! অবিনাশ নাকে হাসল। ডীপ অরেঞ্জ কালারের কস্টিউম। এদিকে গায়ের রংটা তো পাকা মর্তমান কলার। তার ওপর টনকো মাজা-ঘষা স্ট্রেট ফীগার, পাথর-কোঁদা উরু—পেছনে সমুদ্র মাথার ওপর আকাশ—দেখে এখন মনেই হয় না, কোনদিন আর উনি ঘরে ফিরবেন।

—ফিরতে হবেই। ভোলা সেন দাঁতে দাঁত ঘষল। আপনার গিন্নীর কথা বলতে পারব না মশাই। কিন্তু আমার উনিকে ফিরতেই হবে। রেস্ত আমার হাতে। ফিরে না গেলে এখানে পড়ে থেকে নোনা জল আর বালু খেয়ে পেট ভরবে না ভাল করে জানেন। কাজেই—

—হুঁ, তা-ও বটে। অবিনাশ ঘাড় নাড়ল। সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমার গিন্নীও গাদাবোট। নিজের চলবার ক্ষমতা কোথায়! জাহাজ যেদিকে টানবে সেদিকে যাবে।

—অ্যাঁ, সত্যি দেখছি ও জলে নামছে! ভোলা সেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। উঠে দাঁড়াল। এই মৃদুলা!

—কেন, উনি কি সাঁতার জানেন না? ব্যস্ত হয়ে অবিনাশও উঠে দাঁড়ায়।

—একফোঁটা শেখেনি সাঁতার।

—অ্যাঁ, কী সাংঘাতিক! তবে আর কোন্ সাহসে উনি ঐ পোশাক পরেছেন, কোন্ সাহসে জলের দিকে এগোচ্ছেন—

আপনার মিসেসের পাল্লায় পড়ে। আপনার স্ত্রীর ফুসলানিতে পড়ে। ভোলা সেন রেগে গিয়ে গজ গজ করছিল।

—সুদীপা অবশ্য দারুণ সাঁতারু মেয়ে। আহিরিটোলা সুইমিং ক্লাবের হয়ে দু'বার চ্যাম্পিয়নশীপ জিতেছে। ফ্রী-স্টাইল সাঁতারে ওর জুড়ি ছিল না। হুঁ, বিয়ের আগে। চৌদ্দবার গঙ্গা এপার-ওপার হয়েছে।

—হোক চৌদ্দবার এপার-ওপার। আমি আমার ওয়াইফের কথা ভাবছি। ওর জন্য ভয়ে মরছি। আমার কোন্নগরের বাড়ির পুকুরে হাজার দিন জলে নামিয়েও যাকে সাঁতার শেখাতে পারিনি, জলে নামলে কাঠ হয়ে গেছে, কাঁকড়ার মতন আমার কোমর আঁকড়ে ধরে রয়েছে, কোমর ছাড়াতে পারিনি—আর সেই মেয়ে কিনা এখন উত্তাল বে-অব-বেঙ্গলে নেমে যাচ্ছে!

—উহুঁ, অত বোকা নয় আপনার গিন্নী। অবিনাশ আবার শূন্যে আঙুল তুলল। ঐ দেখুন, একটা নুলিয়া ধরেছেন তিনি।

ভোলা সেন আর কথা বলতে পারল না। জলের দিকে তাকিয়ে থেকে পর পর তিনটে ঢোক গিলল। যেন এবার আরও বেশি বোকা বনে গেল মানুষটা। ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখে কেমন মায়া হল অবিনাশের।

সান্ত্বনা দেবার মতন করে সে বলল, ভালই হয়েছে, আর ডুবে যাবার ভয় নেই আপনার গিন্নীর, অন্তত এটুকু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—চুপ করুন আপনি। জোরে ধমক লাগাল ভোলা সেন।—ডুবে যাবার ভয়ই কেবল ভয়, হারিয়ে যাবার ভাবনাই কেবল ভাবনা আপনার চোখে। আর কিছু দেখছেন না?

অবিনাশ যেন অন্ধ হয়ে গেল। ভেবেই পেল না সে আর কি দেখার আছে এখানে।

দূর থেকে সে দেখছিল তার গিন্নীও জোয়ান একটা নুলিয়াকে ধরেছে। স্বাভাবিক। চিন্তা করল সে। কাশী মিত্তির ঘাটের ঠাণ্ডা গঙ্গা আর পুরীর খেপা সমুদ্র এক কথা নয়। নুলিয়া সঙ্গে নিয়ে তুমি ভালই করেছ সুদীপা। চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছিল তার।

হঠাৎ সে দেখল ভোলা সেন ছুটছে। তাকে পিছনে ফেলে রেখে পাগলের মতন ছুটছে, আর একটা হাত শূন্যে তুলে, যেন পাকা ধানক্ষেতে শূয়ার ঢুকেছে, দূর থেকেই ওটাকে তাড়াবার জন্যে হেই—হেই হিস্—হিস্ করছে।

কি ব্যাপার! অবিনাশ এগোতে লাগল।

॥ ৭ ॥

জলের কাছে গিয়ে জিনিসটা আর তেমন অস্পষ্ট থাকল না। অবিনাশ অন্তত কিছুটা আন্দাজ করতে পারল।

জুতো নিয়ে ভোলা সেন হাঁটু-জলে নেমে পড়েছে, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে অস্থির হয়ে মিসেস সেনকে ডাকছে—চলে এস, উঠে এস।

মিসেস সেন যেন একগুঁয়ে অবাধ্য মেয়ে। মাথা নাড়ছে। অর্থাৎ আসবে না। মিসেস সেনের বুকের কাছে জল। বুকের কাছে জল, কিন্তু বুকে এক কণা জল লাগছে না। বুকে জল লাগছে না, কোমরে লাগছে না, উরুতে লাগছে না—এমন কি পায়ের গোড়ালীতেও না। সবটা শরীর খৈয়ের মোয়ার মতন শুকনো মচমচে।

কেমন করে সম্ভব?

চোখে না দেখলে অবিনাশও বিশ্বাস করতে পারত না।

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ ঢেউ ফণা তুলে নাচছে, ফোঁস ফোঁস করছে, ছোবল মারতে চাইছে, সুইমিং কস্টিউম আর কতটা ঢেকেছে শরীরের! পাকা তেলাকুচার মতন লাল টুকটুকে মোলায়েম চামড়ার ওপর কাক-শালিকেরও লোভ।

কিন্তু ভোলা সেনের গিন্নীর কড়ে আঙুলটাও জলে ভিজছে না। খিল খিল হাসছে। ভোলা সেন ততক্ষণে প্রায় কোমর-জলে। হাঁস ফাঁস করছে। যেন কাঁদতে চাইছে। আবার একসময় দাঁতে দাঁত ঘষছে। চিৎকার করছে। অভিশাপ দিচ্ছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে। উঠে এস! আমি তোমাকে সাবধান করছি মৃদুলা! জেদী মেয়ে, ভীষণ দুষ্টু মেয়ে। মিসেস সেন তখন অনবরত মাথা নাড়ছে। আর আগের চেয়েও যেন বেশি শক্ত করে আবলুসের মতন কালো বিরাট-দেহ দৈত্যের চেহারার নুলিয়াটার কাঁধ আঁকড়ে ধরে তার পাটার মতন প্রশস্ত পেষল বুকের সঙ্গে লেপটে গিয়ে খিল খিল হাসছে।

দৃশ্যটা অত্যন্ত বিসদৃশ। তৃতীয় পুরুষ অবিনাশের চোখেই কেমন যেন লাগছিল, গা কাঁটা দিচ্ছিল তার। আর ভোলা সেন তো স্বামী।

অথচ অবিনাশ দেখছিল, সঙ্গে নুলিয়া আছে বটে, কিন্তু ঢেউয়ের বুকে সুদীপা ভাসছে, তার সুন্দর দীর্ঘ শরীরটা একবার ডুবছে, আবার জেগে উঠছে।

নোনা জল লেগে চিক চিক করছে মাথা মুখ ভুরু কাঁধ। সমুদ্র অবগাহনে মানুষ যে কত পবিত্র সুন্দর হয় অবিনাশের স্ত্রী সুদীপা তার একটি প্রখর দৃষ্টান্ত।

অবিনাশের চোখে পলক পড়ছিল না। মাঝে মাঝে, ঢেউয়ের লাফালাফি

উদ্দামতা বেড়ে গেলে সুদীপা যাতে একেবারে তলিয়ে না যায় বা আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়, হাত বাড়িয়ে নুলিয়াটা তার হাত ধরছে, কি মাথাটা বা কাঁধটা একটু ছুঁয়ে দিচ্ছে মাত্র। এর অতিরিক্ত কিছু নয়। তাও একবার যদি কালো শরীরের ঐ জোয়ান বিকট-দর্শন পুরুষটা সুদীপাকে স্পর্শ করছে, পরমুহূর্তে দেখা যায়, দুধ-সাদা ফেণা নিয়ে একবারের জায়গায় সাতবার সমুদ্রের ঢেউ সুদীপার দেহের সেই অংশ ধুয়ে দিচ্ছে, মেজে-ঘষে সাফ করে দিচ্ছে। এর চেয়ে তৃপ্তিকর দৃশ্য আর আছে কিছু! কিন্তু আর একজন?

জলে নেমেছে অথচ জলের ছিটেফোঁটাও শরীরের কোথাও স্পর্শ করছে না। ভোলা সেনের বৌয়ের মাখনের দলার মতন সবটা শরীরই পুতুলের মতন গুটিয়ে নিয়ে নুলিয়াটা তার মস্ত বড় বুকের খাঁজের মধ্যে ধরে রেখেছে। যেন ওটাই সমুদ্র, ওখানটাই পবিত্র। তা না হলে স্বামীর বকুনি খেয়েও রক্তমাখা গালটা ঐ কালো কুৎসিত বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে এমন ছলনার হাসি হাসে ভোলা সেনের গিন্নী! যেন শেষটায় ভোলা সেন হাল ছেড়ে দিল। ভেজা জুতো ভেজা ট্রাউজার নিয়ে তীরে উঠে এল।

—সন্ধ্যার ট্রেনে আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকবে। এখানেই রইলে। আমার একডালিয়া রোডের বাড়ির দরজায় কোনদিন যদি তোমাকে দেখি—ওফ্, আমি কী করব, আমি মরে যাব…

বিকট চিৎকার করে সেই নির্জন বালুবেলা এমন কাঁপিয়ে তুলছিল ক্রুদ্ধ স্বামী, সমুদ্রের গর্জনও বুঝি চাপা পড়ে গেল।

দুটো ছোট্ট পাখি এদিকে উড়ে আসছিল। ভোলা সেনের চিৎকার শুনে অঙ্গভঙ্গি দেখে, মুখের বিকৃতি ও ঠোঁটের কোণায় ফেণা লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে পাখি দুটো অন্যদিকে উড়ে গেল।

অবিনাশ রীতিমত ঘামছিল। ভয় পেল সে।

তার মনে হচ্ছিল ভোলা সেন যেমন চেঁচাচ্ছে, যেমন হাত-পা ছুঁড়ছে—শেষটায় না লোকটা পাগল হয়ে যায়।

ওদিকে সুদীপার সাঁতার বন্ধ হয়ে গেল। যেন একটা কিছু ঘটেছে। ভয় পেয়ে সে-ও তাড়াতাড়ি তীরে উঠে এল। নুলিয়াটা উঠে এল। এল না মিসেস সেন, আর মিসেস সেনকে বুকের কাছে যে জাপটে ধরে রেখেছে, জবরদস্ত চেহারার রসিক পুরুষটা। রসিকই বটে।

ভোলা সেনের চেঁচামেচি শুনে এবং ক্রমাগত হাত-পা ছোড়া দেখে তাঁর গিন্নী কল কল করে হাসছে, তাই দেখে লোকটাও হাসছে। যেন ভারি মজা পেয়েছে।

তার মিশমিশে ঠোঁট এক একবার ছড়িয়ে পড়ছে আর ঝিনুকের মতন সাদা দাঁতের সারি ঝলক দিয়ে উঠছে।

মিসেস সেনের হাসির মতন তার হাসির মোটেই শব্দ ছিল না, যে জন্য মনে হচ্ছিল নিঃশব্দ দাঁতালো হাসি হেসে কলকাতার বাবুটিকে সে ঠাট্টা করছে।

দেখে অবিনাশ রীতিমত লজ্জা পাচ্ছিল। তার কান গরম হয়ে গেছে। কিন্তু ভোলা সেনের তো লজ্জা পাওয়ার অবস্থা না। মাথা গরম করে ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে ভদ্রলোক। মুঠো মুঠো বালু তুলে নিয়ে জলের দিকে ছুঁড়ছে। ধারে-কাছে ঢিল ছিল না বলে?

—মিঃ সেন। শুনুন, একটু শান্ত হোন। অবিনাশ আস্তে ডাকল।

—আপনি চুপ করুন। আপনি আপনার গিন্নীকে সামলান।

—আমার গিন্নী জল থেকে উঠে এসেছে। ঐ দেখুন। অবিনাশ বলতে যাচ্ছিল। চুপ করে গেল। কেননা সুদীপা আর সামনে দাঁড়িয়ে নেই। পয়সা দিয়ে নুলিয়াটাকে বিদায় করে পুব-দক্ষিণ কোণের একটা উঁচু বালির টিবির দিকে চলে যাচ্ছে। মাটি থেকে কুড়িয়ে শাড়ি-জামাটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। বোঝা গেল বিদঘুটে সাঁতারের পোশাকটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে ফেলতে একটা আড়ালের জন্য টিবির দিকে ছুটেছে সে। দেখে অবিনাশ নিশ্চিত হল। খুশি হল।

কিন্তু এখানকার নাটক আর শেষ হয় না।

হয়তো ভোলা সেন বাড়াবাড়ি করছে দেখে তাঁর মিসেস চোখের ইশারায় রসিক নুলিয়াটাকে কিছু বলল।

এবার দেখা গেল ধীরে ধীরে নুলিয়াটা তীরের দিকে এগোচ্ছে। মিসেস সেন তখনও মাখনের দলা হয়ে তার লোমশ বুকের কাছে লেপটে। উপায়ই বা কি! জলকে যে ভোলা সেনের গিন্নীর ভীষণ ভয়। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও সেনসাহেব বৌকে সাঁতার শেখাতে পারেনি। জলে নামলে গিন্নী ভয়ে কাঠ হয়ে যেত, কাঁকড়ার মতন স্বামীর কোমর আঁকড়ে ধরত। হুঁ, পুকুরকেই ভয়, অথচ আজ কিনা সমুদ্র দেখে লোভ সামলাতে পারল না।

কিন্তু একফোঁটা জল গায়ে লাগতে পারল কি? কাজেই লোভটা সমুদ্রের, না অন্য কিছুর?

যেমনটি ছিল, শুকনো খৈয়ের মোয়াটির মতন শুকনো শরীরটা নিয়ে নুলিয়ার কোল থেকে বালুর ওপর নেমে মিসেস সেন ঐ পোশাকেই থপ থপ হেঁটে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল। ভোলা সেন সঙ্গে সঙ্গে চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল।—এখান থেকে সরে যাও।

—কি হয়েছে, পাগলামী করছ কেন? মিসেস সেন তখনও মিটিমিটি হাসে।

—সব বন্ধ হয়ে যাবে। ভোলা সেন চোখ ফেরায় না।

—কি বন্ধ হয়ে যাবে? মিসেসের ধারাল গলা।

—আমার প্রিমরোজ কালারের ক্যাডিলাক চড়ে বেড়ানো, আমার পার্স থেকে গোছা গোছা নোট তুলে নিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরনো, এবেলা গোট্, ওবেলা চিকেন, চাকর-চাকরাণী, এয়ার কণ্ডিশন্ড বেড-রুম—

—ইস! আর হাসে না ভোলা সেনের গিন্নী। কী পাগলের মতন বক বক করছ! তোমার হয়েছে কি?

—সব বন্ধ হয়ে যাবে। ভোলা সেন এবার চোখ ফেরাল। এখানে পড়ে থেকে কেবল বালু খেতে হবে আর লোনা জল গিলতে হবে!

—খেতে হয় খাব, এখন তুমি চুপ কর। মিসেস সেন ধমক দিয়ে উঠল। এই তুমি সরে যাও, পরে এসে পয়সা নেবে।

থতমত খেয়ে নুলিয়াটা ঘাড় গুঁজে একদিকে চলে গেল।

—মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি চুপ করে কেন? এদিকে তাকান। এর বিচার করুন।

অবিনাশ চোখ ফেরায় না। ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। —আপনি আগে গায়ের পোশাকটা ছেড়ে নিন। ওদিকে ঢিবির আড়ালে চলে যান। মিসেস গাঙ্গুলী তাই করছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অবিনাশ।

—কিন্তু আমার কস্টিউম তো ভেজেনি, শুকনো খটখটে, গায়ে থাকলে আপত্তি কি? মিসেস সেন ঝিরঝিরে গলায় হাসল।

অবিনাশ অতিরিক্ত গম্ভীর।

—আগে ওটা ছেড়ে আসুন। তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।

—আমি বিচার চাইছি। মিঃ সেনের আমার সঙ্গে এরকম বিচ্ছিরি ব্যবহার করার কী রাইট আছে, আমি জানতে চাইছি। এক মিনিট।

অবিনাশ টের পেল মহিলা ভারি কোমর মোটা উরু নিয়ে থপথপ করে বালুর ঢিবির দিকে দৌড়চ্ছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অবিনাশের ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু নিজেকে সংযত করল।

—এই যে আমি এসে গেছি। মিসেস সেনের গলা। অবিনাশ ঘুরে দাঁড়ায়। মিসেস সেন একা নয়। পাশে সুদীপা। শাড়ি-জামা পরে দুজনেই এখন ভব্য-সভ্য। সুদীপা টিপে টিপে হাসছে।

—হুঁ, বলুন কিসের বিচার চাইছিলেন? মিসেস সেনের চোখে চোখ রেখে অবিনাশ হাসল।

—মিঃ সেনকে জিজ্ঞেস করুন—আমি জলে নামতে এত চেঁচামেচি করছিলেন কেন উনি, গাদা গাদা বালু ছুঁড়ছিলেন !

—আপনি তো জলে নামেননি মিসেস সেন। অবিনাশ বলল, জলে আপনার ভীষণ ভয়। শূন্যে ঝুলছিলেন।

—মোটেই না। মুলিয়ার কাঁধ ধরে ঝুলছিলাম, আর একটু নিয়ে গিয়ে সে আমায় ভাল করে চান করিয়ে দিত। একটা ডীপ ডাইভ দেওয়া যেত।

—ভাল করে চান করিয়ে দিত, ডীপ ডাইভ দেওয়া যেত। ভোলা সেন সাঁ করে চরকির মতন ঘুরে দাঁড়াল। চালাকী হচ্ছে, খুব স্মার্ট হয়ে গেছ চেঞ্জে এসে ?

—চেঞ্জে এলে সবাই স্মার্ট হয়, বদলে যায় ! এর নাম হাওয়া-বদল। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার আমি বোকা হব। আলসেমির তেলে নেবুর আচারটি হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বছরের পর বছর ডুবে থাকব।

—নো, নেভার। কোন দিনই আর বাড়ি ফেরা হবে না। ভোলা সেন গর্জে উঠল।

—অপরাধ ? মিসেস সেন ভুরু কুঁচকোলেন।

—নতুনের মোহ, অভিনবত্বের চমক, এর জন্য অতি মূল্যবান পুরনো জিনিসটিও হারিয়ে যেতে দিতে আমার আপত্তি নেই। ভোলা সেনের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে গলার স্বর।—তারই রিহার্সাল চলছিল একটু আগে, কেমন ?

যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভোলা সেনের গিন্নী।—কী মুশকিল। কোন পুরনো জিনিসটা আমি হারাতে চাইছিলাম ? এমন কি মহামূল্যবান সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আমি জলে নেমেছিলাম ? মোটে তো উনিশ টাকা দাম কস্টিউমটার, নাইলন না সুতীর, যদি আমি ডুবতাম তোমার চল্লিশ টাকা ক্ষতি হত, না কি তার বেশি কিছু হারাত ?

—নাকি তার বেশি কিছু হারাত ! ভোলা সেন বড় করে ভেংচি কাটল। তারপর অবিনাশের দিকে চোখ ফেরাল। আপনি বুঝিয়ে দিন গাঙ্গুলীমশাই—কী জিনিস আমার অর্ধাঙ্গিনী হারাতে চাইছিলেন।

অবিনাশ চুপ। অধোবদন। তেমনি সুদীপা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিল। মরাল গ্রীবা গুঁজে থাকল তার গিন্নী।

—তা-ও তো মুলিয়াটা সঙ্গে ছিল। সে কি আমার গায়ের এমন অদ্ভুত সুন্দর বটল-গ্রীন পোশাকটা হারাতে দিত ? কখনো না। ওটা হারাবার আগে যে আমি হারাতাম কি বলছেন মিঃ গাঙ্গুলী ? আমি জলে ডুবতাম তারপর তো আমার সাঁতারের পোশাক যেত। কিন্তু আমাকে কেমন পাঁজাকোলা করে বুকের

কাছে ধরে রাখল লোকটা, আমার ডুবে যাবার কোন চান্সই ছিল না এই তো এসে গেছে। নাও হে তোমার বখশিস। হাতের ছোট্ট লাল ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলেন মিসেস সেন। সুদীপা অবাক। মাত্র দু' টাকা বখশিস দিয়েছে সে তার নুলিয়াকে। তাতেই লোকটা মোটামুটি খুশি হয়েছিল। আর এই মহিলা কিনা—পাঁচ টাকার নোটটা কোমরে গুঁজে আহ্লাদে নাচতে নাচতে চলে যায় মিসেস সেনের নুলিয়া। তার দৈত্যের মতন কালো জোয়ান শরীরটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুদীপা কিছু ভাবে। তাই তো, মিসেস সেন জলেও নামলেন না, এমন কি কাজ করল লোকটা যে তাকে খুশি করতে পাঁচ টাকার একটা নোট···

গিন্নীর মনের কথা টের পেয়ে অবিনাশ ঠোঁট টিপে হাসে। কিন্তু কিছু বলার সুযোগ কোথায় এখানে? সমুদ্রের উত্তাল অস্থির হাওয়ার চেয়েও যে জোরালো ঝড়ো বাতাস বইছে তার ডাইনে বাঁয়ে।

—কি হল, চুপ করে আছ কেন, উত্তর দাও। মিসেস সেন ওদিক থেকে কটমট করে ভোলা সেনের মুখটা দেখে—এমন খুঁতখুঁতে মন, এমন সাংঘাতিক হুঁশিয়ার চোখ, বাজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু তোমাকে না, সারা-জীবন ওই চোখ নিয়ে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে—কিন্তু আজ আমি কি হারাতে চাইছিলাম যে···উত্তর দাও।

এদিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভোলা সেন উত্তর দেয় না। আকাশের দিকে মুখ। চেহারাটা তেমনি ভাঙাচোরা বিকৃত। যেন আকাশটাকেই মনে মনে গালিগালাজ করছে। রুচি শোভনতা, তার মানে আমার ভালো লাগা। আমার ভাল লাগার জন্য যে-কোন মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যেতে দেব আমি—টুঁ শব্দটি করতে পারবে না তুমি, কথা বলতে পারবে না, তাকাতে পারবে না। চুপ করে থাকবে। সারাজীবন চুপ করে থাকবে। কী চমৎকার।

আকাশের গায়ের লেখাগুলি পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন কেমন উদাস হয়ে গিয়ে ভোলা সেন একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ নামিয়ে অবিনাশের পিঠে হাত রাখল।—চলুন, এইবেলা ফেরা যাক মিঃ গাঙ্গুলী। পশ্চিমের মেঘটা যেন কেমন কেমন লাগছে।

—ঝড় উঠতে পারে। অবিনাশ আস্তে বলল। কিন্তু পশ্চিমের মেঘটা দেখতে চোখ তুলল না।

হুঁ, মেঘ নিয়ে কথা বল, পশ্চিম পুব উত্তর দক্ষিণের মেঘ নিয়ে তোমরা যত খুশি বিশ্লেষণ কর। আমরা খুশি থাকব। আমাদের বিচার করতে এসো না।

পায়ে পায়ে গিন্নীদের বিচার করতে গেলে অশান্তি বাড়বে। মিসেস সেন যেমন ঠোঁট টিপে হাসছিল আর চোখ ঘুরিয়ে সুদীপাকে দেখছিল—মহিলার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের কথা টের পেতে অবিনাশের বেগ পেতে হল না! স্বাভাবিক। অবিনাশ চিন্তা করল। উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ভোলা সেন এখন আর। বরং যেন গিন্নীর প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে হঠাৎ দমে গেছে। অথবা ইচ্ছে করে এমন দমে যাওয়া, চুপ করে থাকা?

স্বামীরা তাই করে। তাদের ধৈর্য অসীম। অবিনাশ নিজেকে দিয়ে বোঝে।

তা ছাড়া কিছুই তো ক্ষয় হয় নি, কিছুই হারাল না। শেষ পর্যন্ত ষোল আনা জিনিসটাই তো ভোলাবাবু ফেরত পেলেন। কেমন কাচের বাক্সের মতন যত্ন করে সেন গিন্নীকে এনে তীরে নামিয়ে দিল হুলিয়া।

তা ছাড়া মিসেস সেন খুব একটা জেদাজেদি করলেন কি? ঘরের কর্তার লাফালাফি দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডাঙায় ফিরে আসতেই হল। কতক্ষণ আর হুলিয়ার বুকের সঙ্গে লেপটে থাকতে পারলেন?

—বুঝেছেন, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন, নিত্য রাগারাগি জেদাজেদিও করবেন খুব, আখুটেপনা। আবার আমাদের ডাক শুনে সুড় সুড় করে চলেও আসবেন। এর নাম গিন্নী। অর্ধাঙ্গিনী। হি হি! ভোলা সেনের কাঁধে হাত রেখে অবিনাশ ফিসফিসে গলায় বোঝায়। হাসে।

কথা না বলে ভোলা সেন হাঁটে। মুখের ভাঙাচোরা ভাবটা সরে যায়, রেখাটেখাগুলো আস্তে আস্তে মুছে যায়। একটু যেন হাসির রোদ উঁকি দেয় সেখানে। গল্প করতে করতে দুই গিন্নী আগে আগে চলেছেন।

॥ ৮ ॥

মাঝ রাস্তায় বড় বড় ফোঁটা পড়ছিল। কাছেই একটা চায়ের দোকান। ঝড়জলের মুখে ঝাউজঙ্গলে কিছু আশ্রয় নেওয়া চলত না। হোটেল এখনও অনেক দূরে।

দোকানটা ছোট। একদিক থেকে ভাল। মোটে ভিড় নেই। সমুদ্রের হাঁক-ডাক কম কানে আসে। নির্জনতার নিঃশব্দতার স্বাদটা পুরোপুরি এখানে পাওয়া যায়।

উনুনের কেটলিতে টগবগ করে চায়ের জল ফুটছিল। শব্দটা শোনা গেল। একটা কানা ছেলে এদিক-ওদিক ঘুরে চা-টা খাবারটা দিচ্ছে। একটা টেবিল ঘিরে চারজন বসে পড়ল।

ভোলা সেন চায়ের অর্ডার দিল। অবিনাশ কেক্-এর কথা বলে দিল। 'শুধু' চা গেলা যায় না মিঃ সেন। ভোলা সেন অল্প হেসে ঘাড় নাড়ল। কথা বলল না। দুই গিন্নী অর্ডার দেওয়া-দেওয়ির মধ্যে নেই। যা আনাবে তাই খাব আমরা। না আনাও তো বয়ে গেল। আমরা আমাদের খোরাক সঙ্গে এনেছি। যেন এই মনের ভাব দু'জনের।

অবিনাশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। ভোলা সেন দেখল।

কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গিন্নীরা এক এক সময় মেতে থাকতে পারেন। যেন দুটি ইস্কুলে পড়া মেয়ে এখন তারা।

হুঁ, সঙ্গে প্রচুর খোরাক, অস্বীকার করার উপায় নেই। এত ঝিনুক শামুক কুড়িয়ে এনেছেন বালুবেলা থেকে। দুটো থলে বোঝাই হয়ে গেছে। এবার উহুঁ সুবিধে হল না। টেবিলটা ছোট। তাছাড়া মেয়েদের ধনদৌলতের ওপর পুরুষদের সব সময় বাঁকা দৃষ্টি—যা ওদের একেবারে পছন্দ না। হুঁ, ধনদৌলত—সে টাকা-পয়সা হোক, ঝিনুক শামুক, রঙিন পাখির পালক, কাঁচপোকার টিপ বা ঝিনুকের বোতাম সেফটিপিন, কি শুকনো আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা—পুরুষদের চোখ থেকে—কর্তাদের নজর থেকে গিন্নীরা সর্বদা গোপন করবেনই। সব দেশের গিন্নীরাই তা করেন। আমাদের একান্ত করে কিছু জিনিস কাছে রাখার ভাল লাগার উপর, দোহাই, তোমরা চোখ দেবে না। তোমাদের চোখ মোটেই ভাল নয়। সব জলেপুড়ে খাক হয়ে যায়।

কাজেই দেখা গেল ঝিনুক শামুক বোঝাই মূল্যবান থলে দুটো তুলে নিয়ে গিন্নীরা চুপটি করে এক সময় অন্য একটা টেবিলে সরে গেলেন।

কর্তারা কিছু বললেন না। চুপ থেকে কাণ্ডটা দেখলেন।

চা ও কেক চলে এল।

নিজেদের ভাগের দুটো চা ও খাবার রেখে বাকি দুটো চা-কেক তাঁরা গিন্নীদের টেবিলে পাঠিয়ে দিলেন। এ ছাড়া দুই ভদ্রলোকের আর কিছু যেন করার ছিল না।

কিন্তু চা-কেক কতটা মন দিয়ে খেতে পারছিলেন দুই গিন্নী? থলে উপুড় করে ঝনঝন করে সব ধনরত্ন তাঁরা টেবিলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর দারুণ উত্তেজনা নিয়ে বাছাইয়ের কাজে লেগে গেছেন। দুধের মতন ধবধবে সাদা, দুধে-আলতা রঙের, ফ্যাকাশে-সবুজ, খয়েরি ছিট দেওয়া কিছু। কত রকমের ঝিনুক কত সাইজের। আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। তেমন রঙ-বেরঙের শামুক।

কর্তারা কেক্-এ কামড় বসান আর হাঁ করে তাকিয়ে ওই টেবিলটা দেখেন। গিন্নীদের চম্পক অঙ্গুলিস্পর্শে ঝিনুক-শামুক আর ঝিনুক-শামুক থাকছে না। চুনি পান্না হীরে মাণিক্য হয়ে যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেসদের কালো আয়ত গভীর চোখে বিদ্যুৎঝলক খেলা করে উঠছে। দেখবার মতন।

—আহা, যদি এই নিয়ে সারাজীবন ওঁরা মেতে থাকতে পারতেন! কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল ভোলা সেনের। সে ভাবেই দু' কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি তুলে আপেক্ষের নিশ্বাস ছাড়লেন।

—তা কি আর হয়। তা হলে আমার গিন্নী আমার ছিদ্র টিদ্রগুলো কখন খুঁজে বার করবেন, আপনার উনিই বা আপনার ছিদ্রগুলো কখন খুঁজবেন? অবিনাশ মৃদু গলায় হাসল।—মজা হচ্ছে এই যে ওঁরা, আমাদের মিসেসরা একদিকে যেমন খুকু হতে জানেন, অন্যদিকে কান পাকড়ে আমাদের এটা ওটা ত্রুটি শোধরাতে সারাক্ষণ চোখ পাকিয়ে আছেন।

ভোলা সেন চুপ করে রইল।

—তবে কিনা যতক্ষণ ঝিনুক-শামুক নিয়ে ওঁরা ভুলে থাকেন, ততটা সময় আমাদের শান্তি। অবিনাশ আর হাসল না। বলল, তবু রক্ষে, ঈশ্বর কিছুটা সময় গিন্নীদের খুকি করে রাখেন।

চায়ের দোকানটা আরও নীরব নির্জন হয়ে গেল। যে দু' চারজন খদ্দের ছিল, চা ও খাবারটি খেয়ে কেটে পড়েছে। এখন বাইরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। দুটো একটা পাখির টুই টুই শব্দ। শেয়ালের মতন ছিপছিপে কালো শরীরটা নিয়ে একটা লোক ভিতরে ঢুকল। চোখ দুটো পানকৌড়ির চোখের মতন লাল। যেন সারাদিন জলে ছিল। এইমাত্র জল থেকে উঠে এসেছে। কাঁধে একটা ঝোলা!

—ঝোলার মধ্যে কি হে তোমার?

সাদা দাঁত ছড়িয়ে অবিনাশের দিকে চোখ ঘুরিয়ে লোকটা হাসে।

—আমি ম্যাজিকের খেলা দেখাই।

—অ্যাঁ! খুব ভাল কথা। ভোলা সেন সরস হয়ে উঠল। এতক্ষণ মন-মরা হয়ে ছিল। কি কি খেলা দেখাতে পার—এদিকে এসো।

তাসের খেলা, রুমালের খেলা, টাকার খেলা, পায়রা ওড়ানো, মরা গাছে ফুল ফোটানো—কোন খেলা দেখতে চান বাবুরা?

—টাকার খেলাটা কি রকম? অবিনাশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। রোগা

ছিপছিপে মানুষটার কত বড় এক একটা দাঁত। ঐ যে বলে মূলোর মতন দাঁত। সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে সে হাসে। দেখলে ভয় করে।—দেশলাইয়ের কাঠি থেকে টাকা তৈরী করতে পারি, সিগারেটের ছাই থেকে পারি, মোড়া কাগজ, মাটির ঢেলা নখ চুল বোতাম ঝিনুক—যা আমার হাতে গুঁজে দেবেন, ব্যস্, এক সেকেণ্ড পরে আমি মুঠ আলগা করব। দেখে তাজ্জব বনে যাবেন।

—তার মানে টাকা হয়ে যাবে! ভোলা সেন শ্বাস ফেলতে সময় পায় না কথাটা বলতে গিয়ে। ঘাড় কাত করে লোকটা দাঁত ছড়িয়ে হাসে।

—দেখাও দেখাও, আরম্ভ কর খেলা। অবিনাশ তক্ষুণি একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি মেঝে থেকে তুলে লোকটার হাতে গুঁজে দিল।

—চোখ বন্ধ করুন। ম্যাজিকওলা আর হাসে না।

—উঁহু, তা কেন হবে। টাকার খেলা কি আমরা নতুন দেখছি হে! অবিনাশ মাথা ঝাঁকায়।

—তাই তো। ভোলা সেন সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ে।—কলকাতায় হাজার গণ্ডা লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তোমার মতন তারাও ম্যাজিকের খেলা দেখায় দেশলাইয়ের কাঠি কাগজের টুকরো মাটির ঢেলা শুকনো গাছের পাতা থেকে তারাও হরদম টাকা বানায়—কিন্তু আমাদের চোখ বন্ধ করতে তারা কখনো বলে না। যা হবে আমাদের চোখের সামনে হবে। তবে তো ম্যাজিকের খেলা।

—হুঁ, তাই। আমরা চোখ বুজব। আর সেই ফাঁকে পকেট থেকে কি টেঁক থেকে তুমি টাকা বের করে নিয়ে তোমার মুঠোর মধ্যে গুঁজবে—আর চোখ খুলে আমরা দেখব সেখানে টাকা, সেটি হবে না চাঁদ। ওটা একটা খেলাই নয়।

—আজ্ঞে আমার খেলা বিলকুল অন্য রকম।

—কি রকম? অবিনাশ সামনের দিকে গলাটা ঝুঁকিয়ে দিল।

—মুঠোর মধ্যে আমি দেশলাইয়ের কাঠি, কাগজের টুকরো রাখব, আপনারা চোখ বন্ধ করবেন। এক দু' তিন, ব্যস্, আমি বলব—এবার বাবুরা চোখ খুলুন, চোখ খুলে দেখলেন আপনাদের হাতের মুঠোয় টাকা।

—আমাদের মুঠোর মধ্যে টাকা? অবিনাশ চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, বাবু।

—ভারি মজা! ভোলা সেন সোৎসাহে বলল, তারপর? টাকাটা কি হবে? হাওয়ার মিশিয়ে যাবে?

—আজ্ঞে না, এ টাকা হাওয়ায় মেশায় না।

—তা হলে?

—থেকে গেল, আপনাদের হয়ে গেল।

—দারুণ খেলা! ভোলা সেন ঘাড় সোজা করল। একটা পোড়া কাঠি থেকে, এক টুকরো বাজে কাগজ থেকে একটা টাকা!

অবিনাশ বলল, টাকাটা নষ্ট হবে না হাওয়ায় মেলাবে না, তুমি যখন খেলা শেষ করে বকশিস নিয়ে চলে যাবে তখন সেটা টাকাই থাকবে? আবার দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে যাবে না, বাজে কাগজে পরিণত হবে না,—এ তো সাংঘাতিক খেলা!

—খুব মজার খেলা! লোকটা সাংঘাতিক শব্দটা ব্যবহার করল না।

—টাকাটা আমি খরচ করতে পারব? অবিনাশ আবার বলল।

—হুঁ। কেন পারবেন না?

—ম্যাজিকের টাকা দেখে দোকানে বাজারে কেউ আপত্তি করবে না তো?

—গভর্নমেন্টের ছাপ-মারা টাকা। আপত্তি করবে কোন বেটা! আপত্তি করলে পুলিস ডাকবেন।

আশ্চর্য! ভোলা সেন ও অবিনাশ এক সঙ্গে বিড় বিড় করে উঠল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল দু'জন।

—টাকাটা ব্যাঙ্কে নেবে? অবিনাশ শুধোল।

—একশো বার নেবে! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নেবে।

—একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি থেকে এক টাকা। আর যদি তোমার দুটো কাঠি গুঁজে দেই? ভোলা সেন শুধাল।

—দু' টাকা।

—তিনটে কাঠি দিলে?

—তিন টাকা।

—আরম্ভ কর আরম্ভ কর। অবিনাশ বলল, আমি চোখ বন্ধ করছি। তোমার হাতে একটা কাঠি গুঁজে দেওয়া হয়েছে।

—আপনিও চোখ বন্ধ করুন। ম্যাজিকওলা ভোলা সেনের দিকে তাকাল।

—হুঁ, করলাম। ভোলা সেন চোখ বুজল। এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট। কোথায়! লোকটা শব্দ করছে না তো। কিছু বলছে না আর।

—কি হে, কি হল! অবিনাশ তাড়া দেয়।

—আরম্ভ কর আরম্ভ কর। ভোলা সেন তাড়া লাগায়।

চোখ বোজা অবস্থায় দু'জন অধৈর্য হয়ে ওঠে। ম্যাজিকওলা গুজ গুজ করে হাসছে।

—হাসছ কেন? বিরক্ত হয় অবিনাশ। তার চোখ খুলে যায়। ভোলা সেন সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকায়।

—তাই তো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? রুষ্ট গলায় ভোলা সেন ধমক লাগায়।

—উঁহু, ঠাট্টা করব কি। দাঁত দিয়ে জিভ কাটে লোকটা। বিনয়ে গলে যায়। আঙুল দিয়ে আর একটা টেবিল দেখায়। ওনাদেরও চোখ বুজতে হবে। যেমন করে গিন্নী-ঠাকরুণেরা তাকিয়ে আছেন এদিকে।

—তাতে খেলা হবে না বুঝি?

—না।

অবিনাশ দেখল তার গিন্নী টলটল করে এদিকে তাকিয়ে আছে। মিসেস সেন তাকিয়ে আছেন।

—তাই তো! ওঁদের তা হলে বলতে হয়। ভোলা সেন গলা উঁচু করে ধরে গিন্নীদের টেবিলের দিকে তাকাল।—মিসেস গাঙ্গুলী আপনি চোখ বুজুন। মৃদুলা তুমি চোখ বন্ধ কর।

অবাধ্য মেয়ে জেদী মেয়ে দুটি। দুই গিন্নী একসঙ্গে মাথা নাড়ে। খিল খিল হাসে। দু' জোড়া কালো ডাগর চোখে হীরে চুণী পান্নার চমক। বালু থেকে কুড়িয়ে আনা ধনরত্ন আর টেবিলে ছড়িয়ে নেই। দু' ভাগ হয়ে দুটো ব্যাগে উঠে গেছে। দু'জনে দুটো ব্যাগ কোলের কাছে ধরে রেখে কর্তাদের দেখে, ম্যাজিকের লোকটাকে দেখছে আর হাসছে।

—এদিকে উঠে আসুন মিসেস গাঙ্গুলী। ভোলা সেন ডাকল। মজার খেলা, টাকার খেলা।

আপনারা চলে আসুন এখানে, মিসেস সেন। অবিনাশ ডাকল। এক সঙ্গে ম্যাজিক দেখা, হাতে টাকা পাওয়া—ভীষণ ব্যাপার!

অ, তা হলে টাকা পাওয়া যাচ্ছে। শুধুই ম্যাজিক না। বুজরুকি না। এবার আর হাসেন না গিন্নীরা। শামুক-ঝিনুকের থলে কাঁধে ঝুলিয়ে ওই টেবিল ছেড়ে এই টেবিলে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। টাকার নাম শুনলে এই জগতে কার না উৎসাহ হয়। কার না চোখ বড় হয়। মিসেস সেন ও মিসেস গাঙ্গুলীর চকচকে কালো চোখ ভাদ্রের তালের মতন বিশাল গোল হয়ে উঠল।...গিন্নীদের ভাল করে খেলাটা বুঝিয়ে দিলেন দুই সংসারের দুই কর্তা।

—আরম্ভ কর, আরম্ভ কর হে। মিসেস সেন ও মিসেস গাঙ্গুলী একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।—এই খেলাটা হয়ে যাক, তারপর কিন্তু আমরা দু'জনে খেলব।

আমাদের হাতে টাকা বানিয়ে দেবে। আমরা ঝিনুক দিয়ে খেলব। যত বিনুক তত টাকা করে দেবে আমাদের।

শেয়ালের মতন রোগা খিটখিটে ধোঁয়ার রাঙা শরীরটা নাচিয়ে ম্যাজিকের লোকটা খিক খিক হাসে। লাল ছোট পানকৌটি চোখে ঝকঝকে খুশির বিদ্যুৎ। গোলাপের মতন সুন্দর দুটি মুখ নিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে দুই গিন্নী ক্রমাগত তাকে দেখছেন। এতক্ষণ ওধারের টেবিলে বসে কেমন নাক ঠোঁট বেঁকাচ্ছিলেন না! এখন ম্যাজিকওলার ওপর অগাধ প্রেম ভক্তি।

—আরম্ভ করে দাও খেলা, আর দেরি করো না। আদুরে গলায় গিন্নীরা কথা বলেন।

হুঁ, সবাই একসঙ্গে চোখ বন্ধ করুন। মুঠোর মধ্যে অবিনাশের দেওয়া পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটা নিয়ে ম্যাজিকওলা চেঁচায়। এক দু তিন। এক সঙ্গে চার জোড়া চোখ বুজে গেল।

কিন্তু কোথায়! তারপর আর শব্দ নেই লোকটার মুখে।

—কি হে, চুপ করে আছ যে? ভোলা সেন চোখ বন্ধ রেখে গজ গজ করতে থাকে।

—তোমার মতলবখানা কী বলতে পার? চোখ বুজে থেকে অবিনাশ হাঁকল।

—আজ্ঞে হচ্ছে না কর্তা।

—কেন! কেউ তো এখানে তাকিয়ে নেই। এবার দুই গিন্নী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হুঁ, তাকিয়ে আছে বৈকি। চোখ মেলে দেখুন।

কি মুশকিল! কে আবার তাকাচ্ছে।

—তোমরা কেউ তাকাচ্ছিলে? কর্তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন গিন্নীরা।

—উঁহু, আমরা তাকাব কেন? অবিনাশ ও ভোলা সেন বোজা চোখ মেলে দিয়ে জোরে মাথা ঝাঁকাল। আমরাই তো বরং তোমাদের দু'জনকে খেলা দেখতে ডেকে আনলাম। একসঙ্গে ম্যাজিক দেখা, হাতে টাকা পাওয়া। মজার খেলা।

—কোথায় আর মজা হচ্ছে। বেটার সব বুজরুকি। কিছুই পারে না। গিন্নীরা ঠোঁট বেঁকিয়ে গোঁসা করার মতন ভয়ানক চেহারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালেন থুথনি নাড়লেন।—সবাই চোখ বুজলাম। এখন বলছে কিনা কেউ তাকিয়ে আছে। মিছে কথা।

—হুঁ, তাকিয়ে ছিল। সাদা দাঁত ছড়িয়ে লোকটা হাসল। কেউ তাকালে ম্যাজিক হবে না, টাকা বানানো যাবে না। কাঠি কাঠি থেকে যাবে, কাগজের টুকরো কাগজের টুকরো থেকে যাবে, ঝিনুক-শামুক ঝিনুক-শামুক থেকে যাবে। এই তো দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা এখনো আমার হাতে ধরা।

—কে তাকাচ্ছিল তুমি বল না! অবিনাশ ও ভোলা সেন একসঙ্গে ধমক লাগান।

—ঐ দেখুন! ম্যাজিকওলা আঙুল তুলে দেখায়।

তাই তো। চারজন অবাক! তারা ছাড়া দোকানে আর খদ্দের কোথায়। কেবল দোকানের কর্মচারী সেই কানা ছেলেটা। চুপ করে একটা বেঞ্চের ওপর বসে এদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

—ঐ কানা ছোঁড়ার কথা বলছ? অবিনাশ শুধোল।

—হুঁ। ম্যাজিকওলা ঘাড় কাত করল।

—কানা চোখ নিয়ে ও আর কতটা দেখবে হে। মিসেস সেন ভুরু কুঁচকোলেন।

—বাচ্ছা ছেলে। মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, ম্যাজিকের খেলার ও বোঝেই বা কি।

—ম্যাজিকের খেলা না বুঝুক টাকার খেলা বোঝে। টাকার খেলা দুধের ছানাও বোঝে। ভোলা সেন স্বীকার করল। বলল, তবে কিনা একটা চোখ কানা। হয়তো খুব বেশি দেখতে পায় না!

—খুব দেখতে পায়। ম্যাজিকওলা আর হাসে না। ঘাড় নেড়ে বলে, দু'চোখ নিয়ে আমি আপনি যত না দেখি এক চোখ নিয়ে কানা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি দেখে।

—এই ছোঁড়া, এখানে খেলা হচ্ছে। চোখ বন্ধ কর। অবিনাশ হেঁকে উঠল।

—মাপ করবেন মশাই। পিছনের দরজা দিয়ে ম্যানেজার ঢুকল। এটা আমার দোকান। আপনারা খদ্দেররা চোখ কান বুজে থেকে যত খুশি টাকার খেলা খেলুন। আমরা চোখ বন্ধ করতে পারি না। আমি না, আমার কর্মচারীও না। দোকানের ক্যাশ আছে—পেয়ালা পিরিচ গ্লাস কাঁটা চামচ কত কি জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়িয়ে। যদি কিছু খোয়া যায়? আমরা অন্ধ সেজে বসে থাকতে পারি না। এটা ওটা চুরি যাবার ভয় আছে।

অপমানের মতন লাগল কথাটা। মুখ কালো করে ভোলা সেন চুপ। অবিনাশ চুপ।

কিন্তু গিন্নীরা চুপ থাকলেন না। ফিস ফিস করে দু'জনে কিছু বলাবলি করলেন। তারপর কর্তাদের চোখের ইশারায় কিছু বলতে কর্তারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

—তাই ভাল, ভোলা সেন অবিনাশের কাঁধে হাত রাখল। চলুন মিঃ গাঙ্গুলী, বাইরে কোথাও গিয়ে ম্যাজিকের খেলা দেখব আমরা।

—তাই ভাল। অবিনাশ ম্যানেজারের দিকে তাকাল। পকেট থেকে তক্ষুণি পার্স তুলে টাকা বের করল। এই নিন মশাই, আপনার চা কেক-এর দাম। সবশুদ্ধ কত হল?

—তিন টাকা বারো আনা?

কানা ছেলেটা ছুটে এসে দামটা নিল।

॥ ৯ ॥

ম্যাজিকওলা আগে, চারজনের দলটা পিছনে, একসঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। ঝিঁঝি ডাকছে। রোদ নেই। যেন এখনি অন্ধকার হবে।

—তোমার জানাশোনা জায়গা আছে? নাকি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে খেলা দেখাবে?

—উহুঁ, ম্যাজিকওলা ঘাড় নাড়ে। আমার সঙ্গে আসুন।

গিন্নীরা খুশি।

ম্যাজিকওলা আগে আগে হাঁটে। দুই গিন্নী তার পিছনে চলে। তারপর দুই কর্তা হাঁটে।

—চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবার ওখানে কেউ নেই, তাই না?

—খুব নিরিবিলি জায়গা। ম্যাজিকওলা ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, কেবল আপনারা, দু গিন্নী দু কর্তা, আর আমি থাকব। তাছাড়া কাকটিও না।

—চমৎকার। মিসেস সেন ও মিসেস গাঙ্গুলী আহ্লাদে পরস্পরের গা টেপাটেপি করল। যেন দুটি বোন। দুটি সখী।

আবার বালুর ঢিবি। ঝাউবন। নিরিবিলি কোথাও যেতে হলে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে এসব পড়বেই। যেখানকার যা। কলকাতায় যেমন গাড়ি ঘোড়া দোকান বাড়ি ডাস্টবিন পায়খানা।

মেঘটা কেটে গেছে। রীতিমত চাঁদ উঠল একটা। হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না। সমুদ্রের গর্জন নতুন করে শোনা যাচ্ছিল।

—আজ আর হোটেলে ফেরা হবে না মিঃ সেন। অবিনাশ বলল।

—আমরা সারারাত খেলা দেখব। ভোলা সেন বলল।

—মনে হচ্ছে গিন্নীরা যেন এবার আগে খেলবেন।

—তাই খেলুক। ভোলা সেন বলল, ঝিনুক দিয়ে খেলা শুরু হবে।

—অনেক ঝিনুক যে সঙ্গে ওঁদের। অবিনাশ না হেসে পারল না।

—অনেক টাকার দরকার যে গিন্নীদের। ভোলা সেন উত্তর করল! টাকা টাকা করে সারাবছর আমাদের জান-প্রাণ কাহিল করে দেন ওঁরা, আপনি কি জানেন না।

—তাও বটে! অবিনাশ আস্তে মাথা নাড়ল।

—মনে হয় ভূতের বাড়ি।

উঁহু। দরজার তালা খুলে ম্যাজিকঅলা আগে ঢুকল। আলো জালল। চারজনের দলটা পিছনে ঢুকল। চেঞ্জাররা এলে ভাড়া নেন এবাড়ি। দেওয়ালের তাকে মোমবাতিটা রেখে ম্যাজিকওলা বলল, এখন খালি পড়ে আছে। আপনারা অনায়াসে ভাড়া নিতে পারেন। চমৎকার ঘর।

—আমরা যে হোটেলে আছি।

—হোটেলে থাকার এক স্বাদ, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকার অন্য সুখ।

—তাও বটে। গিন্নীরা মাথা ঝাঁকালেন।

—সে-সব ভাবনা পরে হবে। এখন খেলা আরম্ভ হোক। ভোলা সেন প্রস্তাব করল।

—হুঁ, অবিনাশ থুতনি নাচাল। আগে খেলা। তারপর হোটেলে থাকা কি এখানে চলে আসা দেখা যাবে।

ম্যাজিকওলা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিল মেঝেয়। বসে পড়ুন সব। গোলাহয়ে বসুন। চারজন গোল হয়ে বসল। মাঝখানে ম্যাজিকওলা।

—এক সঙ্গে তিনটে ঝিনুক তোমাকে দিচ্ছি। ব্যাগ থেকে ঝিনুক তুলে সুদীপা লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমার হাতে কিন্তু একসঙ্গে তিন-টাকা আসা চাই।

—নিশ্চয়ই আসবে, কেন আসবে না। ম্যাজিকওলা বড় করে ঘাড় কাত করল। একসঙ্গে দশটা ঝিনুক নিয়েও আপনি খেলতে পারেন। সবাই চোখ বুজে থাকলে করকরে দশ টাকা আপনার মুঠোর মধ্যে ইজিলি এসে যাবে।

—কাগজের টাকা?

—এখন নোট ছাড়া আর আছে কি বলুন? ম্যাজিকওলা দাঁত ছড়িয়ে হাসল। কয়েন্ কি চোখে দেখেন?

—তাই ভাল তাই ভাল। মৃদুলা বলল, কাগজের টাকাই তুমি বানিয়ে দাও। মিসেস গাঙ্গুলীরটা হয়ে গেলে আমি একসঙ্গে দশটা ঝিনুক তোমার হাতে গুঁজে দেব।

—হুঁ, সুদীপা বলল, তারপর আবার আমি। এখন তিনটে ঝিনুক নিয়ে খেলছি, তখন একসঙ্গে পনেরোটা ঝিনুক তোমার হাতে দেব।

—মানে এভাবে পর পর আমরা দু'জন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলব। মৃদুলা বলল, যতক্ষণ না আমাদের থলের ঝিনুক শেষ হয়। যতক্ষণ না সব ঝিনুক টাকা হয়ে আমাদের হাতে আসে।

—খেলুন না। যেভাবে খুশি খেলুন আপনারা। আমি রাজী। কিন্তু চোখ বুজে থাকতে হবে ঘরের সবাইকে।

—তাই হবে তাই হবে। তুমি এবেলা আরম্ভ করে দাও তো। ভোলা সেন বিরক্ত হয়। বেশি কথা বলা স্বভাব তোমার।

—হুঁ, তাই কপাল কুঁচকে অবিনাশ বলল, আমরা কথা শুনতে চাই না। তোমার খেলা দেখতে চাই। কতবড় ম্যাজিশিয়ান তুমি দেখব। সবাই চোখ বুজে থাকবে। কেউ চোখ খুলবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এবার শুরু কর।

—রেডি! চোখ বুজুন।

—হুঁ, বুজলাম। মিসেসদের গলাটা বেশি শোনা গেল।

এক দু' তিন। আর কোন শব্দ নেই। লোকটা একেবারে চুপ। যেন পাথরের মতন বোবা হয়ে আছে। ঘরের ভিতর একটা পোকা কোথায় কি যেন কাটছে। অত্যন্ত মৃদু ঝিরঝির শব্দ। অথবা যেন এটা কোন শব্দই নয়। শব্দের অনুভূতি মাত্র। চারটে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে পারত। কিন্তু কেউ যেন শ্বাস ফেলছে না। ভয়ানক চমকপ্রদ অথবা সাংঘাতিক আশ্চর্যের অথবা ভয়ের কিছু ঘটবার আগের মুহূর্তে মানুষ এমন রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ?

কি হল ম্যাজিকওলা। সুদীপার কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল। আমাদের চোখ খুলতে বলছ না যে, কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়! এদিকে আমার হাত শূন্য—আমার হাতে এখনো পর্যন্ত কিছু এল না। না কাগজের নোট, না কয়েন।

—না, কি করে আসবে? ভারি গলার স্বর ম্যাজিকঅলার।

—কেন, সবাই তো চোখ বুজে আছি আমরা।

—একজন তাকিয়ে আছেন।

—কে? কে? সুদীপা, সুদীপার সঙ্গে মৃদুলা, সেই সঙ্গে ভোলা সেন চেঁচিয়ে উঠল। তিন জোড়া চোখ তৎক্ষণাৎ খুলে গেল—কি ব্যাপার?

অবিনাশ! যেন লজ্জার গ্লানি নিয়ে অপরিসীম অস্বস্তি নিয়ে অনুতপ্ত একটি মানুষ। ঘাড় গুঁজে চুপ করে আছে!

—তুমি কি চোখ বন্ধ কর নি। সুদীপা আর্তনাদ করে উঠল। গলার স্বরটা তাই শোনাল।

—মিঃ গাঙ্গুলী! ভোলা সেন ডাকল। কি হল আপনার? আমাদের সকলের চোখ বন্ধ করে থাকার কথা। খেলাটা সবে শুরু হচ্ছিল যে—

—নাকি তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে চোখ বন্ধ না করলে ঝিনুক থেকে টাকা হবে না! তোমার ভুলো মন কি কোনদিনই শোধরাবে না! রাগে দুঃখে সুদীপা কি করবে বুঝতে পারে না। কথা বলছ না কেন?

গিন্নীর চোখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল।

—লাইটারটা কোথায় রেখে এলাম মনে করতে পারছি না। পকেটে নেই।

—কি আশ্চর্য, কোথায় ফেলে এসেছ?

—কেন? ভোলা সেন তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল। আমি তো ক'বারই মশাই আপনার লাইটার চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে যন্ত্রটা আবার আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। কোথায় ফেললেন?

—দেখুন তো আপনার পকেটে আছে কি না, মিঃ সেন। করুণ চোখে অবিনাশ ভোলা সেনের দিকে তাকাল।

—কি মুশকিল, আমার কি এত ভুল হয়। আমার কোনদিনই কিছু ভুল হয় না। বেজায় হুঁশিয়ার ভীষণ সতর্ক—যে জন্য আমার মিসেস আমাকে মোটেই—আড়চোখে মৃদুলাকে দেখে ভোলা সেন মৃদু হাসল। তারপর শার্ট ও প্যান্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করল।—নেই। বললাম যে। দু'দিকের পকেট থেকে শূন্য হাত দুটো বের করে আনল ভোলা সেন।

—না না, আপনার ভুল হবে কেন। সুদীপা দাঁতে দাঁত ঘষল। ভুল করেন ইনি, আমার ঘরের কর্তা। ওফ, চিরকাল ভুল করে চিরকাল এটা ওটা হারাতে হারাতে তিনি আসছেন।

—আমার মনে হয় চায়ের দোকানে লাইটারটা ফেলে এসেছি। বিড় বিড় করে বলল অবিনাশ।

—না! সুদীপা ধমক লাগাল। চায়ের দোকানে তুমি সিগারেট ধরাওনি। মিঃ সেনকেও আমি সেখানে সিগারেট ধরাতে দেখিনি। একবারও না।

—ঠিক বলেছেন। আমি শেষ সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম বীচে। ভোলা সেন সুদীপার চোখের দিকে তাকাল। যখন আপনি ও মিসেস সেন ঢিবির আড়ালে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে সাঁতারের পোশাক পরছিলেন।

—তবে বোধ করি ওখানেই ফেলে এসেছি। অবিনাশ ঝপ্ করে উঠে দাঁড়াল।

—আপনি কি লাইটার খুঁজতে এখন বীচে যাচ্ছেন? ভোলা সেন চোখ বড় করল।

—আগে চায়ের দোকানটা দেখব, তারপর বীচে গিয়ে খুঁজব।

—হা—রে অদৃষ্ট! কী জীবন আমার! কপালে করাঘাত করার অবস্থা দাঁড়াল সুদীপার। হ্যাঁ, কোথায় লাইটারটা শেষবার পকেট থেকে বার করল তাই মনে করতে পারছে না—এর মধ্যেই ভুলে গেছে—এই মানুষ সারাজীবন এটা-ওটা হারাবে না তো কি…

—হুঁ, ঘাড় নিচু করে অবিনাশ আমতা আমতা করল, তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলল। অনেক কিছু এই জীবনে হারিয়েছি, অস্বীকার করব না সুদীপা, কিন্তু…

—বলুন, থেমে গেলেন কেন! ভোলা সেন অভয় দেবার মতন গলার স্বর করল।

থাক, বলতে হবে না। সুদীপা জোরে মাথা ঝাঁকাল। ওর ওই তোষামুদে কথা অনেক শুনেছি মিঃ সেন, শুনতে শুনতে আমার দু' কান পচে গেছে—আর আমি শুনতে চাই না।

ভোলা সেন চুপ।

মৃদুলা বলল, আপনি বড্ড বেশি অস্থির হচ্ছেন ভাই। সামান্য একটা জিনিস—সুদীপার মাথা ঝাঁকানো থেমে গেল।

—সামান্য জিনিস বা দামী জিনিস হারাচ্ছে বলে নয়, ওর কথা শুনতে শুনতে আমি টায়ার্ড হয়ে পড়েছি মিসেস সেন—চিৎকার করে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে, মরে যেতে ইচ্ছে করে—বলে কি যা-ই হারাই না কেন, তুমি ঠিক থাকবে, আমাকে প্রবোধ দেয়, বলে, তোমাকে কোন দিন হারাব না—অ্যাঁ, যেন ওর এই আহ্লাদের বাক্য শুনে আমি গলে যাব। রোজ ঘরের এত তত জিনিস হারাবে, চুপ করে থাকব, আমি খুকী—আমায় কী পেয়েছে ও বলতে পারেন আপনারা? ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল সুদীপা।

—আমি যাচ্ছি, আমি এখনি জিনিসটা খুঁজে আনব, আমার মনে হয় তখন বালুর ওপর—অবিনাশ আর দাঁড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—এক্ষুণি যাও, এক্ষুণি গিয়ে ওটা খুঁজে আন। যেখান থেকে পার। দরজার কাছে ছুটে গেল সুদীপা। দ্রুত শ্বাস ফেলার দরুন তার সুঠাম উন্নত বুক বার বার স্পন্দিত হচ্ছিল। লম্বা শরীরটা কাঁপছিল। ভোলা সেন একভাবে এদিকে তাকিয়ে। ম্যাজিকওলা চুপ। মৃদুলা চুপ। মৃদুলার অস্বস্তি ক্রমে বাড়ছিল চেহারা দেখে বোঝা গেল।

—তুমি মনে রেখো, সুদীপা দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে মুখ করে চিৎকার করে অবিনাশকে বলছিল, অনেক দাম করে ধর্মতলার এই দোকান সেই দোকান ঘুরে লাইটারটা তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম। যদি ওটা আজ হারাও, খুঁজে না পাও, তো আমাকেও তুমি হারাবে। আমি ইচ্ছে করে হারিয়ে যাব। যাতে কোনদিন আর খুঁজে না পাও। মনে রেখো—চৌকাঠের ওপারে চলে গিয়ে সুদীপা আরও জোর চিৎকার করে উঠল, কেননা অবিনাশ আরও দূরে সরে গেছে।—মনে রেখো, এটা কলকাতা না, বি আর সেন রোডের চার দেয়াল-ঘেরা বাড়ি না। একটা বিশাল সমুদ্র এখানে রয়েছে। প্রকাণ্ড আকাশ মাথার ওপর। আর ধু ধু বালু। এখানে হারিয়ে যাবার অনেক সুখ—

—মিসেস গাঙ্গুলী। ভোলা সেন ডাকল। কেননা সুদীপার আর এক পা চৌকাঠের বাইরে চলে গেছে। শুনুন! ভোলা সেনের গলায় উদ্বেগ অস্থিরতা। এভাবে একা একা আপনি বাইরে যাবেন না। এখানকার পথ-ঘাট আপনার জানা নেই। মিসেস গাঙ্গুলী—

—তুমি কেন ডাকছ, কেন বাধা দিচ্ছ ওকে। মৃদুলা মুখ-ঝামটা দিল।

—ম্যাজিকের খেলাটা ফেলে উনি চলে যাচ্ছেন। ভোলা সেন স্ত্রীর দিকে তাকায়।

—যাক না, আমি খেলব, তুমি ম্যাজিক দেখবে।

—আমার যেন মনে হয়—শুকনো আড়ষ্ট গলায় ভোলা সেন বলল, ভদ্রমহিলা সত্যি হারিয়ে যাবেন, হারিয়ে যাবার জন্যে এভাবে ছুটছেন।

—সেটা ওর স্বামী বুঝবেন, মিঃ গাঙ্গুলী বুঝবেন। তুমি চুপ করে বস। চোখ বন্ধ কর। ম্যাজিকওলা—মৃদুলা ডাকল।

—বলুন। আমি তৈরী। আরম্ভ করব?

হুঁ, একসঙ্গে বিশটা ঝিনুক আমি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। একসঙ্গে বিশ টাকা আমার হাতে আসা চাই।

—তাই আসবে। চোখ বন্ধ করুন। রেডি?

—আমরা রেডি।

—ওয়ান টু থ্রি। হুঁ, এবার চোখ খুলে তাকান। ম্যাজিকওলা বলল।

—ওয়াণ্ডারফুল! মৃদুলা হর্ষধ্বনি করে উঠল। কড়কড়ে কুড়িটা নোট আমার হাতে। এ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এই, ওকি? তুমি এখনো চোখ বুজে কেন! তাকাও, ত্যাখো। কনুই দিয়ে স্বামীকে ধাক্কা দিল মৃদুলা!

—আমি অতিরিক্ত সাবধানী, তুমি তো জান। চোখ বোজা অবস্থায় ভোলা সেন হাসল। এখনি তাকাতে চাই না। যদি টাকাগুলো আবার ঝিনুক হয়ে যায়?

—না, তা হবে না। ম্যাজিকওলা আশ্বাস দিল। এই টাকা থেকে গেল। এই টাকা চিরকাল টাকা হয়ে থাকবে।

—ইস্, মৃদুলা বলল, মিসেস গাঙ্গুলী কি বোকা! এতগুলো টাকা পেত, এক থলে ঝিনুক ছিল ওঁর কাছেও, তার চেয়ে সাড়ে সাতটাকা দামের একটা জাপানি লাইটার মহিলার কাছে মূল্যবান হয়ে গেল।

—যাক গে, ওঁর কথা আর ভেবে লাভ নেই। ভোলা সেন গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলল। তুমি খেলতে থাক। তুমি ঝিনুক দিয়ে টাকা করে যাও।

—এবার আমি এক সঙ্গে পঞ্চাশটা ঝিনুক ম্যাজিকওলার হাতে তুলে দিচ্ছি।

—খুব ভাল কথা, আমি তো চোখ বুজেই আছি। ভোলা সেন ঘাড় কাত করল। আরম্ভ কর।

—ম্যাজিকওলা! মৃদুলা ডাকল।

—চোখ বন্ধ করুন।

—হুঁ করলাম।

ওয়ান টু থ্রি…

—ওয়াণ্ডারফুল। মৃদুলা প্রায় পাগল হয়ে গেল। শুনছ? কনুই দিয়ে স্বামীকে ধাক্কা দিল ভোলা সেনের গিন্নী। পঞ্চাশটা ঝিনুক টাকা হয়ে গেছে। ত্যাখো, তাকাও কেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

—খুব ভাল। এখনো আমি তাকাচ্ছি না। ভোলা সেন গম্ভীর গলায় বলল, এবার থলে শুদ্ধ বাকি ঝিনুক ম্যাজিকওলার হাতে তুলে দাও। এক সঙ্গে সব টাকা হয়ে যাক।

—হি-হি! আহ্লাদে গলে যায় মৃদুলা। ম্যাজিকওলার চোখের দিকে

তাকায়। ম্যাজিকওলা, আমার কর্তা কত হুঁশিয়ার দেখ, যতক্ষণ না সব ঝিনুক টাকা হয়ে আমার হাতে আসছে উনি চোখ খুলছেন না। কিছুতেই না।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দাঁত ছড়িয়ে ম্যাজিকওলা হাসল। দারুণ ভালবাসেন আপনার স্বামী আপনাকে।

—নাও আরম্ভ কর।

—রেডি ?

—রেডি।

ওয়ান টু থ্রি...

এই, ত্থাখো ত্থাখো! এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ খুলতে পার, সব ঝিনুক টাকা হয়ে গেছে, একটা ঝিনুকও আর ঝিনুক নেই।

—খুব ভাল কথা। ভোলা সেন আগের মতন মাথা দোলাল। আমার মনে হয় আরো ঝিনুক তোমার কুড়িয়ে আনা উচিত, আরো টাকা কর। সুযোগ এসেছে যখন যত বেশি টাকা করতে পার--চোখ আমি এখনো খুলছি না।

—হি-হি, আরো ঝিনুক কুড়িয়ে আনব। সত্যি টাকা একটা নেশা। আকাশের তারার মতন চোখ দুটো জ্বলে উঠল মৃদুলার। টাকার মতন কিছু নেই জানবে। গানে সুর দেওয়ার মতন করে বলল সে।

—টাকার মতন কিছু নেই ত্রিভুবনে। ভোলা সেন যোগ করল।

—আমি চললাম, বুঝলে, সমুদ্রের কিনারে যত ঝিনুক ছড়িয়ে আছে সব একত্র জড়ো করব। ম্যাজিকওলা!

চলুন, আমিও সঙ্গে যাব, কত আর এখানে বয়ে আনবেন, ওখানে বসে থেকে সব আমি টাকা করে দেব।

—হি-হি, টাকা একটা নেশা। ম্যাজিকওলা, তুমি আশ্চর্য খেলা দেখালে।

॥ ১০ ॥

—এবার চোখ খুলুন। খেলা শেষ।

—খুলেছি, ভোলা সেন হাসল, আপনার হাতে পায়ে অনেক বালু মিসেস গাঙ্গুলী।

—এই যে সুদীপা হাতের লাইটারটা তুলে দেখাল, অল্প করে হাসল, অনেক বালু ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজে পেয়েছি।

—মিঃ গাঙ্গুলী কিন্তু এটা খুঁজবেন, খুঁজছেন।

—সারাজীবন খুঁজুক, ভাবুক এটা খুঁজে না পাওয়া তক আমাকে ও পাবে না।

একটা পোকা খস খস শব্দ করে কোথাও কিছু কাটছে। ভোম্বা সেন ভাবল। ভেবে আর হাসল না।

—ভদ্রলোক কোনদিন এটা খুঁজে পাবেন না। আস্তে বলল সে।

—হুঁ, কোনদিন ও আমাকে খুজে পাবে না। শীর্ণ জ্যোৎস্নার হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সুদীপা ঘাড় কাত করল।

হলুদ হলুদ চাঁদের আলোয় মৃদুলা একটা বড় ঝিনুকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—খেলা শেষ? অবিনাশ হাসে।

—এখনো শেষ হয়নি, এখনো আমার কর্তা চোখ বুজে আছেন।

—অতিরিক্ত হুঁশিয়ার, ভীষণ সাবধানী ভদ্রলোক। অবিনাশ বিড় বিড় করে বলল।

—হু, লোভ। মৃদুলা বড় করে শ্বাস ফেলল। আমাকে দিয়ে সমুদ্রের সব ঝিনুক টাকা করতে চাইছে।

—এত চাইতে গিয়ে এত পেতে গিয়ে মিঃ সেন কী অমূল্য জিনিস হারাচ্ছেন বুঝতে পারলেন না।

—বুঝতে না পারে এই জন্য ম্যাজিকগুলোকে আমি সরিয়ে আনলাম। ঘুমো ঘুমো চোখে মৃদুলা হাসল। বালুর ওপর বসল। আমি আরো খেলব।

———

নয়নাকে আপনারা আগে দেখেননি।

দেখার কথা নয়।

বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী। অসামান্য রূপ।

হুঁ, এখন দেখছেন মেয়েকে। এখন আপনাদের চোখ চড়ক গাছে উঠেছে। কেমন 'লেডী' 'লেডী' চেহারা হয়ে গেছে এই বয়সেই ওর। তাকিয়ে আপনাদের চোখের পলক পড়ে না। আসলে একটি মেয়ের এমন সাংঘাতিক জ্বলন্ত রূপ কিন্তু একদিনে শরীরে এসে ধরা দেয় না।

দেয় কি? যেমন একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন সব কটা পাপড়ি মেলে

দিয়ে আপনার বাগানে কি আপনার বারান্দার টবে একটা গোলাপ খিলখি করে হাসছে। চারিদিকে প্রজাপতি উড়ছে, মৌমাছির গুঞ্জন।

আপনি তখন কী ভাববেন! অবাক চোখ মেলে রূপ যৌবনভরা ফুলটাকে দেখতে দেখতে আপনার কী মনে হবে? একদিনে আকাশ থেকে নেমে এসে আপনার টবের গোলাপ গাছের ডালে সে জায়গা করে নিয়েছে।

বা রাতারাতি স্বর্গের কোনো দূত এসে এত বড় গোলাপটাকে আপনার টবে গাছে বসিয়ে দিয়েছে?

সাগর দত্ত লেনের ছত্রিশের বি-এর পুরোনো স্যাঁতস্যাঁতে বাড়ি থেকে লাল টুকটুকে বটুয়া হাতে সূর্যমুখীর রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি যখন বেরিয়ে আসে আপনার মনের ভাবখানা কি তাই হবে?

এতকাল এই মেয়ে ছিল কোথায়?

একটু তলিয়ে দেখতে গিয়ে ভাবনার অকূল সাগরে আপনি পড়ে যাবেন।

আসলে এই মেয়ে এতকাল এ বাড়িতেই ছিল। যেমন গাছের পাতার আড়ালে গোলাপটা প্রথমে কুঁড়ি হয়ে আর কলি হয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আজ তার বয়েস উনিশ। কিন্তু তার আগে?

উনিশ বছর আগে, ঠিক এ বাড়িতে নয়, নিমতলা স্ট্রীটের একটা কাঠের দোতলা ঘরে টুস্‌কি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিল। রাতে বলে প্রথম আলোটা দেখেছিল অবশ্য ইডেন হাসপাতালের ডেলিভারী ওয়ার্ডের বিছানায়।

তা হাসপাতালের আলো কি আর আলো। ভাল করে তখন চোখও মেলে না। আলোটা দেখতে না দেখতে তিনদিন পর টুস্‌কি মায়ের সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ে চলে আসে তাদের নিমতলার কাঠের বাড়িতে।

হুঁ, তখন টুস্‌কির বাবা নিমতলার একটা কাঠগোলায় ঠিকাদারীর কাজ করত। টুস্‌কি জন্মের পর নীরেনবাবু বছর চার পাঁচ ছিলেন নিমতলা স্ট্রীটের বাড়িতে। কাজেই জাঙ্গিয়া পরা ছোট্ট টুস্‌কি কাঠের বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে একটা মস্ত বড় আকাশ দেখত, রোদ দেখত, বৃষ্টি দেখত, পাখি দেখত, ধোঁয়া দেখত, কুয়াশা দেখত। অর্থাৎ ওপরের দিকে যখন সে তাকাত।

আর নিচে তাকালে ফেরিওয়ালা দেখত, রিক্সা দেখত, ঠেলা গাড়ি। না বাস ও রাস্তায় চলে না, একটা লাইন দেখত বটে, কিন্তু ট্রাম দেখত না। কোনোদিন দেখত কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়ি কি ট্যাক্সি কি অ্যাম্বুলেন্স। আর পায়ে চলা অগুণতি মানুষ।

দমকলের ঘণ্টা বাজান লাল গাড়িও দেখত।

আর দেখত ফুলটুল সাজিয়ে খাটিয়ায় করে কারা মড়া নিয়ে যাচ্ছে 'হরিবল' 'হরিবল' করে এই জিনিসটা দুবেলাই দেখত টুস্‌কি।

মড়া দেখে দেখে সেই শিশু বয়সে টুস্‌কির যেন মৃত্যুর ভয়টা কেটে গিয়েছিল।

অবোধ শিশু। তা হলেও একটা 'মড়া' তার কাছে ডালভাতের সামিল হয়ে গিয়েছিল। ঐ নিমতলার কাঠের বাড়িতেই টুস্‌কির মা যেদিন মারা গেল, টুস্‌কি এক ফোঁটা কাঁদল না।

তেমনি খুব ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপ চন্দন জ্বালিয়ে খৈ ছিটিয়ে 'হরিবল' ধ্বনি করে নীরেনবাবুর বন্ধুরা আত্মীয়রা যখন টুস্‌কির মাকে শ্মশানে নিয়ে যায় টুস্‌কি রোজ যেমন করে, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে খরগোশের বাচ্চার মতন কালো মিশমিশে চোখ দুটো এক ভাবে ধরে রেখে মড়াটা দেখল।

বাড়ির লোকজন ও পড়শীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল টুস্‌কিকে এমন সহজ স্বাভাবিক থাকতে দেখে। বাচ্চাটার মন দারুণ শান্ত, কেউ কেউ সেদিন বলাবলিও করেছিল।

যাই হোক, তখন টুস্‌কির বয়স চার ছাড়িয়ে আট মাস। অর্থাৎ পাঁচ বছর পুরবে পুরবে করছে।

তারপরেই নীরেনবাবু চলে আসেন সাগর দত্ত লেনের বাড়িতে। তখন আর নিমতলার কাঠগোলায় ঠিকাদারী করেন না। একটা চাকরি জুটিয়েছেন ডালহৌসী পাড়ায়। যুদ্ধের পর কাঠের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা চলছিল। তাই ঠিকাদারী করা আর পোষাল না।

—হ্যাঁ, এই সাগর দত্ত লেন। ছত্রিশের বি-এর ছাই রঙা স্যাঁতস্যাঁতে দোতলা বাড়ি থেকে টুস্‌কির আসল জীবন আরম্ভ। মানে তখন থেকে তার পৃথিবীটাকে মোটামুটি দেখতে বুঝতে শুরু হয়।

না, ছ' সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে টুস্‌কি যে আজকের সতেরো বছরের দিব্যাঙ্গনা যুবতী হয়ে উঠবে ও পাড়ার মানুষ স্বপ্নেও বুঝি ভাবত না।

তাই বলা হচ্ছিল, ডালপাতার আড়ালে গোলাপ কুঁড়ির মতন আস্তে আস্তে টুস্‌কি বড় হয়ে উঠছিল, বেড়ে উঠছিল। ঐ বয়সের একটা খুকিকে কে আর তত ভাল করে নজর করে।

ফ্রক পরা টুস্‌কি সাবিত্রী সুন্দরী গার্লস স্কুলের গাড়ি চড়ে লেখাপড়া করতে যায়। টিয়া রঙের সবুজ ফ্রক সবুজ জামা গায়ে।

একটা টিয়া পাখির মতন কিচকিচ শব্দ করত যতক্ষণ গাড়ির ভিতর থাকত, কি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে যতক্ষণ খেলাধুলো করত।

লেখাপড়া সেরে বিকেল পাঁচটা বাজতে আবার সেই কালো লম্বা গাড়িটা থেকে লাল রীবন বাঁধা বেণী পিঠে ঝুলিয়ে বইখাতা ব্যাগ নিয়ে টুস্‌কি টুক্ টুক্ করে লাফিয়ে নেমে বাড়িতে ঢুকত। সাত তাড়াতাড়ি করে স্কুলের জামাটা ছেড়ে ফেলত। হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা ভাত তরকারি কোনোদিন খানিকটা রুটি তরকারি মুখে গুঁজে তক্ষুণি আবার কিচকিচ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে আসত পাড়ার বন্ধুদের খেলাধুলোর আড্ডায়।

তখন সাগর দত্ত লেনের একটা দুটো জায়গা ফাঁকা ছিল। মাঠের মতন ছিল।

যেমন ছত্রিশের বি-এর বাড়িটার ঠিক পরেই 'কালীতারা হোসিয়ারী'র গুদোম ঘরটার পিছনের সেই চমৎকার পোড়ো জায়গাটা। দু'দিকে পাঁচিল ছিল অন্য দু'দিকটা একেবারে খোলা ছিল।

যেন কে কবে বাড়ি করবে মনে করে কোনরকমে জায়গাটা ঘেরার মতলবে দু'দিক ঘিরে এক ইটের গাঁথুনি দিয়ে দেওয়াল তুলেছিল। কিন্তু বাকি দু'দিকের দেওয়াল তোলার কাজ আর শেষ হল না, এবং কোনদিন সেখানটায় বাড়িও উঠল না।

হয়তো দু'দিকের পাঁচিল তুলতে তুলতেই লোকটার হাতের পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল।

স্কুলের ছুটির পর টুস্‌কিরা দারুণ মজা করে সেখানে কানামাছি খেলেছে, এক্কা দুক্কা খেলেছে। মাঠের এক পাশে গরুটা মোষটা ছাগলটা কি হীরু ধোপার দুটো গাধা চরে বেড়াত।

পাঁচিলের এক পাশে হীরু ধোপাদের ঘর ছিল। হীরু ধোপার বৌ ও বুড়ি মা সারা বছর ঘুঁটে শুকিয়ে পাঁচিল দুটোকে ঝাঁজরা করে তুলেছিল।

তাই তো, টুস্‌কিকে এখন জিজ্ঞেস করুন। টুস্‌কি বলে দেবে। সেদিন 'কালীতারা হোসিয়ারী'র গুদোম ঘরের পিছনের পোড়ো জায়গাটায় যখন পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ-রৈ করে খেলাধুলো করত তখন কেমন ঘুঁটের গন্ধ ও হীরু ধোপার দুটো গাধার গায়ের গন্ধ তাদের নাকে লাগত।

ঐ বাচ্চা বয়সে মানুষের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর থাকে কিনা।

কেবল কি হীরু ধোপাদের ঘুঁটের পচা গোবরের গন্ধ, গাধার গায়ের গন্ধ।

পড়ো জায়গাটার দুটো বাড়ির পরেই, আজও যেখানে একটা মনসা গাছ সামনে রেখে লাল টুকটুকে লেটার বক্সটা দাঁড়িয়ে; মধু গয়লার প্রকাণ্ড খাটাল ছিল। ঐ খাটালের গরু মোষই টুস্‌কিদের দেখা জায়গাটায় যখন তখন ঢুকে পড়ে

ঘাস খেত। সবুজ ঘাস কি আর তেমন ছিল, টুস্‌কিদের পায়ের চাপে মাঠের সবটাই প্রায় ন্যাড়া ন্যাড়া হয়ে থাকত। পাঁচিলের ধারে ধারে একটু আধটু ঘাস যা উঁকি দিয়ে থাকত।

হুঁ, খাটালের বিশ্রী গন্ধটাও টুস্‌কির মনে আছে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আর ফণীর তেলেভাজা দোকানের তেলেভাজার গন্ধ। বিকেল পড়তে তেলেভাজার গন্ধে সবটা সাগর দত্ত লেন মাত হয়ে যেত। টুস্‌কি তার সাত বছর আট বছর ন বছর বয়স পর্যন্ত হীরু ধোপার বাড়ির কাছের মাঠে বেপরোয়া ছুটোছুটি করে 'কানামাছি' খেলেছে 'এক্কা দুক্কা' খেলেছে, মধু গয়লার খাটালের কাছের ছোট নালাটায় গা ডুবিয়ে বর্ষার সময় কুঁচো চিংড়ি পুঁটি মাছের লাফালাফি দেখেছে। বস্তুত কলকাতা শহরের ভিতর ওই ছোট্ট নালার জলে কোথা থেকে চিংড়ি পুঁটিরা ঝাঁক বেঁধে ভেসে আসত—টুস্‌কি ভেবে পেত না।

অবশ্য খাটালের পিছনেই প্রমোদ ঘোষাল নামে একটা বড় মানুষের বাগান বাড়ির মতন গাছ-পালা ঘেরা প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি ছিল, বাড়ির সামনে পুকুর ছিল। নিচু জায়গা। বর্ষার সময় পুকুর ভরে গিয়ে নালার সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। পুকুরের মাছেরা তখন নালার দিকে ছুটে গেছে।

নিশ্চয় সেসব ছবি টুস্‌কি আজও ভুলে যায়নি। শ্রাবণ মাসের বিকেলে কোনোদিন যদি সোনাভাঙ্গা রোদ উঠেছে টুস্‌কিরা প্রমোদ ঘোষালের বাগান বাড়িতে দল বেঁধে ঢুকে পড়ত পেয়ারার লোভে। সোনালী রোদে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে ডাঁসা পেয়ারাগুলি যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত।

প্রমোদ ঘোষাল কি তাঁর পরিবার ও বাড়িতে থাকত না। থাকত দু'জন মালী ও একটি দারোয়ান।

পেয়ারার জন্য টুসকিরা বলতে গেলে মালী ও দারোয়ানের পায়ে ধরতে বাকী রেখেছে সেদিন।

ঐ বয়সে ডাঁসা পেয়ারার জন্য এমন বেসামাল লোভ কিছু অস্বাভাবিক ছিল কি। মোটেই না।

যেমন অস্বাভাবিক ছিল না পোড়ো মাঠটায় খেলা-ধুলো শেষ করে দল বেঁধে টুস্‌কিরা যখন ফণীর তেলেভাজার দোকানটা ঘিরে দাঁড়াত।

চার পয়সার তেলেভাজা কিনে তার সঙ্গে একটা বেগুনি বা দুটো ফুলুরি ফাউ চাইতে ফণীর কাছে হাত পাতা টুস্‌কিদের রোজকার ব্যাপার ছিল।

ফণী কোনদিন খুশি হয়ে একটা দুটো তেলেভাজা ওদের হাতে যে গুঁজে দিত না এমন নয়। কিন্তু রোজ ফাউ দিলে বেচারার ব্যবসা চলে কি করে।

তাই এক একদিন সে এমন রেগে যেত, কড়া থেকে গরম তেলশুদ্ধ হাতাটা তুলে বাচ্চাদের ভয় দেখাত—এই, তোরা যদি এখান থেকে কেটে না পড়িস তোদের গায়ে গরম তেল ছিটিয়ে দেব তখন বুঝবি কেমন মজা!

ব্যস, আর টুস্‌কিরা সেখানে দাঁড়াত। ভয়ে বাবা-রে বলে চেঁচামেচি করে হাসতে হাসতে যে যেদিকে পারত ছুটে পালাত।

তেমনি ঘুগ্‌নিওলা যোগীনকে দেখলে।

সন্ধ্যাবাতি লাগান টব বুকে ঘুগ্‌নির বাক্‌স ঝুলিয়ে 'চাই ঘুগ্‌নি' বলে একটা অদ্ভুত মিঠে আওয়াজ তুলে যোগীন সাগর দত্ত লেনে ঢুকে পড়ত। রোজ।

ঝড় বৃষ্টি আগুন ভূমিকম্প—যাই হোক না কেন, প্রতি সন্ধ্যায় সাগর দত্ত লেনে ঘুগ্‌নিওলা যোগীনের মিঠে গলার আওয়াজ তোমার কানে লাগবেই।

চার পয়সার ঘুগ্‌নি কিনে তারপর 'আর একটু দাও' 'আর একটু দাও' করে যোগীনকেও কি কম জ্বালাতন করে খেয়েছে টুস্‌কিরা।

উঁহু, আমার বিশ্বাস হয় না!

এসবের একটা কথাও টুস্‌কি ভুলে গেছে। কদিনের কথা।

আজ সে নয়না! বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। উনিশের ভরা যৌবন নিয়ে সারা গা থমথম করছে, রাস্তা দিয়ে গেলে তার পায়ের পাতায় খুন ঝরে, চোখের চাউনিতে আকাশের রূপালি তারা ঝরে, হাসলে মুক্ত ঝরে, প্রবাল ঝরে।

কিন্তু তা বলে কি নয়নার দুরন্ত একটা কৈশোর, একটা অবুঝ কচি ছোটবেলা ছিল না। সব মেয়েরই থাকে! সব গোলাপই একদিন কুঁড়ি থাকে কলি থাকে।

হয়তো কুঁড়ি বা কলি পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তেমন করে তোমাদের চোখে পড়ে না। বা পড়তে চায় না।

যেই না সব কটি পাপড়ি মেলে একদিন সে হাসতে থাকল তোমাদের চক্ষু ছানাবড়া, অ্যাঁ, কোথা থেকে এলো এতবড় গোলাপ, কী চমৎকার গন্ধ, কী আশ্চর্য রং—মাথা খারাপ করে দেবার মতন।

তাই কথা হচ্ছিল আজ নয়নাকে দেখলে মাথা খারাপ হবার কথা।

অথচ এই নয়না টুস্‌কি বড় হয়ে তার সারাটা ছেলেবেলা সারাটা কৈশোর এই সাগর দত্ত লেনে কাটিয়েছে, হীরু ধোপার বাড়ির সামনের পড়ো মাঠে রোজ বিকেল বেলা নালার জলে পা ভিজিয়ে বর্ষার দিনে চিংড়ি পুঁটির রূপোলি ঝিলিক দেখেছে, প্রমোদ ঘোষালের বাগানে ঢুকে ডাঁসা পেয়ারা খেয়েছে তেলেভাজার ফণীকে জ্বালাতন করেছে, ঘুগনির বাক্স নিয়ে যোগীন গলিতে ঢুকতে দল বেঁধে যোগীনের পিছনে লেগেছে।

প্রায় বারো বছর বয়স পর্যন্ত টুস্‌কির এসব দুরন্তপনা ছিল।

বারো বছর ঘুরতে মেয়ে কেমন থমকে গেল। টুস্‌কির সমবয়সী বন্ধুর—বিশেষ করে আর পাঁচটা মেয়েরও ঠিক তাই হল, যেমন যমুনা, শোভা, নিভা, গোপা, কমলা। থমকে গেল না টুসকিদের ছেলে বন্ধুরা। কানু, সুখেন্দু, নিমু, বিপু, অমল—এরা। বারো তেরোয় পা দিয়ে ছেলের দল বেশ দুরন্ত চঞ্চল হলে উঠল। কেবল কি প্রমোদ ঘোষালের বাগানে ঢুকে পেয়ারা চুরি করা, কেবল কি ফাউ তেলেভাজার জন্য ফণীকে কি চার পয়সার শাল-পাতার ঠোঙ্গায় বেশি করে ঘুগ্‌নি দেবার জন্য যোগীনকে জ্বালাতন করা—আরও অনেক রকম দুষ্টুমী কুকীর্তি তাদের মাথায় সবে খেলতে আরম্ভ করেছে। তখন ঢিল ছুড়ে রাস্তার লাইটপোস্টের ডুম ভেঙ্গে দেওয়া, স্কুলের মাস্টারদের কাউকে দেখলে পিছন থেকে লুকিয়ে টিটকিরি দেওয়া, ফল নিয়ে ফেরিওয়ালা গলিতে ঢুকলে টুক্ করে তার ঝুড়ি থেকে দুটো আপেল কি এক ছড়া আঙুর সরিয়ে ফেলা জাতের দুষ্টামী নষ্টামী তো ছিলই—এক পা দু' পা করে তারা আরো বেশ খানিকটা এগোতে আরম্ভ করেছিল, যেমন লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট টান দেওয়া, মা বাবার বাক্স থেকে পয়সা চুরি করে সিনেমার লাইন দেওয়া। কেবল তাই নয়। টুস্‌কির সঙ্গে, শোভা চন্দনা নিভার সঙ্গে এত খেলাধুলো করেছে তারা, আর সেই মেয়েরাই বড় বড় হল কি ছেলেগুলি তাদের পিছনে লাগল। স্কুলে যাবার সময় বা স্কুল থেকে মেয়েরা যখন বাড়ি ফেরে তখন তাদের দেখে সিটি দেওয়া, গলা খাঁকার দেওয়া, খারাপ কথা বলা ইতিমধ্যে তারা রপ্ত করে ফেলেছে।

আর সেই তুলনায় মেয়েরা সেদিন কত শান্ত সুস্থির।

বারোতেরো বছরের টুস্‌কি শান্ত সুস্থির হয়ে গেল। কিন্তু তার গায়ের রূপ যেন তখন থেকে প্রায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

কুঁড়ির অবস্থা কাটিয়ে টুস্‌কি গোলাপ কলি হয়ে উঠেছে। একটু একটু নাচতে টাচতে পারে। গাইতেও পারে। মামা বলছে তোকে সিনেমায় নামিয়ে দেব, দিদি বলছে তোকে রবীন্দ্র ভারতীতে ভর্তি করিয়ে দেব, দাদা বলছে অন্য সব ছেড়ে দিয়ে নাচটাই ভাল করে শিখে নে, রাশিয়ান ব্যালে দলে তোকে ভিড়িয়ে দেব।

টুস্‌কি এসব কথা ভুলে গেছে?

আজ তার উনিশ বছর বয়স হল। কলি হয়ে সাগর দত্ত লেনের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে নেই, সদ্য ফোটা গোলাপ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের করিডর কমনরুম আলো করে বেড়াচ্ছে।

ক্লাসে ঢুকলে ক্লাসরুমের ভিতরটা আলো করে দিচ্ছে। সতীর্থ ছেলের দল মেয়ের দল অবাক হয়ে ভাবে এত রূপ এত লাবণ্য এত যৌবন ঈশ্বর একটা শরীরে কি করে ঢেলে দিতে পারে! এটা অবিচার, ঘোর অবিচার ঈশ্বরের। টুস্‌কিকে দেখে তাদের ঈর্ষার অন্ত নেই। তাকে দেখে কত মেয়ে মুখ কালো করে থাকে।

ভাল কথা, টুস্‌কি তদ্দিনে নয়না হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওর নাম যে এককালে টুস্‌কি ছিল, টুস্‌কি—এই কথাটাই লোকে ভুলে গেছে।

এখন শুধু নয়না, নয়না। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে কেবল ওই একটা নাম।

॥ ২ ॥

এখন টুস্‌কি মামার কথাও শুনছে না, দিদির কথাও না, দাদার কথা তো নয়ই।

গানে অরুচি, নাচে বিদ্বেষ, সিনেমা তার চোখের বিষ।

অর্থাৎ দাদা দিদি বা মামার কথায় সে চলবে না।

সে তার নিজের পথে চলবে। চলছে।

না, এই পথের খোঁজ কেউ পায়নি। কোনোদিন পাবে না। অত্যন্ত গোপনীয়। সময় সময় নয়নার মনে হয় তার নিজের কাছেও যেন পথটা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হয়ে যেতে চাইছে, জড়িয়ে যেতে চাইছে।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে পথটাকে আবার খুঁজে বের করে একটু একটু করে সে এগোতে থাকে।

কিছুটা চলার পর হেঁয়ালীর মতন হয়ে গিয়ে কোথায় যেন রাস্তাটা লুকিয়ে পড়ে। তখন যে কী কষ্ট পায় মনে নয়না।

তখন সে গোপনে কাঁদে।

টস্‌টস্‌ করে চোখের জল ফেলে। তার গোলাপী গাল—কান্নার ধমকে টুকটুকে লাল রং ধরে, চোখের দীর্ঘ পল্লব বৃষ্টিভেজা পাখির পালকের মতন ভারি হয়ে ওঠে। আর ঝড়ো হাওয়ার মতন তখন বড় বড় শ্বাস উঠতে থাকে তার বুক ঠেলে।

নয়নার এই করুণ কান্না, অসহায় বেদনার ছবি পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখেছে কি!

মনে হয় না।

তার চারদিকের পৃথিবী হাসছে। অবিরাম হাসছে। ফাঁক পেলে নয়নাও কি কম হাসে। অজস্র মণিমুক্তো প্রবাল পোখরাজ ছড়িয়ে যখন তখন সে হাসে।

এই হাসি দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, এক একদিন নিভৃতে তার ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নয়না কেঁদে কেঁদে কেমন বুক ভাসায়।

যেমন কাল রাত থেকে তার কান্না শুরু হয়েছিল। এখন বেলা দশটা। এখনও নয়না কাঁদছে।

বলতে ভুল হয়ে গেল। চার বছর আট মাস বয়সে নয়না মাকে হারায়। সেই বছরই নীরেনবাবু দু' মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে নিমতলা স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে সাগর দত্ত লেনের বাড়িতে চলে আসেন। তার এক বছর পর তিনি আবার একটা বিয়ে করেন। সেই পক্ষের কাছ থেকে নয়নারা আরও দুটি ভাইকে পেয়েছে। সৎ মা হলেও বেলারাণী মানুষটা খারাপ না। নয়নার দাদাকে দিদিকে এবং নয়নাকে তিনি খুবই স্নেহ যত্ন দিয়ে বড় করে তুলেছেন। আজও নীরেনবাবুর আগের মায়ের সন্তানদের জন্য মহিলার মায়া মমতার শেষ নেই। বেলারাণীর চেষ্টার গুণে নয়নার দিদির এত ভাল বিয়ে হয়েছে। বিলাত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার বর। তালতলায় নিজেদের বাড়ি আছে। দিদি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে। গায়ে কত সোনা। আর মুখভরা হাসি। সুমনা যে কত সুখে জীবন কাটাচ্ছে। এক নজর ওই মেয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। রোজ কী ভাল ভাল শাড়ি জামা পরে।

দেড় বছর বিয়ে হয়েছে।

কেমন মোটা হয়েছে। রংটাও খুলেছে খুব। ঘর বর পেয়ে বড় মেয়ে সুখী হয়েছে। এই জন্য বেলারাণীর মনে গর্বের শেষ নেই। এখন বেলারাণী মেজ মেয়ে নয়নার জন্য একটি মনের মত পাত্র খুঁজছেন। বেলারাণীর বাপের বাড়ি বেহালায়। মামার বাড়ি উত্তরপাড়ায়। কাকারা থাকেন নৈহাটী।

কাজেই সুমনার পাত্র খুঁজতে একদিন যেমন করতেন একবার বেহালায় একবার উত্তরপাড়ায় একবার নৈহাটী ছুটতেন—রোজ দুপুরে ভাত খেয়ে বেরোতেন, বাড়ি ফিরতেন সন্ধ্যেবেলা তেমনি নয়নার জন্য মাস দুই হল আবার পাত্র খোঁজার চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে তাঁর। মা'র কাণ্ড কারখানা দেখে নয়না মনে মনে হাসে।

বিয়ে করতে তার এখন বয়ে গেছে কিনা খুব! সবে সে কলেজে ঢুকেছে।

অবশ্য তার নতুন মা—হ্যাঁ, নীরেনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষকে সেই ছেলেবেলা থেকে নয়না এবং তার দাদা ও দিদি 'নতুন মা' বলে ডেকেছে—তাদের নতুন মা তাদের

দু'বোনকে বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করবেন জানা কথা। নয়নার দাদা ডাক্তারী পড়ছে। মাস মাস তার জন্য একটা বাড়তি খরচ লেগেই আছে। বেলারাণীর নিজের দু' ছেলেও প্রায় বড় হয়ে উঠল। স্কুলে পড়ছে। ডাক্তারী পড়ুক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ুক—ঐ দু' ছেলের জন্য সামনে প্রচুর খরচ আছে। কাজেই দু' মেয়েকে আর বসিয়ে রেখে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। মানুষের আয়ুর কিছু বিশ্বাস আছে নীরেনবাবুর বয়স বাড়ছে না কমছে ?

বেলারাণীর যুক্তি উড়িয়ে দেবার সাধ্য কি ? স্ত্রীর কথায় নীরেনবাবু সর্বদা সায় দিয়ে আসছেন। কাজেই বেলারাণী একেবারে আটঘাট বেঁধে মেজ মেয়ের পাত্র খুঁজতে লেগে গেছেন।

লাগুক, নয়না মনে মনে বলে, যখন সময় আসবে তখন রুখে দাঁড়াবার মতন সাহস ও মনের জোর তার আছে।

তার দিদির কথা আলাদা।

স্কুল ফাইন্যাল ফেল্ করে কলেজের দরজা মাড়াতে না পেরে দুপুরে বাড়িতে ঘুমোত। নয়নার তো তা নয়। এক্ষুণি শ্বশুরবাড়ি যাবে ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়।

মনের ইচ্ছে মুখ ফুটে সে প্রকাশ করছে না। হুঁ, বলতে পারত যদি তার নিজের মা বেঁচে থাকত।

বাবাকে আর বলে কি লাভ! দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নী যা বলবে তাই হবে। এই সংসারের সব কিছু বেলারাণীর ইচ্ছেয় চলে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কুটোটিও কেউ এখান থেকে ওখানে নাড়তে পারবে না।

আর দাদা তো এখনো ছেলেমানুষ। কুড়ি বছরের একটি ছেলে উনিশ বছরের একটি মেয়েকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারে না।

তাছাড়া নয়নার দাদা নিজের দিকটাই এখন বেশি দেখছে। ভালয় ভালয় আর দুটো বছরের কোর্স শেষ করে ডাক্তারীটা পাশ করাই এখন হিমেন্দুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ছোট বোনের হয়ে মার সঙ্গে সে এখন মোটেই লড়াই করতে যাবে না। বাবা রোজগার করে এনে সব টাকা মা'র হাতে দেয়। নয়নার হয়ে বেশি কথা বলতে গেলে বেলারাণী যদি বিগড়ে গিয়ে হিমেন্দুর পড়ার খরচটি বন্ধ করে দেয়।

ইচ্ছে করেই নয়না তার দাদাকে নিজের বিয়ে টিয়ের বিষয়ে কিছু বলছে না।

লড়াই করার সময় এলে নয়না একলাই লড়াই করবে। এই নিয়ে এখনই সে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না—এবং তার বিয়ের ব্যাপারে বেলারাণী যে রোজ

দুপুরে ভাত খেয়ে আদাজল খেয়ে ঘুরতে বেরোচ্ছে তা দেখে নয়না একটুও ঘাবড়াচ্ছে না, বরং মনে মনে হাসছে এবং ভিতরে ভিতরে ভদ্রমহিলাকে বেশ একটু অনুকম্পাই করছে।

॥ ৩ ॥

নয়না তার নিজের জগতে একটা আলাদা স্বপ্ন নিয়ে বিভোর।

এই যেমন এখন। বেলা দশটা বেজে গেছে। বাড়ির কে কি করছে বা না করছে কোনো খোঁজ খবর রাখে না সে।

কাল সারারাত কেঁদে বালিস ভিজিয়েছিল। সারাটি সকাল কেঁদেছে।

এখনো কাঁদছে।

তার কান্নাটা আর তার চোখের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে। চোখ শুকনো। তার ছোট পড়ার ঘরের দোরে খিল এঁটে আরশি সামনে রেখে নয়না নিজের চোখ দুটোকে বার বার খুঁটিয়ে দেখছিল। দেখছিল এই জন্য, দরকার হলে এই চোখে সে আগুন ঝরাতে পারবে কিনা।

কদিন ধরে দু' চোখ থেকে সে অনেক জল ঝরিয়েছে। কিছু লাভ হয়েছে কি?

নয়না মনে করে কান্নাকাটি করে একগুঁয়ে শোভনকে সে টলাতে পারবে না। শোভনের একগুঁয়েমি ভাঙ্গতে হলে নয়নাকে দু' চোখে আগুন ঝরাতে হবে।

এই তো শোভনের চিঠি তার টেবিলে রয়েছে। নীলচে খামের মধ্যে গোলাপী রঙের প্যাডের কাগজে সবুজ কালি দিয়ে লেখা শোভনের 'কাকের পা' 'বকের পা' হস্তাক্ষর। কাল বিকেলে ডাকে চিঠিটা এসেছিল। পুরুষের হাতের লেখা এত বিশ্রী হতে পারে ভাবা যায়!

যাই হোক, হস্তাক্ষর নিয়ে নয়না আর মাথা ঘামাচ্ছে না। সেটা আগে আগে হয়েছে।

বলে কয়ে কে কবে কার হাতের লেখা সুন্দর করাতে পেরেছে!

জন্ম থেকে যা নিয়ে আসে মানুষ। হাঁটার ভঙ্গি, হাসির ভঙ্গি, হাত নাড়া, মুখ নাড়ার ধরন যেমন কোনদিনই মানুষ বদলাতে পারে না, তেমনি সে তার হাতের লেখাও বদলাতে পারে না, যা একবার হয়ে গেছে মরার দিন পর্যন্ত তাই থেকে যায়।

কাজেই শোভনের হাতের লেখার কথা চিন্তা না করে নয়না মানুষটার মনটাকেই এখন বেশি করে ভাবছে।

বাবু রাগ করে আজ দশদিন হল বেড়াতে গেছেন, আর ফেরার নাম নেই।

কি ব্যাপার! চারদিক থেকে সবাই জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁরে নয়না, তোর শোভনের কী হল, তাকে দেখছি না যে।

কোনোদিনই যে ছেলে কলকাতার বাইরে যায় না। মধুর কলকাতা ছেড়ে একবেলার বেশি দু' বেলা যার পক্ষে অন্য জায়গায় তিষ্ঠোন অসম্ভব সেকি না আজ দশদিন এখানে অনুপস্থিত।

নয়নাও ভাবছিল, মাসিমার বাড়ি পিসির বাড়িতে ক'দিন আর থাকবে ছেলে। এই ফিরে এল বলে। জলপাইগুড়ি এমন কিছু জায়গা না যে এক-আধদিনের বেশি শোভনের মতন ছেলের সেখানে মন টিকবে।

নয়নাই তো দেখেছে কত ছেলেকে। কলকাতার বাইরে গিয়ে এক বেলাও থাকতে পারবে না। যেন তারা জলের মাছ ডাঙ্গায় গিয়ে পড়ে। একটা ছটফটানি অস্বস্তি নিয়ে রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে আসে তারা, বা পরদিন সকালে।

শোভন সেই দলের।

আবার কিছু ছেলে আছে দু'দিন একদিন পর পরই তাদের কলকাতার বাইরে ছুটে যাওয়া চাই। কোথায় ঘাটশীলা, কোথায় ঝাড়গ্রাম, নয়তো দীঘা, পুরী, নিদেন বকখালি, সন্দেশখালি ঘুরে না এলে তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। পুরো একটা সপ্তাহ পার হয় না, আবার তারা বাইরে ছুটল।

নয়নার বন্ধুদের মধ্যে এই দু' জাতের ছেলেই রয়েছে।

কাজেই শোভনের এই অন্তর্ধান নয়নাকে তো বটেই, নয়নার বন্ধুদেরও ভীষণ অবাক করে দিয়েছে। একটানা দশদিন সে কলকাতা ছাড়া, এ প্রায় শুনে আগুন লাগার মতন ব্যাপার।

কলকাতা ছাড়া মানে নয়নাকে ছেড়ে যে ওই ছেলে এতদিন থাকতে পারছে। দূরের বন্ধুদের মনের ভাব যেমন তেমন, নয়নার খুব কাছের বন্ধুরা কিন্তু এই জিনিসটাই খুব বেশি করে দেখছে। নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে তোদের মধ্যে—অবশ্য ঝুমা তাড়াতাড়ি নয়নার মুখের ওপর কথাটা বলে ফেলল। শুনে নয়না রাগ করেনি। শুধু হেসেছিল। অর্থাৎ এমন ভাবে হেসেছিল যেন ঝুমার সন্দেহটা খুবই বাজে। যেন ঝুমা নিতান্তই শিশুর মতন কথাটা বলছে।

আচ্ছা, প্রেম করা ছাড়া একটি মানুষের বুঝি পৃথিবীতে আর কোনো দায় দায়িত্ব কাজকর্ম থাকতে নেই! নয়না পরে ঝুমাকে বুঝিয়েছে, নিশ্চয় কোনো অসুবিধায় পড়েছে, অতসীদের বাড়ি বেড়াতে গেছে, ওদেরও তো কতরকম বিপদ

আপদ ঘটতে পারে—হয়তো চোখের ওপর সেসব কিছু দেখে চট করে শোভন সেখান থেকে চলে আসতে পারছে না।

—তোকে চিঠি দিয়েছে?

—হুঁ। নয়না ঘাড় কাত করেছিল।

—কি লিখেছে। বিপদ আপদের কথা কিছু লিখেছে কি? ঝুমা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল।

—না, ঠিক তা লেখেনি, তবে আমার দু' একদিন দেরি হবে চিঠিতে জানিয়েছে।

শুনে ঝুমা আর কিছু বলেনি।

কিন্তু নয়নার তখনকার মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল?

ঝুমাকে তো বানিয়ে যাহোক একটা কিছু বলে চুপ করালে—নয়না নিজেকে কী বোঝাল!

আজ সাতদিন—ঝুমার সঙ্গে যেদিন কথা হয় সেদিন নয়না নতুন করে আঙুলের কড় গুণে দেখেছিল শোভন কলকাতা ছাড়ার পর পুরো একটা সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

ঝুমাকে মিছে কথা বলেছিল, সাতদিনের ভিতর একটা চিঠিও নয়না জলপাইগুড়ি থেকে পায়নি। পৌছোন সংবাদটা পর্যন্ত দেয়নি তার প্রেমিক পুরুষটি। কেবল যাবার সময় বলে গেছে আমি জলপাইগুড়ি মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি।

চিঠি এল দশ দিনের মাথায়! কাল বিকেলে। খোলা চিঠির ওপর আজ সকালেও বার চারেক চোখ বুলিয়েছে নয়না। এখন সে নিজের চোখদুটো দেখেছে। আর ওই ছাইয়ের চিঠি পড়ার তার দরকার নেই।

এমন কাজ করে যে-লোক তোমাকে সন্দেহ করতে পারে, তাকে দিয়ে তুমি তোমার সারাটা ভবিষ্যৎ জীবনে কতটা কি আশা করতে পার!

কাল কলেজ থেকে ফিরতে ছোট ভাই হাবু নীল খামটা এনে তার হাতে দেয়। হাতের লেখা দেখেই নয়না বুঝতে পেরেছিল কার চিঠি।

খামটা দেখেই তার বুকের ভিতর ধ্বক করে ওঠে।

—কে চিঠি দিলে! নয়নার তখনও মাথাটা ছাড়েনি, চিনচিন করছিল।

নতুন মা এসে জিজ্ঞেস করছিল। টিফিনের বাটির দিকে চোখ রেখে নয়না বলেছিল, আমার এক বন্ধুর চিঠি মনে হয়।

বেলারাণী আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি যদিও। হয়তো বেলারাণী তখন মনে মনে বলেছিল, আর কটা দিন সবুর, রঙিন খামে করে করে বন্ধু-বান্ধবের চিঠি আসা বন্ধ করছি তোমার, দেখে সুবিধা মতন একটি ছেলে খুঁজে বের করতে পারলে তখন দেখা যাবে বন্ধুরা তোমায় কে কত চিঠি লেখে।

বেলারাণীর চেহারা দেখে তার মনের কথা টের পেতে নয়নার কষ্ট হয়নি। তার কষ্ট হচ্ছিল মহিন্দুর জন্য অন্য কিছু ভেবে। এই জীবনে বেলারাণী বন্ধু-বান্ধবের মুখ দেখল না, একটি বন্ধুর কাছে থেকে আসা রঙিন খামের চিঠি পেলে মনের অবস্থা কেমন হয় হীরুবাবুর মা বোধ করি তা জানেন না। একটু বয়স হতে না হতে দোজবর নীরেনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর দু'চার বছরও পার হয় না দুই ছেলে পেটে এসে গেল; মহিলা কি করে বুঝবে চিঠি পেয়ে নয়নার বুকের ভিতর একটা ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে।

অবশ্য একদিক থেকে এমন সাদামাটা জীবন মন্দ না। প্রেম করার সুখের চেয়ে প্রেম করার যন্ত্রণা যে কী ভয়ংকর হীরুবাবুর মা তা বুঝতে না পেরে বেঁচে গেছে।

কোনোরকমে টিফিন শেষ করে নয়না নিজের ঘরে ঢুকে দোরে খিল এঁটে দিয়ে আলোটা জ্বেলে দেয়, হুঁ তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, মেঘলা আকাশ ছিল বলে, দু'টার আগেই সাগর দত্ত লেনের বাড়িগুলির ওপর সন্ধ্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয়নার হাত কাঁপছিল খামটা ছিঁড়তে গিয়ে ছেঁড়া হয়ে যাবার পরেও গোলাপী প্যাডের কাগজটার ভাঁজ খুলতে সে সাহস পাচ্ছিল না।

বলতে কি, তখন পর্যন্ত, ওই যে একটু আগে বেলারাণীর প্রেম না করা আটপৌরে ভোঁতা জীবনটার কথা ভাবতে গিয়ে প্রেমের অদ্ভুত আনন্দ ও অদ্ভুত জ্বালার কথা সে চিন্তা করল, সেই জ্বালা ও আনন্দ একসঙ্গে নয়নার হৃৎপিণ্ডটাকে কামড়ে ধরে রেখেছিল। তারপর একসময় চিঠিটা মনে পড়ে শেষ করল, শেষ করে আর একবার পড়ল, তারপর আবার, তারপর আবার, তারপর ঝরা পালকের মতন নীলচে কাগজটা টুপ করে হাত থেকে খসে পড়ল—সমস্ত মনটা উদাস শূন্যতায় ভরে উঠল তার। নয়নার মনে হল চৈত্রের ধূসর রিক্ত পোড়া মাঠের মতন হয়ে গেল তার বুকের ভিতরটা। এক ফোঁটা সবুজের চিহ্ন নেই—শুধু জ্বালা। একটু পরেই অবশ্য থরে থরে মেঘ করে এল বুকের আকাশে। মাথা ধরেছে ছুতো করে রাত্রে আর ঘর থেকে বেরিয়ে খেতেই গেল না। ভাই এসে দুবার দিদিকে ডেকে ফিরে গেল। বেলারাণী নিজে একবার এসে ডেকে গেল। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না বলে নয়না তখনি বিছানা করতে লেগে যায়, অর্থাৎ

আমার শরীর যে ভাল নয়, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ছি, নতুন মাকে এটা দেখাবার জন্য নয়না তখনি বিছানাটা টেনে নিয়ে মশারী খাটিয়ে ফেলে।

হুঁ, বিছানা করল ? মশারী খাটাল তারপর ? সারারাত সে ঘুমোল না।

বলা হয়েছে আকাশ ভরে তখন নিবিড় কালো মেঘ করেছিল।

কাঁপা হাতে তখনি আবার দোরে খিল এঁটে দিল সে। আলো নিবিয়ে দিল। আর তখন থেকে আরম্ভ হল মুষলধারে বর্ষণ। কান্না কান্না। যেন এই কান্না জীবনে শেষ হবে না। কান্নার শ্রবণ অপ্রতিরোধ্য স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে নয়না বুঝতে পারছিল না। তারপর যখন ভোর হল, বুঝল, কোথাও সে ভেসে যায়নি। সাগর দত্ত লেনের স্যাঁতসেঁতে দোতলা বাড়িটায় তার ছোট পড়ার ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে সে।

এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গিয়ে বাথরুমে চোখ মুখ ধুয়ে হীরু বাবুর সঙ্গে বসে চা পাউরুটি খেয়ে এল। কেন না বাড়াবাড়ি করলে বেলারাণী ভীষণ সন্দেহ করবে। কাল বিকেলে চিঠি পাওয়ার পর থেকে মেয়ে কেমন করছে—তক্ষণি নীরেনবাবুর কাছে নালিশ চলে যাবে। বলা যায় কি, হয়তো বাবা ছুটে আসবে এ-ঘরে। পাঁচ রকম জেরা করবে। একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার !

কাজেই চা-টা খেয়ে ওদিকটা পরিষ্কার করে নয়না এখন আবার তার টেবিলে বসে আরসির সামনে চুপ করে বসে নিজের চোখ দুটো দেখছিল। না, আর জল আসবে না। এখন এই চোখে আগুন ঝরাবার পালা। এমন যার মনের ভিতর, সেই পুরুষের জন্য কোনো মেয়ের কাঁদা উচিত নয়। মনে মনে সে বলল। ছি ছি ! এত হালকা তোমার প্রেম শোভন, যদি জানতাম, তোমার সঙ্গে এতটা এগোতাম কি ? কক্‌খনো।

তবে কোনদিন সোমেনের সঙ্গে একটু কথা বলেছি, সোমেনের সঙ্গে একটু বেড়িয়েছি, দিন তারিখ সব তুমি মনে রেখেছ। এত ঈর্ষা তোমার ?

কেন, সোমেনকে আমি কী দিয়েছি ?

একটুখানি মিষ্টি হাসি ? একটুখানি ভাল ব্যবহার ? আমার ও তোমার বন্ধু হিসেবে সোমেন কি এটুকু আশা করে না ! আশ্চর্য ছেলে তুমি।

আমি আজই যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি সোমেনের বাড়ি। আজ রবিবার। সে বেরোচ্ছে না।

সব বলব তাকে।

বন্ধুর বেশে তুমি যে তার কত বড় শত্রু সোমেনকে না বললে সোমেনের

প্রতি অবিচার করা হবে। তুমি একটা মুখোস পরে আছ। সোমেনকে তা জানান দরকার।

আঁ্যা, তুমি বড়লোকের ছেলে গাড়ি চড়ে বেড়াও। সোমেন টুইশানি করে পড়ার খরচ চালায়।

তুমি টেরিলিন টেরিকোট সিল্ক সার্জ ছাড়া পর না। সোমেনের গায়ে সুতির মোটা জামা-কাপড়।

তবু সরল মন নিয়ে বেচারা আমাদের সঙ্গে মিশেছে। সে জানে তার কতটুকু অধিকার, সে বোঝে ছেলে হিসেবে নয়নার কাছে সে খড়কুটোর চেয়ে বেশি কিছু নয়। কেবল আমরা তাকে ভালবাসি বলে, তাকে বন্ধু হিসেবে নিজেদের মধ্যে টেনে আনছি বলে সে আসে। তা না হলে সে আসত না।

আমরা অর্থ কি—তোমাকে দিয়ে আমি, আমরা। তুমি বলেছিলে তোমার ছেলেবেলার বন্ধু সোমেন। শোভাবাজারের কাছে তোমরা তখন থাকতে, তোমাদের পাশের বাড়িতে সোমেনরা থাকত। একদিন সোমেনরা বাড়ি বদল করে শ্যামবাজার না কোথায় চলে গেল তোমরাও চলে গেলে বালিগঞ্জের দিকে। কলকাতা শহরে যা হয়। সাত আট বছরের মধ্যে আর দেখা নেই দু'জনের। তারপর হঠাৎ এই কলেজে এসে দেখা। ছেলেবেলার সোমেনকে তোমার মাঝে মাঝে মনে পড়ত। মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সে নানারকম পাখির ডাক ডাকতে পারত। আর তোমাকে তার মনে পড়ত, তুমি তার পাখির ডাক শুনবে বলে বাড়ি থেকে লুকিয়ে সন্দেশটা কেকটা এনে তাকে খাওয়াতে। ঐ একটা স্মৃতি সেতুবন্ধনের মতন কাজ করছিল।

কলেজে ঢুকে আবার দেখা হয়ে যাওয়াতে দু'জনের সেই বন্ধনটা আরও শক্ত হল পাকা হল।

অর্থাৎ যেটা একদিন নিতান্তই ছেলেমানুষির ব্যাপার ছিল বড় হয়ে সেটা মনুষ্যত্বের আকার নিল। মানে তুমি বড়লোকের ছেলে সে গরীবের, এই ভাবনাটাই তোমাদের দু'জনের মধ্যে উঁকি দিতে পারল না। তোমার দেখা-দেখি আমিও এই জিনিস শিখলাম। গাড়িবাড়ি নিয়ে থাকুক আর বস্তিতে থাকুক, মানুষ মানুষ মাঝখানে অন্য কিছু নেই। তাই সাদা মন নিয়ে সোমেনের সঙ্গে আমি মিশলাম। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে যেমন মেশে।

আশ্চর্য, তোমার তাতে সায় ছিল সম্মতি ছিল। কেন না তোমার হয়েই যে আমি তার সঙ্গে মিশেছি। আমি আর সোমেনকে কবে জানতাম। তোমার বন্ধু। সুতরাং আমারও বন্ধু।

দেখলাম তুমি খুশি। তোমার মুখে হাসি। কিন্তু আমি কি করে জানব তোমার এই হাসি বিষের হাসি।

কি করে জানব তোমার বুকের অন্ধকারে একটা বিষধর সাপ ক্রমশঃ ফণা তুলে ফুঁসছে।

ওটা যদি তুমি একদিন আমাকে বুঝতে দিতে, সোমেনের সাথে একটা কথা বললেও তোমার বুকে কাঁটা বিঁধছে, রক্ত ঝরছে।

ওটা, যদি তুমি সোমেনকেও এতদিন বুঝতে দিতে আমার সঙ্গে সে কথা বলছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, এই জিনিস তোমার কাছে অসহ্য. তোমার বুক পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

এখন বুঝলাম। সেই বিষাক্ত মন নিয়ে অফুরন্ত জ্বালা নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি জলপাইগুড়ির কোন এক মাসির বাড়ি বেড়াতে যাবার ছল করে এখান থেকে সরে গেলে দশদিন চুপ করে থাকার পর এত বিষ ঢেলে কাদা ছিঁটিয়ে এই তোমার মস্ত পত্র যা এখন আমার হাত দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করছে।

যাক গে, সোমেনকে জানান দরকার। সোমেন এখনও শিশুর মতন ঘুমিয়ে। মনুষ্যত্ব মানবতা ইত্যাদির বড় বড় মুখোস পরা তোমার আসল রূপটা যে কি সোমেনের সামনে তা তুলে ধরা দরকার।

এখন কটা বাজে ?

টেবিলের টানা খুলে নয়না হাতঘড়িটা দেখল। ইস্, চাবি দিতে ভুলে গেছে। কাল রাত দুটো থেকে ঘড়ি বন্ধ।

চাবি দিতে ভুলে গেছে, চুল বাঁধতে ভুলে গেছে। কাল কলেজ থেকে ফিরে চুলটুলটাও বাঁধা হয় নি। অনেক কিছু ভুল হচ্ছে এখন। হবেই তো, সব যে গোলমাল হয়ে গেল। শোভন সব গোলমাল করে দিল।

॥ ৪ ॥

না তারা পার্কে ঢুকল না। পার্কটার পিছনের রাস্তাটা নিরিবিলি। এখন দুপুর। এখন রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা।

একটা বেশ বড় নিমগাছ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। এই গাছতলাটা শোভনের খুব প্রিয়। শোভন প্রায়ই তার গাড়ি নিয়ে এখানটায় চলে আসে। নয়নাও আসে। অনেকদিন শোভন ও নয়নার এই নিভৃত মিলনের সময় সোমেনও উপস্থিত থেকেছে।

তাইতো সোমেন, যদিও তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু শোভন ও নয়নার কাছে কোনো সময়ই তা মনে হত না। যেন তাদের দু'জনের একটা ছায়া হয়ে সোমেন সর্বদা কাছে কাছে থেকেছে। যেন তার ও শোভনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই পুরুষটি মিশে গিয়েছিল। এক এক সময় নয়নার মনে হয়েছে সোমেনের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই।

অর্থাৎ নয়না যেখানে একটি যুবতী, শোভন একটি যুবক, সোমেনও কিছু ষাট বছরের বুড়ো হাবড়া নয়, শিশুও নয়—একটি যুবক।

কিন্তু তা হলে হবে কি, যুবক হিসাবে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কোনদিনই সোমেন খাটাতে চেষ্টা করত না।

তাই নয়না অবাক হচ্ছে—

শোভনের মন এত নিচু হতে পারে কি করে।

ঈর্ষার ছিঁটে-ফোঁটাও যেখানে উঁকি দেবার কথা নয়।

তুমি তোমার ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে পার? নিজের নিঃশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে পার?

যদি পার তবে সোমেনকেও অবিশ্বাস করতে পার, ঈর্ষা করতে পার।

কিন্তু সোমেন তো সেভাবে সেই মন নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশত না।

—সেভাবে তুমি আমাদের সঙ্গে মিশেছিলে কি? নয়না প্রশ্ন করল।

সোমেন হঠাৎ কিছু উত্তর করল না।

নিমগাছের ছায়ায় এসে দু'জনে দাঁড়াল। এতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে তারা কথা বলছিল।

শোভন নিমগাছের বাঁদিক ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করাত।

সোমেনও নিমগাছের বাঁদিক ঘেঁষে তার সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল।

—তুমি কবে চিঠি পেয়েছ? সোমেন এবার পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়িয়ে নয়নার মুখটা দেখল।

—কাল। আস্তে একটা ঢোক গিলে নয়না উত্তর করল। এদিক ওদিক তাকাল দু'বার সে। তারপর সোমেনের চোখে চোখ রাখল। একটু বসবে?

—বসতে পারি। সোমেনও এদিক ওদিক তাকাল। পকেট থেকে রুমাল তুলে কপাল ও ঘামটা মুছল।

নিমগাছের একটা মোটা শেকড় মাটি থেকে মাথা জাগিয়ে দু'জনের বসবার মতন সুন্দর একটা আসন করে দিয়েছে। পাশেই একটা পুকুর। ওপারে কিছু ঝোপঝাড়। পুকুরে দুটো পাতি হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে! বাতাস নেই। শান্ত

জল। হাঁস দুটোর সঙ্গে তাদের নিখুঁত ছায়া দুটোও ভেসে চলেছে। মনে হয় চারটে হাঁস।

শোভন নয়না যখন পাশাপাশি হয়ে এই শেকড়টার ওপর বসত, সোমেন তাদের পায়ের কাছে, ঘাসের ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসত।

আজ সোমেনকে পাশে নিয়ে নয়না শেকড়টার ওপর বসল।

তাদের ধারের কাছের ঘাস শূন্য পড়ে থাকল।

কাল বিকেলে চিঠিটা পড়ার পর সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

তোমার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। অনিদ্রার ছাপ। সোমেন গম্ভীর হয়ে বলল।

—ছি ছি, আমার এত লজ্জা করছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে, চিঠির সব কথাই তোমাকে এখন বললাম, কিন্তু কাল সারারাত ভাবছিলাম, এসব কথা সোমেনকে বলার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভাল।

—তুমিও যেমন মেয়ে। তুমি মরতে যাবে কোন্ দুঃখে, এখানে তোমার লজ্জারই বা কী আছে, তুমি তো আর চিঠি লেখনি, চিঠির ভাষা তোমার ভাষা নয়।

—ও, যদি আমাকে একটু আভাস দিত যে, যদি একদিন অন্তত তোমাকে সরাসরি না হোক, ঘুরিয়ে কথাটা জানিয়ে দিত—

—কি জানিয়ে দিত, কি বলত শুনি? সোমেন ভুরু কুঁচকালো।

যে নয়নার সঙ্গে একটু কথাটথা কম বলবি ভাই, এ জিনিস আমি মোটেই সহ্য করতে পারছি না।—

—তা কি আর কেউ পারে, তা কি কেউ বলে। সোমেন অল্প করে হাসল। আমি তার ছেলেবেলার বন্ধু—একটা চক্ষু লজ্জা তো ছিল।

—চক্ষু লজ্জা! নয়না ঠোঁট উল্‌টে দিল।—কী মানে আছে এই চক্ষু লজ্জার, ভেতরে ভেতরে আমি পুড়ছি জ্বলছি, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলছি না। কাপুরুষ!

—যাক, ওকে আর গালাগাল করে কী হবে নয়ন, ও তোমার কৃপার পাত্র, অনুকম্পা করা ছাড়া ওকে আর উপায় কি! যেন নয়নাকে সান্ত্বনা দিতে তার পিঠে আলগোছে একটা হাত রাখল সোমেন।

—আমার ইচ্ছে করছে, যদি এখন শোভনকে সামনে পেতাম, এমন যা তা শুনিয়ে দিতাম, এমন যা তা করে না তাকে বলতাম, যাতে করে সে কাঁদত, কেঁদে কূল পেত না ছেলে।

এতক্ষণ পিঠটা একটু কুঁজো করে রেখে হুয়ে বসেছিল নয়না, একটা চাপা রাগ

ও আক্রোশ নিয়ে উত্তেজনায় এবার সে সোজা হয়ে বসল। যে জন্য সোমেনের হাতটা নয়নার পিঠ থেকে পিছ্‌লে কোমরের কাছে গিয়ে ঠেকল।

সেই অবস্থায় হাতটা রেখে দিয়ে সোমেন আস্তে মাথা ঝাঁকাল।

—তুমি তা হলে শোভনকে চেন না, তুমি এতবড় একটা চিঠি পাবার পরেও তাকে ঠিক বুঝতে পারলে না—

—খুব বুঝেছি। জায়গাটা নির্জন বলে নয়না প্রায় চিৎকার করে উঠল, আমার চেয়ে তাকে কেউ আর ভাল বোঝেনি, স্বার্থপর, হিংসুক, ছোট মনের মানুষ, ভীরু, অপদার্থ, একটি মেয়ের চেয়েও অধম সে।

—না গো নয়ন। নয়নার কোমর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলে সোমেন।—তুমি শোভনকে চেননি।

—কেন! প্রায় রুদ্ধস্বর হয়ে নয়না ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে সোমেনের মুখটা দেখল। পায়ের জুতো খুলে রেখে সোমেন বুড়ো আঙুল দিয়ে তখন ঘাস খুঁটছে।

কেন জানি পুকুরের হাঁস দুটো এই সময় প্যাঁক প্যাঁক ডেকে উঠল। সোমেন এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে। অল্প বাতাসে নিমগাছের পাতায় মৃদু শর শর শব্দ হয়।—আমার তো মনে হয় তার আসল পরিচয় এটাই, নয়না আবার বলল, শোভন স্বার্থপর হিংসুক ভীরু—সামনা সামনি কিছু বলতে পারল না, জলপাইগুড়ি পালিয়ে গিয়ে আমার দিকে তোমার দিকে কাদা ছুঁড়ছে।

—জলপাইগুড়ি থেকে কাদা ছুঁড়ছে, সোমেন এবার নয়নার দিকে ঘাড় ফেরাল, আবার ঝপ্‌ করে দেখবে একদিন কলকাতায় ছুটে এসেছে।

—আসুক না, আসুক, এমন করে সোনাকে বলব না, কাঁদিয়ে ছাড়ব, এই এখানে এই নিমগাছটার নিচে ডেকে এনে—তুমিও উপস্থিত থাকবে, দেখবে কেমন করে আমি তাকে কথা শোনাই।

কলকাতায় এসে সে তোমার কথা শোনার অপেক্ষা করবে বলে আমার মনে হয় না, জলের দিকে চোখ ফিরিয়ে সোমেন বলল, তুমি বলছ শোভন ভীরু, মেয়েছেলের মতন, অপদার্থ—আমার কিন্তু তা মনে হয় না, অনেক বিষ তার বুকে, বাঘের মতন হিংস্র হয়ে গেছে সে।

—কী করবে, আমায় খেয়ে ফেলবে! যেহেতু আমি তার প্রেমিকা, যেহেতু আমি তোমার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলি, মাঝে মাঝে দু'জনে একটু বেড়াই—তাই বলে হিংসুটে বাঘ আমার বুক চিরে রক্ত খাবে?

এক দমে কথাগুলি বলে নয়না একটা গরম নিঃশ্বাস ফেলল।

---আমাকে স্ট্যাব করবে, তোমার সঙ্গে আর একদিনও মেলামেশা করলে শোভন আমার বুকে ছুরি বসাবে—

সোমেনের কথা শেষ হবার আগে খিল খিল হেসে উঠল।

—না গো সোম, তুমি তাকে চেন না. আমি অনেক বেশি মিশেছি এই দেড় বছর, অনেক কিছু পরিচয় পেয়েছি শোভনলালের—ভয়ার্ত, হিংসা, ঈর্ষা থাকলে হবে কি, আসলে সে পাঁচ বছরের একটি শিশুর চেয়েও দুর্বল, অসহায়, আমাকেও তার কিছু করার ক্ষমতা নেই, তোমার চুলের ডগাটি ছোঁবে সেই সাহসও তার নেই—হ্যাঁ, ঈর্ষা, হিংসা করতে খুব জানে, এখন তার এই চিঠিতে তা বুঝলাম, আর জানে অভিমান করতে—অভিমান নিয়ে বাবু আজ দশ দিনের ওপর জলপাইগুড়ি বসে আছে।

—আসবে, আজ কালই সে কলকাতায় ফিরে আসবে। পুকুরের হাঁস দুটো ডাঙ্গায় উঠেছে। একটা বুনো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুটিতে পাখা নেড়ে গায়ের জল ঝাড়ছে। সেদিকে চোখ রেখে সোমেন গম্ভীর গলায় বলল, তোমাকে যেমন চিঠি দিয়েছে—আমার কাছেও কাল বিকেলের ডাকে শোভনের চিঠি এসেছে।

—অ্যাঁ! মুহূর্তের জন্য নয়না চমকে গিয়ে মুখের হাঁ-টা কেমন গোল করে রেখে সোমেনকে দেখল। তারপর একটা ঢোক গিলল। আশ্চর্য এতক্ষণ তুমি বলছ না এ-কথা! তোমাকেও সে চিঠি দিয়েছে?

—হুঁ।

—কি লিখেছে?

—দু' একদিনের মধ্যেই সে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরছে।

—তারপর? আর কি লিখেছে?

—আমাকে থ্রেট করেছে—নয়নার সঙ্গে মেলামেশা তোকে বন্ধ করতে হবে সোমেন, যদি তুই বাঁচতে চাস্, আমি অনেক সহ্য করেছি, আর পারছি না, হয়তো কোনদিন মাথা গরম করে তোকে ছুরিটুরি মেরে বসব, জানিস তো প্রেমের ব্যাপারে ঘা খেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অলরেডি আমার অবস্থা আজ তাই দাঁড়িয়েছে, আমার মাথার ঠিক নেই।

হাঁস দুটো আবার জলে নেমে গেল। বাতাসটা জোরে বইছিল। গাছের পাতার শর শর শব্দটা হঠাৎ বেড়ে গেল। একটা ঘূর্ণির মতন কিছু কোনাদক থেকে উড়ে এসে পুকুরের জলটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। নয়নার আঁচলটা উড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর তা লুটিয়ে পড়ছিল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নয়না সেটা বুকের কাছে গুটিয়ে আনল।

—কাজেই, আমাকে সাবধান হতে হবে, তোমার সঙ্গে মেলামেশা আমাকে একেবারে বন্ধ করতে হবে। সোমেন গাঢ় গলায় বলল।

যেন নয়না তখনও ভাবছে এর উত্তরে কী বলা যায়। তার বিস্ময়ের ভাবটা কাটছে না, মুখের গর্তটা গোল করে রেখে সোমেনকে দেখছে আর তার কথা শুনছে।

কথা শেষ করে সোমেন একটু এদিকে ঘুরে বসল। নয়নার হাতটা কোলে টেনে নিল।

—বুঝলে, যতটা শিশু তাকে তুমি ভাবছ, কাপুরুষ অপদার্থ মেয়েছেলে ইত্যাদি বলে তার অভিমানটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বোঝা যায় বেশ কিছুদিনের জ্বালা নিয়ে সে ভুগছিল, এখন সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, তা না হলে তার শান্তি নেই, সে এটা পাকাপাকিভাবেই ধরে নিয়েছে। আমি তোমাদের দু'জনার প্রেমের পথের একটা বড় রকমের কণ্টক—এই কাঁটা নিশ্চিহ্ন না করা তক্……

—ওফ্, তুমি থাম থাম! যেন হাত বাড়িয়ে সোমেনের মুখটা ঢেকে ধরতে পারলে নয়না খুশি হত। ভিতরে একটা সাংঘাতিক আলোড়ন নিয়ে নয়না কাঁপছে।

অ্যাঁ, উন্মাদ না হলে এসব চিন্তা শোভনের মাথায় আসে! প্রেমের পথের কণ্টক—যেন প্রেমের কত বুঝে গেছে সে, যেন এতবড় প্রেমিক পৃথিবীতে আর জন্মায়নি, বন্ধুর বুকে ছুরি বসাবে—এই সোমেন, তুমি শোন।

বলো! সোমেন তখনও পুকুরের দিকে একভাবে তাকিয়ে।

—আমার দিকে তাকাও। নয়না তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, সোমেন ঘাড় ফেরাতে বলল. তুমি তা হলে কি করবে ঠিক করেছ, সোমেনের মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে নয়না ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তার দিকে তাকাল।

—এ কি! সোমেন দু'হাতে নয়নার মাথাটা চেপে ধরল।—তোমার চোখে জল কেন, তুমি কাঁদছ! তোমার কাঁদবার, হয়েছে কি!

—আমার কাঁদবার কিছুই হয়নি? সোমেনের হাত থেকে মাথাটা ছাড়িয়ে নিল নয়না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

—আমি শুধু শুধু কাঁদছি, তাই না সোমেন, ওফ্।

সোমেন চুপ করে থাকে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নয়না আবার ফোঁপায়। একটু পরে মুখটা তোলে। সোমেনের দিকে তাকায় না। কান্নাভরা উদাস শূন্য চোখ মেলে পুকুরের হাঁস

দেখে, আর নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে। এই শোভনকে নিয়ে আমার এত অহংকার ছিল, এত গর্ব ছিল মনে, আমি ভাবতাম সাতরাজার ধন পেয়ে গেছি। বুঝি এই ছেলের মধ্যে—অ্যাঁ, সে যে এত জঘন্য এত অধম এত নীচ—

—থাক, ওকে আর গালাগাল করে কি হবে! সোমেন বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

—আমিই বরং সরে যাচ্ছি, আমি আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোনোদিন আসব না।

—ইস্! নয়না দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। জল শুকিয়ে চোখ দুটো প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, আবার দেখতে দেখতে দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আর, যেন খুব মাথা ধরেছে, যেন অত্যধিক যন্ত্রণায় মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে খাচ্ছে, যেন যন্ত্রণা সহ্য করতে দু'বার নয়না জোর মাথাটা ঝাঁকাল।

—তুমি আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না সোমেন, তুমিও কি শেষ পর্যন্ত আমার মাথাটা খারাপ করবে!

সোমেন আবার চুপ।

নয়না তার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল। কেন, তোমার আর যাবার কি হয়েছে শুনি? তুমি অপরাধ করেছ? আমার সঙ্গে মিশছ দুটো কথা বলছ—এই? যদি এটাকে কেউ অপরাধ বলে—হাজার বার কোটিবার তুমি সেই অপরাধ করবে, তাতে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় যাবে। তারজন্য যদি কেউ মাথা খারাপ করে বিষ খায় কি দেওয়ালে কপাল ঠুকে রক্ত ঝরায় ঝরাক—তুমি আর যাবে কেন, তোমার একচুল সরে যাবার কিছু হয়নি।

ভিতরের অস্বাভাবিক আলোড়ন নিয়ে নয়না আবার থরথর করে কাঁপতে থাকে, সোমেন হাত বাড়িয়ে আগের মতন নয়নার কোমরটা জড়িয়ে রাখে।

তাই বলছি, তুমি আর আমার মাথা খারাপ করো না, তুমি আমাকে পাগল করো না সোম। একটা পশু একটা উন্মাদ সে, যা খুশি তাকে বলতে দাও যেমন খুশি চিঠি লিখুক—এই নিয়ে তুমি এক তিল ভাবতে যাবে না।

—ও আসছে, দু'একদিনের মধ্যে কলকাতা আসছে। সোমেন বিড়বিড় করে উঠল।

—আসুক, আসতে দাও। না কি তুমি ভয় পাচ্ছ! সত্যি তোমাকে এসে সে খুন করবে, তোমার বুকে ছুরি বসাবে।

যদি তাই বসায়। এবার সোমেন মুখের নিচে হাসল। বলা যায় না তা যদি সত্যি তার ব্রেনের গোলমাল হয়ে থাকে—

—তুমি চুপ কর। নয়না ধমকে উঠল। তোমাকে ছুরি মারবার আগে আমি বুক পেতে দেব। বলব, সোমেনকে খুন না করে শোভন, আমাকে শেষ করে দাও—

—হয়তো তুমি তখন আমার কাছে থাকবে না, হয়তো তোমাদের সাগর দত্ত লেনে ছুটে যাবার আগে সে আমাদের নবীন কবিরাজ লেনের বাড়িতে গিয়ে হানা দেবে—

দেওয়াচ্ছি তাকে হানা। নয়না থুতনি নাচাল। আমি এক্ষুণি গিয়ে থানায় ডাইরি করব, পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব।

—না না এক্ষুণি থানা পুলিশ করতে যেও না। আমি কি আর ওর ছুরির ভয় করছি, আমি ঠিক নিজেকে বাঁচয়ে চলতে পারব। বলছি শোভন কলকাতায় ফিরে আসুক—

দেখা যাক না তার সাহসের দৌড়টা।

—আমি তো সে কথাই বলছি, ওর কত বড় সাহস আমরা দেখব। নয়নার দু'চোখ বড় হয়ে উঠল। সুন্দর থুতনিটা আর একবার সোমেনের মুখের কাছে তুলে ধরল।—কাছেই তোমার ভয় আবার কিছুই নেই, বলছ আর আমার সঙ্গে তুমি মিশবে না কথা বলবে না—এই উদ্ভট চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল, যেমন তুমি আমার কাছে আসছ কি আমি তোমার কাছে যাচ্ছি তেমন আমরা যাওয়া আসা করব—লেট্ শোভন কাম ব্যাক—দেখি তার কতটা ক্ষমতা আমাদের বাধা দেবার।

—বাধা সে দেবেই, কেননা সে তোমার প্রেমিক, লাভার। কাদায় বুড়ো আঙুল দিয়ে সোমেন ঘাস খুঁটছিল। এবার নয়নার দিকে মুখটা তুলে ধরল।—তুমি যা বললে, আমার বুকে ছুরি বসাবার সাহস হয়তো সে পাবে না, কিন্তু তোমার আমার মেলামেশা দেখে সে জ্বলে পুড়ে মরছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—মরুক। একটা মিথ্যে সন্দেহ নিয়ে সে যদি সারাক্ষণ অশান্তি পায়, ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকে—সেখানে আমি কী করতে পারি বলো? আমি কি তাকে কোনোদিন বলেছি যে, শোভন আমি তোমায় আর ভালবাসি না, এবার থেকে আমি সোমেনের প্রেমে পড়ব—না আমার চলাফেরায় সে ধরনের কোনো আভাস সে পেয়েছে—সোমেন তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, সেই হিসেবে আমিও সোমেনকে বন্ধুর মতন দেখি—এর অতিরিক্ত কিছু নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু, অন্যরকম কিছু আবিষ্কার করে থাক তো

সেটা তোমার মনগড়া অশান্তি—তার অর্থ নিজের জ্বালা নিজে তৈরি করছ, সেই জ্বালা নেভাবার ক্ষমতা আমার নেই।

—ওঠ! সোমেন জুতোর মধ্যে পা ঢোকাল।—কোথাও গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক—চলো। নয়না উঠে দাঁড়াল। দুটো হাঁস ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে জলের মধ্যে খেলা করছিল। তারা আর সেদিকে তাকাল না।

॥ ৫ ॥

মধ্য কলকাতার একটা চায়ের দোকান। 'ইলোরা কেবিন।' দোকানের সামনে একটা বকুল গাছ। যে জন্য দোকানের সামনেটা সারাক্ষণ, বিশেষ করে দুপুরের দিনে ছায়া ছায়া থাকে।

রুক্ষ এই শহরটায় খানিকটা সবুজ গাছ পাতা দেখলে প্রথমটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে।

কাজেই 'ইলোরার' সামনে ডালপালা ছড়ান মনোরম বকুল গাছটা একটা বিজ্ঞাপনের মতন পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোকে ভাবে এই দোকানে বসে একটু চা ও খাবারটাবার খেয়ে নিলে বুঝি একটা অন্য ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যাবে।

সে জন্য দুপুরের দিকে দোকানে ভিড়টা মন্দ হয় না।

কিন্তু আজ দুপুরের চেহারাটা অন্য রকম। কি একটা ছুটির দিন বলে রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। ট্রাম-বাস ও অন্য দিনের তুলনায় ভিড় কম।

ইলোরা কেবিনের ভিতরটাও একরকম ফাঁকা বলাই চলে।

সামনেই কলেজ পাড়া। অফিস কাছারীর মতন কলেজগুলিও ছুটি।

যে জন্য ইলোরা কেবিনে আজ কলেজের ছেলেমেয়েদেরও খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না।

অন্যদিন ছেলেমেয়েরা এই সময়টায় দোকানের ভিতরটাকে গরম করে রাখে। সারাক্ষণ একটা হই-হুল্লা চিৎকার। এই চেয়ার থেকে ঐ চেয়ার, এই টেবিল থেকে সেই টেবিলে ছুটোছুটি বন্ধু-বান্ধবীদের ডাকাডাকি চলতেই থাকে। বাইরের খদ্দেররা, বিশেষ করে তাঁরা যদি বয়স্ক মানুষ হন, ছেলেমেয়েদের কাণ্ড-কারখানা দেখে কেমন যেন হিমসিম খেয়ে যান। কোনোরকমে চা-টা কি খাবারটা শেষ করে উঠে পড়তে পারলে বাঁচেন।

আজ অবশ্য ছুটির দিন বলে বিশেষ করে বেলা এখন দুটো আড়াইটে বাজে, বয়স্ক খদ্দের একটিও নেই বললে চলে।

তারা আজ বাড়িতে বসে আরাম করে গিন্নীর হাতের কি ছেলের বৌয়ের হাতের কি মেয়ের হাতের তৈরি চা খাবেন।

খটখটে রোদের দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে এসে ঢুকবেন কোন্ দুঃখে।

তবে যুবক-যুবতীদের কথা আলাদা। ছুটি থাক বা না থাক রাস্তায় বেরিয়ে টই-টই করা তাদের চিরকালের স্বভাব।

বাড়ির চায়ের চেয়ে দোকানের চা তাদের কাছে বেশি লোভনীয়। যে জন্য ইলোরা কেবিনে এমন দু'চার জোড়া যুবক-যুবতীকে আজ এই ছুটির দিনেও দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ তারা বসল না।

চা খেয়ে একটু গল্পটল্প করে আবার বেরিয়ে গেল।

স্বাভাবিক। ছুটির দিন একটা দোকানে বসে সারাক্ষণ 'গেঁজানো'-র কোনো অর্থ হয় না। সিনেমা থিয়েটারের ম্যাটিনী শো আছে, খেলার মাঠ আছে, চিড়িয়াখানা আছে বোটানিক্স আছে, লঞ্চে চড়ে গঙ্গায় বেড়ান এবং আরো কত রকম আমোদ ফূর্তি আছে।

হুঁ, এক সময় দেখা গেল সত্যি ইলোরার ভিতরটা একদম ফাঁকা। টেবিলে টেবিলে কেবল মাছি উড়ছে। কেবল কোণার দিকের একটা চেয়ারে একটি যুবক চুপ করে বসে আছে। চা খাওয়া হয়ে গেছে। বয় এসে শূন্য কাপটা এই মাত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। বোঝা গেল অনেকক্ষণ বসে আছে ছেলেটি। ফরসা রঙ। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা। দামী কাপড়ের টাউজার্স শার্ট। চকচকে জুতো। যেন কদিন হয় জুতোটা কেনা হয়েছে। যারা ভাল পোষাক পরে থাকে তাদের জুতো জামা প্যান্ট সব সময়ই আনকোরা নতুন মনে হয়। আসলেও কি তাই না! পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেরা জামা জুতো পুরানো হতে দেবে কেন। পুরোনো হতে না হতে তারা দোকানে গিয়ে নতুন ডিজাইনের নতুন ফ্যাসানের জিনিস কিনে আনে।

এটা একটা রেসের মতন।

বড়লোকের ছেলেরা—মেয়েরাও, কে কার আগে লেটেস্ট ফ্যাশান গায়ে চড়াবে পায়ে গলাবে। জামা কাপড় থেকে আরম্ভ করে গায়ের গয়না। কি যদি গাড়ি থাকে। আগেরটা বেচে দিয়ে লেটেস্ট মডেলটা কেনা চাই। তা না হলে মান ইজ্জৎ থাকে না।

বকুল গাছের ছায়ায় রাস্তার পাশ ঘেঁসে একটা কালো রঙের অষ্টিন গাড়ি দাঁড় করানো।

গাড়ির ভিতর যে ছেলেটি চুপচাপ বসে আছে গাড়িটা তার।

প্রিয়দর্শন, বড়লোক, গাড়ি আছে, মুখখানা বিষণ্ণ—এখন আপনারা নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান করতে পারছেন এই ছেলেটি কে। এর নাম শোভন।

হাল্কা নীল সার্ট খয়েরী প্যাণ্ট বাদামী জুতো চকচকে কালো চুল এবং ঈষৎ রঙের ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন চোখের মণি।

মুখখানা বিষণ্ণ হওয়াতে সৌন্দর্যটা বেড়ে গেছে। যেন এমন বেদনাছোঁয়া চেহারা ওকে মানায় ভাল।

যেন খুব একটা উচ্ছল খুশির ভাব মোটেই ওই চেহারার সঙ্গে খাপ খাবে না, বরং ছেলেটিকে তখন হালকা চটুল ফাজিল ফাজিল দেখাবে।

এখন তাকে আদর করতে মমতা করতে ইচ্ছে করছে। যেচে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আপনার লোভ হবে।

পৃথিবীতে তিন রকমের চেহারা আছে। একটা চেহারা আপনাকে দারুণ আকর্ষণ করবে। প্রথম দর্শনেই আপনি তাকে আত্মীয়ের মতন বন্ধুর মতন কাছে টেনে নিতে চাইবেন।

আর একটা চেহারা এক নজরেই আপনাকে বিষিয়ে তুলবে। আপনি মুখটা ঘুরিয়ে রাখবেন। নিরপরাধ নির্দোষ, আপনার কোন রকম অনিষ্ট করেনি জেনেও মানুষটার কাছ থেকে আপনি সাত হাত দূরে থাকতে চেষ্টা করবেন খামকা।

আর আছে মাঝখানে এক ধরনের চেহারা। ইচ্ছে হল আপনি আলাপ পরিচয় করলেন, অনেকটা যেন সময় কাটান, যেমন ট্রেনের কামরায় আপনার পাশের সীটে বসে আছে লোকটি, চুপ থাকতে ভাল লাগছে না তাই তার সঙ্গে আপনি একটু কথা-টথা, বলবেন, গন্তব্যস্থল আসতে লোকটি ট্রেন থেকে নেমে গেল, আপনিও, সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা ভুলে গেলেন। আপনার আর মনেই রইল না তাকে আর। যেন কচু পাতা থেকে জলের ফোঁটা নিঃশব্দে ঝরে পড়ল।

আর যদি ইনি পয়লা নম্বরের চেহারার মানুষ হতেন? শেষ দেখার সময় আপনার দু'চোখ ছলছল করে উঠত, আপনি তার নাম ঠিকানা আপনার নোট বইয়ে টুকে রাখতেন। আপনার ঠিকানা তাকে দিতেন। মানুষটা গাড়ি থেকে নেমে যাবার পরেও জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেখে যতক্ষণ তাকে দেখা যায় আপনি তাকিয়ে থাকতেন, তারপর যখন আর মানুষটাকে দেখা যেত না একটা গভীর নিঃশ্বাস আপনার বুক ঠেলে উঠে আসত।

এখন শোভনের মুখখানা সেই রকম।

ভীষণ মায়া ধরান।

বেশ কিছুক্ষণ এখানে একা একা চুপচাপ বসে থাকার পর দেখা গেল এবার সে পকেট থেকে উইলস্-এর প্যাকেট ও রূপার পাতে মোড়া একটা সুদৃশ্য লাইটার বের করছে।

সিগারেট ধরাবার আগে চোখ তুলে সে ওপরের দিকে তাকাল। পাখাটা বন্‌বন্ করে ঘুরছে। এত জোরালো হাওয়ায় সিগারেট ধরান যাবে কিনা চিন্তা করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠল সে। কেননা সেই মুহূর্তে সে টের পেল একটা হলদে—হলদে ঠিক নয়, একটা আশ্চর্য বাসন্তী ছটা তার সামনেটা যেন উজ্জ্বল করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে পথের দিক থেকে তার চোখ জোড়া নেমে এল।

তার চোখের পলক পড়ল না।

বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

বাসন্তী রংয়ের বেশভূষা, হালের যা ফ্যাসান, বর্মীদের মতন লুঙি কামিজ পরা এলো খোঁপা, চোখে হালকা করে কাজল বুলোনো, দরকার ছিল না যদিও, শোভন দেখল, ভোমরার কালো চিকচিকে পাখার মতন চোখের পল্লব, একদৃষ্টে মেয়েটি তাকে তাকিয়ে দেখছে।

এই অবস্থায় ছেলেরা কি করে।

বিশেষ করে এমন নিরিবিলি যদি একটি তাদের কারো সামনে এসে দাঁড়ায় খুঁটিয়ে তাকে দেখে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে? চোখে মুখে সৌজন্য ফুটে ওঠে তার? খুশি হয়ে সুন্দর করে যুবক হাসে? আপনি কি এই চেয়ারটায় বসবেন, বসুন না ইত্যাদি বলে তৎক্ষণাৎ তাকে আপ্যায়িত করতে অস্থির হয়ে ওঠে না।

কিন্তু শোভন সেসব কিছুই করল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না। হাসল না। আদর করে মেয়েটিকে বসতে বলল না। বরং যেন ভিতরে একটা যন্ত্রণা নিয়ে, বড় রকমের একটা ব্যথা নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হাতে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার!

তার ফলে কী দাঁড়াল!

যুবতী যেন চতুর্গুণ আবিষ্ট হল। বলেছি মায়া ধরান চেহারা শোভনের।

যেন মুহূর্তের মধ্যে বর্মি পোষাক পরা শাঁখের রঙের ফুটফুটে সুন্দর শরীরটা আর একটু এগিয়ে এসে মেয়েটি টপ করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। বসতে পারি কি—বসে পড়ে তারপর কথাটা বলল।

হু হুঁ বলুন! শোভন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

বয় এসে সামনে দাঁড়াল।

শোভন চুপ।

মেয়েটি তার দিকে একটু ঝুঁকল। আস্তে গলাটা বাড়িয়ে বলল, আপনি একটু চা খাবেন?

খেতে পারি। প্রতি মুহূর্তে শোভনের চা খাওয়া অভ্যেস। তা-ও তো বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল খেয়েছে। আপত্তি রইল না।

চাঁপার কলির মতন দুটো আঙুল শূন্যে যুবতী বয়কে চায়ের কথা বলল। অর্থাৎ দুটো চা নিয়ে এসো।

কিছু খাবেন না। সে চলে যাবার পর কিন্তু যুবতী কথাটা বলল।

নাঃ। শুকনো, মুখে শোভন মাথা নাড়ল। তারপর একটু সময়ের নীরবতা। এই সময় সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটারটা শোভন পকেটে পুরল।

মাথার ওপর পাখাটার হিসহিস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না।

চা এসে গেল।

আপনি প্রেসিডেন্সির ছেলে!

হুঁ, শোভন মাথা নাড়ল।

আমিও, মেয়েটি বলল।

শোভন চুপ।

আমার ফার্স্ট ইয়ার। আপনার থার্ড ইয়ার তাই না।

এবার শোভন একটু চমকে উঠল।

আমাকে আপনি দেখেছেন। নিশ্চয়ই। যুবতী ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। যুবতীর কচি সাদা দাঁতগুলি শোভন দেখল। তার মনে হল মেয়েটার মুখের ভিতরটা খুব পরিচ্ছন্ন। যেন অনায়াসে ওই মুখের গর্তে তুমি তোমার জিভটা ঢুকিয়ে দিতে পার, তোমার একটুও ঘেন্না করবে না। মন খারাপ লাগবে না।

সব মেয়ের মুখের ভিতর এমন পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে না, সব মেয়ের দাঁত এমন আয়নার মতন স্বচ্ছ না। এক দৃষ্টে আপেলের টুকরোর মতন যুবতীর সরু ছিমছাম ছোট্ট থুতনিটা দেখতে লাগল শোভন।

আমি আপনাকে রোজ দেখি। চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে যুবতী হাসল। আপনাকে আর নয়নাকে।

শোভন কথা বলল না।

চোয়াল দুটো শক্ত করে আঙুল দিয়ে চায়ের কাপটা খুঁটতে লাগল।

কদিন আপনাকে কলেজে দেখিনি ?

কলকাতার বাইরে ছিলাম। শোভন আর এক চুমুক চা পান করল। যেন তেতো লাগছে।

নয়নাকে আপনি চেনেন ? জিজ্ঞেস করল সে।

নিশ্চয়ই। মেয়েটি ঘাড় বেঁকাল। বা—রে নয়নাকে চিনব না, কলেজের সেরা সুন্দরী।

শোভন আবার চুপ।

ইলোরায় অনেকদিন আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে বসে চা খেতে দেখেছি। চায়ের কাপটা শেষ করে মেয়েটি বলল।

আশ্চর্য! শোভন অস্ফুটে বলল, এখানেও আপনাকে আমি আর দেখিনি।

কি করে দেখবেন। এবার যুবতী গম্ভীর হয়ে গেল। কোমর থেকে একটা ছোট্ট বেগনি রঙের রুমাল তুলে ঠোঁট মুছল। তারপর ঠোঁট থেকে রুমালটা সরিয়ে বলল, কেবল একটি মুখের ওপর সাধারণত আপনার দু'চোখ ঘুরে বেড়ায়—অন্য মুখের দিকে তাকাবার সময় কোথায়।

শোভন লজ্জা পেল। চুপ থেকে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করল।

আমি এখন উঠব। হাতের ছোট ব্যাগটা খুলতে খুলতে যুবতী চোখের ইশারা করে বয়কে ডাকল।

না না, আমি দাম দিচ্ছি। যেন ট্রাউজার্সের পকেট থেকে পয়সা বের করার জন্য শোভন স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক আছে আর একদিন দেবেন। বয় কাছে আসতে যুবতী তাড়াতাড়ি তার হাতে দামটা দিয়ে দিল।

আপনি কোন্‌দিকে যাবেন। শোভন আর চেয়ারে বসল না যুবতীর চোখের দিকে তাকাল।

সপ্ল্যানেড। যুবতী আস্তে বলল, আমিও, চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাক। দোকান থেকে বেরিয়ে শোভন তার গাড়ির দরজা খুলে দিল। যুবতী ভিতরে ঢুকল। তারপর শোভন ঢুকল। কালো গাড়িটা ইলোরার সামনে থেকে সরে গেল।

ইলোরার যেটা হলঘর, মানে শোভন যেখানে মেয়েটির সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেল, তার দু'পাশে পর্দা খাটান সারি সারি কটা খুপরি আছে, যদি আপনারা ইলোরায় ঢোকেন দেখতে পাবেন। এপাশে তিনটে খুপরি, ওপাশেও তিনটে। পর্দাগুলি সুন্দর। অনেকটা শান্তিনিকেতনী ঢঙের।

বলেছি এক সময় শোভন ছাড়া মাঝের হল কামরাটায় আর কোন খদ্দের ছিল না। তারপর বর্মী পোষাক পরা পাখির মতন হালকা শরীরের মেয়েটি ঢোকে।

কিন্তু আপনাদের বলা হয়নি, দোকানে তখন আরও খদ্দের ছিল। ওপাশের একটা খুপরির ভিতর চুপচাপ বসে দুটি মানুষ চা খাচ্ছিল। বাইরে থেকে তাদের দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু খুপরির ভিতর থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে মাঝের হল কামরার খুঁটিনাটি সব দৃশ্য তারা সব দেখতে পাচ্ছিল।

প্রায়ান্ধকার খুপরির আড়ালে চুপ করে বসে থাকা মানুষ দুটি কে আপনারা অনুমান করতে পারছেন কি ? সোমেন ও নয়না।

সোমেন ও নয়না প্রথমটা বুঝতে পারেনি বাইরের টেবিলে বসে কে চা খাচ্ছে।

হয়তো চা-টা ঠাণ্ডা ছিল, যে জন্য শোভন বয়কে জোরে ধমক লাগায়। তখনও লুঙ্গি পরা মেয়েটি দোকানে ঢোকেনি।

একটা পরিচিত গলার স্বর। চায়ের দোকানের ছেলেটাকে রীতিমত গালিগালাজ করছে। টের পেয়ে সোমেন ও নয়নার ভীষণ কৌতূহল হয়। তৎক্ষণাৎ দু'জন পর্দার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখে নেয়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা পাথরের মতন শক্ত হয়ে যায়।

—শোভন! ফিসফিসিয়ে উঠল নয়না। সোমেন ঘাড় নাড়ল।

—একটু আগে তোমায় বললাম। দু'একদিনের মধ্যেই সে কলকাতায় ফিরে আসছে।

—মনে হয় সকালের ট্রেনে এসেছে। রুদ্ধশ্বাস হয়ে নয়না বলল।

—তাই হবে।

—মুখটা কেমন গোমরা করে রেখেছে দেখেছ!

—স্বাভাবিক। সোমেনের হাসতে ইচ্ছে করছিল। হাসল না। ফিসফিসিয়ে বলল, তার সর্বস্ব আমি লুঠ করে নিচ্ছি এই জ্বালা নিয়ে মরে যাচ্ছে যে বন্ধুটি।

—কিন্তু কলকাতায় পা দিয়ে সকলের আগে তোমার বাড়ি ছুটে যাওয়া তার উচিত ছিল। তাই নয় কি ?

—হুঁ, লেখা চিঠিতে লিখেছে। একটু থেমে থেকে সোমেন হাসবার ভঙ্গি করে ঠোঁট টিপে বলল, হয়তো ছুরিটুরি এখনো জোগাড় করতে পারেনি।

এ কথায় নয়নাও হাসতে পারত। হাসল না। ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু আমাদের বাড়িও তো গেল না। যদি সকালের ট্রেনে ফিরে থাকে—চিঠিতে যেমন শাসিয়েছে, ট্রেন থেকে নেমে সোজা আমার কাছে তার ছুটে যাবার কথা—

সর্বস্ব সোমেনকে বিলিয়ে দিচ্ছি আমি—এ ক'দিনে আরো কতটা বিলোলাম জানতে দেখতে সাংঘাতিক কৌতূহল হবার কথা যে ছেলের। তাই নয় কি।

—একশ বার। সোমেন মাথা ঝাঁকাল। তবে আমার মনে হচ্ছে কি এখনো সে মাথা ঠিক করতে পারছে না, আগে কার কাছে যাবে।

—তাই বুঝি একলা চায়ের দোকানে বসে মুখ কালো করে ভাবছে? এবার নয়না ঠোঁট টিপে হাসল।

—বা এমনও হতে পারে, আমরা দু'জন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর সে আমাদের খুঁজতে গেছে। নিজের গাড়ি আছে, খুশি মতন ছুটোছুটি করতে তার অসুবিধে কি।

সোমেনের কথা শুনে নয়না মাথা নাড়ল।

—তাই হবে হয়তো, দু'জনের কাউকে বাড়িতে না পেয়ে শেষটায় ইলোরায় এসে ঢুকেছে।

—আমারও তাই মনে হয়। সোমেন বিড়বিড় করে বলল, ভেবেছে আমরা হয়তো এখানে এসেছি।

এবার নয়না ভয় পেল। ঠোঁটে আঙুল ছুইয়ে বলল, চুপ, আর কথা বলে কাজ নেই, টের পেয়ে যেতে পারে।

সেই মুহূর্তে বর্মী পোষাক পরা মেয়েটি দোকানে ঢোকে।

এমন কত মেয়েই তো ইলোরায় আসে। সোমেন ও নয়না প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু নয়না দেখল মিষ্টি মিষ্টি হেসে ছুঁড়ি ঠিক শোভনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর টুক করে তার টেবিল ঘেঁষে উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল। নয়নার চক্ষু চড়ক গাছে উঠল। তারপর এতক্ষণ পর্যন্ত সোমেন ও নয়না ফিসফাস কোনোরকম শব্দ করেনি, প্রায় দম বন্ধ করে পর্দার ফাঁকে দু'জোড়া চোখ একভাবে ধরে রেখে ওদিকটার সব কিছু দেখল তখন—তারপর এইমাত্র শোভনের সঙ্গে মেয়েটা বেরিয়ে যেতে দু'জন হুড়মুড় করে পর্দার বাইরে এসে দাঁড়াল।

—হুঁ, যা ভেবেছি শোভনের গাড়িতে ঢুকল মেয়েটা। নয়না উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—হুঁ, ছুঁড়ি ক্ষমতা রাখে। দশ মিনিটের আলাপে আমাদের বন্ধুটিকে কেমন বগলদাবা করে ফেলল। সোমেনও যে উত্তেজিত হল না তা নয়।

—এই বয়, শিগগির বিল নিয়ে এসো। বয় বিল হাতে নিয়ে তৈরি ছিল।

সোমেন বলল, আমি দাম দিচ্ছি।

নয়না হাতের ব্যাগটা আর খুলল না।

দু'জন এক রকম ছুটতে ছুটতে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

—এই ট্যাক্সি! নয়না হাত তুলল। ট্যাক্সিটা দাঁড়াল।

—মনে হচ্ছে যেন একটা ডিটেকটিভ গল্প, আমরা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছি।

হুঁ, তাই তো, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখতে হবে না! সোমেনের হাত ধরে নয়না ট্যাক্সিতে চাপল। এসপ্ল্যানেড। ট্যাক্সিওয়ালার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল সে।

শোভনের কালো গাড়িটি তখনও দেখা যাচ্ছিল। ট্রাফিক জ্যাম্ বলে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

॥ ৬ ॥

এখানে রোদ্দুর। ওখানে ছায়া। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ডালপালা ছাড়িয়ে। গাছের ছায়ায় বসল দু'জন। পায়ের নিচে টলটলে জল নিয়ে পুকুর। আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নির্জন একটা আধটা চিল। উঁচু পাড় বলে দু'জনের মধ্যে তারা নিজেদের ছায়া দেখতে পেল।

—নয়নাকে ছাড়া আপনাকে একলা দেখব এ যেন আমি ভাবতেই পারছি না।

এখনো আমাকে আপনি কেন—তুমি বলো। শোভন ওর হাঁটুর ওপর হাত রাখল। কেয়া। কেয়া ঝলক দিয়ে হাসল। মেয়েটার নাম—ভয় করে। শোভনের চোখে চোখ রেখে কেয়া বলল, নয়না যদি রাগ করে।

শোভন একটা হাই তুলল। বিড়বিড় করে বলল, নয়না আসছে কোথায়।

—সত্যি, ফুল ছাড়া ভোমরা থাকে না। কেয়া আবার হাসল, নয়না নেই দেখে ঝুপ্ করে আমি কেমন তোমার সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

আমিও মনে মনে তোমার মতন একটি মেয়েকে খুঁজছিলাম। ফুল ছাড়া ভোমরা থাকে না। তেমনি ভোমরা ছাড়া ফুল।

—তোমার সঙ্গে কি নয়নার ঝগড়া হয়েছে! মান-অভিমান?

শোভন হঠাৎ কিছু বলল না। এখানেও দুটো ধবধবে সাদা হাঁস জলে ছায়া ফেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হয় চারটে হাঁস একসঙ্গে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের টুকটুকে হলদে পা দেখা যাচ্ছে।

এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শোভন অস্ফুট গলায় বলল, কী সুন্দর।

—কিন্তু পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ নয়, তোমার চেয়ে ভাল কেউ নেই। জলের দিকে না তাকিয়ে কেয়া অপলক চোখে শোভনকে দেখছিল।

সিঁড়ি ভেঙ্গে তুমি যখন তোমার ক্লাসে ঢুকতে কি করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে কি কমনরুমে বসে নয়নার সঙ্গে বা তোমার অন্য বন্ধুদের নিয়ে গল্পটল্প করতে আমি বার বার শুধু তোমাকে দেখতাম।

আমি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতাম, তুমি আমাকে দেখতে না। এই মুখ এই চোখ এই শরীর দেখে আমার যেন আশ মিটত না।

জলের বুক থেকে চোখ দুটো তুলে এনে শোভন কেয়ার নরম মুখের ওপর রাখল। তারপর একটা বিষাদের হাসি হাসল।

—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, যদি বুঝতে পারতাম তোমার মতন আশ্চর্য সুন্দর একটি মেয়ে আমাকে ভেতরে ভেতরে এমন গভীর ভাবে চাইছে, আমাকে ভালবাসছে—তাহলে নয়নার জন্য আমি কিছুতেই মন খারাপ করতাম না, মন খারাপ করে এতদিন কলকাতার বাইরে থাকতাম না।

—অথচ নয়নার সঙ্গেই তোমার চলাফেরা ওঠা বসা গল্প করা সিনেমায় যাওয়া, হোটেলে রেস্টুরেণ্টে যাওয়া, ছুটির দিন মনের আনন্দে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান ছিল, আমি কতদিন দেখেছি, দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

—হুঁ একদিন ছিল—নয়নার সঙ্গে অনেক থেকেছি, অনেক মিশেছি। উদাস গলায় শোভন বলল, কিন্তু সেইসব দিন বাসি হয়ে গেছে, পুরানো হয়ে গেছে। ভোমরা হয়ে নয়না অন্য ফুলে উড়ে গেছে। ওর কথা এখন থাক। এখন তুমি ছাড়া আমার কাছে কেউ নেই।

—কী দেখছ!

—কী দেখছ!

—শোভনের কোলে মাথা রাখল মেয়েটা।

—এত সকাল সকাল! যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নয়নার। সোমেনের মাথাটা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তক্ষুণি সে ওদিকে উঁকি দিল।

—হুঁ, তাই তো! এক পলক দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সোমেনের দিকে ঘাড় ফেরাল নয়না। যেন তার শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল।—ইস্, এমন একটা ছবি আমি চোখে দেখব, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে সোমেন।

—এখনি মরে গেলে চলবে কি করে। সোমেন চাপা গলায় হাসল।—এই তো সবে ওদের প্রেমের সকাল, প্রেমের দুপুর হবে, সন্ধ্যে হবে, তারপর রাত

আসবে, রাতের পর প্রেমের নিশুতি রাত আছে। শেষ পর্যন্ত কতটা গড়ায় দেখে নেবে না।

—তুমি ঠাট্টা করছ।

—না গো নয়ন। আমি দেখছি প্রেমিক শোভন তার প্রেমের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস। জলপাইগুড়ি থেকে উল্কার মতন ছুটে এসেছে আমাকে খুন করবে বলে, তোমাকে এক চোট দেখে নেবে বলে। আসতে না আসতে সোনার ছেলের মতিগতি পালটে গেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটা খুকিকে নিয়ে কেমন গদগদ হয়ে পুকুর ধারে বসে পড়েছে।

—ওই ছ্যাখ! মেয়েটার চুলে বিলি কাটছে শোভন।

—হুঁ, নয়নার কাঁধের ওপর দিয়ে সোমেন উঁকি দিয়ে ওদিকটা দেখল। শোভনের থুতনিতে বেহায়া মেয়েটা হাত রেখেছে।

—আমায় আর একটু দেখতে দাও। সোমেনের বগলের তলা দিয়ে ঘাড়টা বাড়িয়ে নয়না রুদ্ধশ্বাস হয়ে পুকুর পাড়ের দৃশ্যটা দেখতে লাগল।

একটা পুরোনো বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে থেকে তারা প্রথম থেকে শোভন আর নতুন মেয়েটার কাণ্ড দেখছিল।

মাঝখানে সোমেন ও নয়না ফেরিওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খেয়েছে, আইসক্রীম খেয়েছে। তারা ভেবেছিল একটু গল্পটল্প করে মেয়েটা চলে যাবে। সবে পরিচয় হয়েছে—কতক্ষণ আর শোভন ওর সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু দেখতে দেখতে ব্যাপারটা যে এতখানি গড়াবে নয়না বা সোমেন ভাবতে পারেনি।

—আমার মনে হয় মেয়েটাকে আমি কালকে দেখেছি।

—আমিও যেন দেখেছি। সোমেন বলল।

—অবশ্য আমাদের প্রেসিডেন্সিতে একটা মেয়ে না, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে মুঠো মুঠো মেয়ে ছড়িয়ে আছে। কোনোদিন শোভনকে কোনো মেয়ের সঙ্গে একটা কথা বলতেও দেখিনি।

—তাই তো, তোমার সঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গেই বা তার পরিচয় ছিল! সোমেন মাথা ঝাঁকাল। খুবই অবাক লাগছে তার আজকের এই ব্যাপারটা দেখে।

—আমার মনে হয় আমার ওপর প্রতিশোধ তুলতেই সে এটা করছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। নয়নার কোমরের কাছে হাতটা রাখল।

—ঐ দ্যাখো, কী করছে স্কাউণ্ডেলটা। সোমেন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—ওফ্, আমি আর এই জিনিস দেখতে পারছি না, আমার এখান থেকে শিগ্‌গির নিয়ে চলো সোমেন, চলো আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বসি।

—হ্যাঁ, এমন দিনদুপুরে গড়ের মাঠের পুকুর পাড়ে বসে, কাছে পিঠে কেউ নেই ঠিকই, কিন্তু দূরে দূরে যথেষ্ট মানুষ। চলাফেরা করছে, ঐ তো একটা ফেরিওয়ালা ওদিক দিয়ে যাচ্ছে আর ঘাড়টা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ওদের দেখছে এত পরিষ্কার জায়গায় কোনো মেয়েকে এভাবে জড়িয়ে ধরে কেউ কিস করে! এখুনি পুলিশ দেখতে পেলে দুটোকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।

তুমি কি পুলিশের মতন কাউকে দেখছ সোমেন। নয়না সাপের মতন কাঁপছিল। ছুটে গিয়ে এখনি পুলিশকে খবর দাও, দুটোকে ধরে নিয়ে যাক, পাব্লিক নইসেন্স—অ্যাঁ, এতবড় বুকের পাটা শোভনের। একদিন, একবেলার পরিচয়ে এতখানি?

আক্রোশে রাগে নয়না থর থর করে কাঁপছিল।

—তুমি একটু শান্ত হও, একটু ঠাণ্ডা হও। নয়নার কোমর থেকে হাতটা তুলে সোমেন ওর কাঁধ ধরে আস্তে চাপ দিল। ওর মাথাটা নিজের গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল।—এতটা অস্থির হবার কিছু হয়নি নয়ন। একটু স্থির হও।

—ওফ্, আমি কী করে স্থির থাকব বলো, আমার চোখের সামনে শোভন আর একটা মেয়েকে চুমো খাচ্ছে!

খাক না, হাজারটা চুমো খাক, তাতে তোমার আমার কী এসে গেল! সোমেন দাঁতে দাঁত ঘষল। একটু থেমে থেকে তখনি আবার বলল, এইমাত্র যা বললাম তোমাকে ইডিয়েটটা ভেবেছে এভাবে তোমার ওপর প্রতিশোধ তুলবে। কেন না আমার বুকে ছুরি বসাবার সাহস তার কোনদিনই হবে না, দূরে থেকে চিঠিতে অনেক কিছু বলতে পারে সে সামনে এসে সে ভাবে কাজ করা আর এক জিনিস, সেই মুরোদ তার নেই—আর এটাও যে সে বোঝে, আমার ব্যাপারে সরাসরি মুখের ওপর তোমাকে কিছু বলার সাহসও তার কোনদিনই হবে না, চিঠিতে তোমাকে এই নিয়ে যতই চোখ রাঙ্গাক, যতই লাফালাফি করুক।

তুমি চুপ করো, সোমেন, তোমার এসব কথায় আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে না, তোমায় ছুরি মারার চেয়েও এই জিনিস ভয়ংকর, সামনে এসে আমায় গালাগাল করা কি চোখ রাঙ্গানোর চেয়ে এই জিনিস অনেক অনেক বেশি—হা ঈশ্বর—এ আমি কেমন করে সহ্য করব, ঐ ছাখো—ছাখো মেয়েটাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকে হাত রেখে শোভন পাগলের মতন আদর করছে—ইস্ ইস্‥‥

নয়ন, নয়ন! তুমি খামকা মাথা গরম করছ। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তুমি আমার দিকে তাকাও। আমার কথা শোনো—

—আমার কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না। নয়না ডুকরে কেঁদে উঠল।

সোমেন তার মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরল।

আশ্চর্য। নয়নার কানের কাছে মুখ নিয়ে সোমেন মিষ্টি করে তাকে বোঝায় তুমি ভেঙ্গে পড়বে আমি ভাবতে পারছি না, শোভন এসব করুক, তাতে তোমার কি বয়ে গেল, আমিও তোমায় এমন করে বুকে হাত রেখে আদর করতে পারি, ঘাসের ওপর শুয়ে পড়—দেখবে আমি কত আদর সোহাগ করতে জানি—

চোখ মুছে নয়না বলল, কিন্তু এই গাছের আড়ালে তোমার আমার আদর সোহাগ শোভন চোখে দেখবে না, সে যদি চোখে না দেখল তো এই আদরের অর্থ কি—প্রতিশোধ নেয়া হল কোথায়।

সোমেন এবার থমকে গেল।

ইস্। নয়না আবার পুকুরের দিকে ঘাড় ফেরাল।—ভাখো এবার মেয়েটা শোভনের বুকে হাত রেখেছে।

—রাখুক না। সোমেন ঠোঁট বেঁকাল। শোভনের বুকে এক গাছি চুল নেই, মেয়েদের মতন ওর বুকটা নির্লোম পালিশ—আমার বুকে কত চুল, গালিচার মতন ঠাসা, পুরুষের এমনই হওয়া উচিত।

যেন বুক দেখাতে সোমেন পট পট সার্টের বোতাম খুলতে লেগে গেল।

নয়না উদাসীন। তার চোখ এদিকে সেই। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে কাত হয়ে শোভনকে দেখছে, মেয়েটাকে দেখছে। দেখতে দেখতে ও এক একবার শিউরে উঠছে—যদি আমার হাতে একটা ছুরি থাকত, এখুনি ছুটে গিয়ে দুটোকে শেষ করে দিতাম।

—আছে, সোমেন ফিসফিসিয়ে উঠল। কোমরে গুঁজে আমি একটা এনেছি…

—অ্যাঁ। নয়না আঁতকে উঠল।—তুমি ছুরি এনেছ।

সোমেন মোটেই লজ্জা পেল না নয়নার ফ্যাকাশে মুখের দিকে চোখ রেখে গুজগুজ করে হাসল।—বলা যায় না তো, রাস্তায় ঘাটে দেখা হলে শোভন যদি সত্যি তেমন কিছু করতে চায়, ছোরাটোরা নিয়ে আক্রমণ করে—অসময়ের জন্য আমায় তৈরি থাকতে হবে, কাল তার চিঠি পেয়ে কলেজ স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে এটা কিনলাম, ভাখো কেমন চকচক করছে, কেমন ধারালো। কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বের করল সোমেন।

নয়না ফ্যালফ্যাল করে সোমেনের হাতের ধারালো অস্ত্রটা দেখল।

—নাও এটা হাতে নাও, নয়নার দিকে ছুরিটা বাড়িয়ে দিল সোমেন।—যদি সাহস পাও এখনি ছুটে গিয়ে, তোমায় দেখবে না, মেয়েটাকে নিয়ে জলের

দিকে এখন মুখ করে বসে আছে শোভন, তার পিঠে এটা বসিয়ে দাও। সোমেনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, চোখ দুটো জলজল করে উঠল।

—না, না, আমি পারব না। নয়না জোর মাথা ঝাঁকাল।—আমার বুক কাঁপছে। মনে বললাম বটে, কিন্তু কাজটা করা কঠিন। বরং—নয়না থেমে গেল।

—হুঁ, বলো। সোমেন গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলল।

—তুমি পুরুষ। নয়না একটা ঢোক গিলল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আমি মেয়ে পুরুষকেই এসব ছোয়া মারামারি মানায় ভাল, পেছন থেকে চুপিচুপি গিয়ে তুমি শোভনের পিঠে—

নয়নার কথা শেষ হবার আগে সোমেন দাঁত দিয়ে জিভ কাটল।—ছিঃ, আমি তা করতে পারিনা, আমার ছেলেবেলার বন্ধু সে, মুখে আঙুল ঢুকিয়ে আমি শালিক বুলবুলি টিয়ে ময়না হরিয়ালের ডাক ডাকতাম, আর সেসব শুনবে বলে পেট ভরে শোভন আমাকে কেক সন্দেশ আমসত্ব খাওয়াত।

হুঁ, তা খাইয়েছে, আমার কাছেও শোভন সেসব গল্প খুব করেছে, কিন্তু এখন তো আর খাওয়াচ্ছে না, এখন ছেলেবেলার বন্ধুটি আমাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে বিচ্ছিরি শত্রুতা করছে।

সেটা চিঠিতে, সামনাসামনি মুখে কিছু বলছে না সে। সোমেন অল্প হাসল। কাজেই হুট্ করে পেছন থেকে গিয়ে হতভাগাকে ছুরি মারতে আমার খারাপ লাগছে। তবে ও যদি তাড়া করে আমি চুপ করে থাকব না, যে জন্য কাল কলেজ স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে—

—তা হলে এখন কি হবে! সোমেনের হাতের চকচকে ছুরিটা আর একবার দেখল নয়না।

—তুমি যাও, তুমি এটা হাতে নিয়ে ছুটে যাও, তোমার চোখের সামনে আর একটা মেয়েকে নিয়ে রাস্কেলটা স্ফূর্তি করবে—এ তোমার পক্ষে অসহ্য এই মাত্র যে জন্য তুমি কাঁদছিলে, খুব স্বাভাবিক, কাজেই আমি মনে করি—

চুপ করে থাকল নয়না। চোখ তুলে গাছের পাতা, পাতার ফাঁকে আকাশের সাদা সাদা মেঘ দেখল। যেন ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল সে। দোমনায় পড়ে গেল।

—নাও, ধর এটা। এখনি কেউ দেখে ফেলবে, শাড়ির তলায় লুকিয়ে ফেল। তারপর ছুটে চলে যাও। ওই ত্যাখো, দু'জনে এখন জলের দিকে চেয়ে কত মনোযোগ দিয়ে হাঁসের কেলি দেখছে।

না, সোমেন, আমি পারব না। শোভনকে আমি পাগলের মতন ভালবেসে-

ছিলাম, আমার প্রেমিক সে, তাকে ছুরি মারব। আর তার শরীর থেকে ঝলক দিয়ে রক্ত বেরোবে—এ দৃশ্য আমি মরে গেলেও দেখতে পারব না!

—কী, মুস্কিল! সোমেনের গলায় আক্ষেপের স্বর ফুটল। বড় করে একটা ঢোক গিলল সে। তবে এক কাজ কর, ওই মেয়েটাকে শেষ করে দাও। ওটাই তো তোমাকে এখন বেশি অশান্তি দিচ্ছে।

তাই ভালো! নয়নার মুখে এতক্ষণ পর একটু হাসি ফুটল। কোথা থেকে ওই পেত্নীটা এসে জুটে শোভনকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে—বরং তার চেয়ে শোভন জলপাইগুড়ি ছিল ঢের ভাল ছিল।

আঁচলের তলায় ছুরি নিয়ে নয়না কেমন ময়ূরীর মতন নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল।

নাও, আর দেরি করো না, ছুটে যাও। নয়নার হাতে সোমেন ছুরিটা তুলে দিল। নয়না সেটা আঁচলের নিচে লুকোল।

খুব ভাল বুদ্ধি দিয়েছো, ওই ভিন-পাড়া শালিকের চেহারার শুকনো শাকচুন্নি-টাকে ছুরির এক ঘায়ে আমি শেষ করে দিতে পারব। সেই কখন থেকে শোভনের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে—তারপর আমাতে তোমাতে ও শোভনের মধ্যে যা হোক একটা বোঝাপড়া হবে—আগে ওই কাঁটাকে সরাই। সোমেন আর সবুর করল না। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

আঁচলের তলায় ছুরি নিয়ে নয়না কেমন ময়ূরীর মতন নাচতে নাচতে রৌদ্র ভরা সবুজ মাঠ পার হয়ে টলটলে সেই পুকুরের দিকে এগোতে লাগল।

॥ ৭ ॥

কেয়া খিল খিল করে হাসল। হাসির ধমকে তার ভুরু কাঁপছে, চুল কাঁপছে। ফুলের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট, বৃষ্টি ধোয়া গাছপালার মতন পরিচ্ছন্ন হালকা ঝকঝকে অনবদ্য শরীর। শোভনের মুঠোর মধ্যে ছোট্ট হাতটা আর একটু সামনে রেখে দেয় কেয়া।

এখন আমি উঠব।

আবার কবে আসবে। শোভন বলল।

—যখন ডাকবে, যেদিন ডাকবে।

শোভন চুপ করে রইল। হাঁস দুটো জল থেকে উঠে একটা ঝোপের নিচে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে।

এত ভাল কাটল সময়টা। শোভনের মুঠো থেকে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে

নিয়ে কেয়া বলল। তারপর দু'হাতে মাথার চুল, ঠিক করতে থুতনিটা আকাশের দিকে তুলে দিল।

আমার মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ আমি এই পৃথিবীতে ছিলাম না, শোভনের মনে হল ঠিক শাঁকের রং না, আর এক পোছ সাদা, অবিকল কেয়াফুলের রং এই মেয়ের, এই জন্যই বুঝি কেয়া নাম। আমার মনে হচ্ছিল অন্য কোনো গ্রহে ছিলাম তোমায় নিয়ে।

শোভনের কথা শেষ হতে কেয়া তার চোখের দিকে তাকাল।

মাঝে মাঝে আমি আসব, তোমাকে অন্য গ্রহে তুলে নিয়ে যাব। সুন্দর করে হাসল কেয়া।

আমি দুঃখী, আমি ভীষণ দুঃখী, শোভন বলল যে জন্য সময় সময় এই পৃথিবীটাকে একেবারে ভুলে থাকতে চাই। অন্য গ্রহে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

তোমার দুঃখের চেহারা আমাকে পাগল করেছে, দেখলে না তখন চায়ের দোকানে, তোমাকে একলা মুখ ভার করে বসে থাকতে দেখে আমি ঝুপ করে তোমার সামনে বসে পড়লাম, আমি তখনই বুঝতে পারলাম নয়না তোমাকে কাঁদাচ্ছে। তোমার কান্না ভোলাতে অস্থির হয়ে উঠলাম।

—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, নয়নাকে আমি একেবারে ভুলে থাকতে চাইছি। শোভন আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিন্তু নয়না তোমাকে ভুলতে পারবে না, কোনো মেয়ে তোমাকে ভুলতে পারে না শোভন, তুমি এমন পুরুষ।

শোভন চুপ করে রইল।

—চলি, কেয়া উঠে দাঁড়াল।

আবার এসো। শোভন ঘাড় তুলে পুতুলের মতন ছোট্ট শরীরটা দেখল। আবার কখন আসবে। কাতর চোখে সে কেয়ার মুখটা দেখল।

—যখন ডাকবে, যেদিন ডাকবে। হাতের ছোট ব্যাগটা হাওয়ায় দোলাতে থাকে কেয়া। ফোন নাম্বার বাড়ির ঠিকানা, সব তোমাকে বলেছি। চলি—

—শোনো।

—কেয়া ঘুরে দাঁড়ায়।

—তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। ঠোঁট ভেঙ্গে শোভনের যেন আর একবার কাঁদতে ইচ্ছে করল।

—বলেছি তোমায়, লক্ষ্মীটি। শোভনের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল কেয়া, সান্ত্বনা—আজ আমার দিদির মেয়ের জন্মদিন, একটা কিছু কিনে উপহার

দেব বলে সেই দুপুরে বেরিয়েছিলাম, তা না হলে ছাই এখন আমি বাড়ি ফিরি? এখনি যা হোক কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে।

শোভন আর কিছু বলল না।

হাওয়ায় হাতের লাল ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে বাসন্তী রংয়ের লুঙ্গি কামিজ পরা ছোট শরীরটা নিয়ে ফুটফুটে মেয়েটা ঘাসের ওপর দিয়ে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে শোভন জলের দিকে চোখ ফেরাল। ডাঙ্গার ঝোপ ছেড়ে হাঁস দুটো আবার পুকুরে নেমে এসেছে। প্যাঁক প্যাঁক ডাকছে।

—কি হল!

শোভন চমকে উঠল। পিছন থেকে কেউ কথা বলছে। স্বরটা পরিচিত ঠেকল না!

যেন তার হৃৎপিণ্ডে একটা ধাক্কা লাগল।

ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফেরাল সে। নয়না মেঘডম্বুর শাড়ি পরেছে এই ভর দুপুরে ধুপছায়া রঙের ব্লাউজ। হাসছে। বেণীতে একটা স্বর্ণচাঁপার কলি।

—কি হল, প্রেমিকাটি চলে গেল কেন! হেসে ভুরু কুঁচকে নয়না প্রশ্ন করল।

শোভন চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। ঘাড় নিচু করে নখ দিয়ে ঘাস খোঁটে।

—আমার দিকে তাকাও। নয়না চেঁচিয়ে উঠল। আর হাসছিল না সে।

বড় বড় চোখ দুটো তুলে যেন একটি অপরাধী শিশু নয়নার মুখের দিকে তাকাল শোভন।

—কদিন ধরে মেলোমেশা হচ্ছে এই খুকিটার সঙ্গে? নয়না প্রশ্ন করল।

—আজ, এই তো খানিকক্ষণ আগে, একটা চায়ের দোকানে দেখা হল।

—কোথাকার চায়ের দোকান!

—কলেজ স্ট্রীটের ইলোরা কেবিনে।

—তা চায়ের দোকানে দেখা হল, সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, তারপর দু'জনে গড়ের মাঠে চলে এলে! এক দু তিন গুন্‌তে না গুন্‌তে দুটিতে প্রেমে পড়ে গেল! ভারি মজা তো!

—আমার মন খুব খারাপ, নয়ন।

—হ্যাঁ, সে তো জানি, সোমেনের সঙ্গে আমি কথা বলি, ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা করি। অনেক দিন থেকে বাবুর মন খারাপ।

শোভন চুপ।

—সেই রাগে, সেই ঈর্ষায় জলপাইগুড়ি মাসির বাড়ি বেড়াতে চলে গেলে, তাই না!

নয়না দাঁতে দাঁত ঘষল।

শোভন আবার ঘাড় গুঁজে ঘাস খোঁটে।

—আমার দিকে তাকাও। নয়না আবার চীৎকার করে উঠল। শোভন চোখ তুললো।

—জলপাইগুড়ি থেকে কবে ফেরা হয়েছে?

—কাল রাত্তিরে।

—চিঠিতে ওসব কী ছাইভস্ম লিখেছিলে শুনি? ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল নয়না।

—সামনাসামনি কিছু বলার সাহস হয় না তোমার? আমাকে বা সোমেনকে?

শোভন চুপ।

—সেই রাগ সেই তেজ নিয়ে বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা হচ্ছে তাই না? নয়না দাঁত খিঁচোল।

—আমাদের কলেজের মেয়ে। শোভন বিড়বিড় করে উঠল।

—তাতে কি হল? আমাদের কলেজের মেয়ে বলে মহাভারত শুদ্ধ হয়ে গেল? নয়নার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোলো।

—আমার অপরাধ হয়েছে, একটু থেমে থেকে শোভন বলল। আর কোনোদিন ওর সঙ্গে কথা বলব না। যেন নয়নার চোখের আগুন শোভনকে ভয় পাইয়ে দিল।

—তোমার কি একটা অপরাধ? দু'চোখে আগুন নিয়ে জ্বালা নিয়ে নয়না উচ্চকিতে হাসল। হাসিটা সুন্দর। স্বরটা বিকৃত।

শোভন আরও ভয় পেল।

আবার ঘাড় গুঁজে ঘাস খোঁটে সে।

—আমার দিকে তাকাও। নয়না আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরে চিৎকার করে উঠল।

শোভন চোখ তুলে তাকাল। নয়না ঝুঁকে দাঁড়াল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সোমেন সব দেখছে। দাঁত ছড়িয়ে সেও হাসছিল। হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

এর মধ্যেই লুঙ্গি পরা মেয়েটা পালিয়ে গেছে।

এখন নয়না কী করবে ?

তর্ক করছে শোভনের সঙ্গে, শোভনকে ধমকাচ্ছে। মেঘডম্বুর শাড়িতে কী সাংঘাতিক সুন্দরই না লাগছে তাকে। যেন থরে থরে ফুল ফুটে আছে তার শরীরে যেন যৌবনের সব কটা ফুল বুকে কোমরে ঘাড়ে গলায় চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে রাজেশ্বরীর মতন নয়না শোভনের সামনে দাঁড়িয়ে। যদি একটা ক্যামেরা থাকত।

সোমেনের বুক কাঁপছে। নয়নার হাতে ছুরি আঁচলের তলায় লুকানো। এখনো শোভন জানে না, এখনো সে দেখতে পারেনি।

রাগের মাথায় নয়ন কী করে বসে কে জানে। নিজের মনে সোমেন বিড় বিড় করে উঠল। শোভন আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

তুমি আর যাই কর ওই ভুলটি করো না কিন্তু নয়ন, গাছের আড়াল থেকে চিৎকার করে সোমেনের বলতে ইচ্ছে করল, শোভন ক্ষিপ্ত, অবুঝ, দূর থেকে চিঠি লিখে তোমাকে গালমন্দ করে, আমাকে খুন করবে বলে ভয় দেখায়—

কিন্তু সামনে এসে গেলে ওই ছোঁড়া কত অসহায় কত ভীরু এখন একবারে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছাখো।

—তোমাকে আজ ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে নয়ন। নয়নার পায়ের কাছে ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে শোভন। যেন স্তুতি করছে মেয়ের। সোমেন মনে মনে হাসল।

—থাক, আর আমার রূপের গুণগানে কাজ নেই, তোমার নাকের পাটা কাঁপছে।

—নয়না, একবার ভুল করেছি, সেই ভুলের কি ক্ষমা নেই। শোভনের চোখ ছলছল করছে।

—না, একবার নয় একটা ভুল নয়, কয়েকটা ভুল করেছ তুমি। নয়না আরও বেশি জ্বলে উঠছে। সোমেনের মনে হল একটা নাটক দেখছে সে। নাটক বৈকি।

দুপুর—ঠিক দুপুর নয়, আর একটু গড়িয়েছে বেলা, দুটো বেজে গেছে, একটু পরে পশ্চিমে সূর্য ঢলবে, তুলোর মতন সাদা সাদা মেঘে সোনালী, খয়েরী হলুদের অফুরন্ত ছিটে লাগবে—অর্থাৎ রঙে রঙে ভরে উঠবে এই আকাশ। দৃশ্যপট তখন আরও হৃদয়গ্রাহী হবে।

স্থান গড়ের মাঠ।

ওদিকে একটা গীর্জা। গীর্জার পরিবেশ কত শান্ত।

এখানে একটা বটগাছ। মৃদু মন্দ বাতাসে পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে। বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সোমেন। গীর্জার ঠিক পিছনটায় টলটলে জল নিয়ে নির্জন পুকুর পাড়ের সবুজ নিবিড় ঘাসের ওপর অনিন্দ্যসুন্দর কাঠামো ও অফুরন্ত . লাবণ্য নিয়ে ভেনাসের মূর্তির মতন নয়না দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে শোভন।

শোভন আকুলি বিকুলি করছে।

আশ্চর্য শোভনের ছলছল চোখ দেখে নয়নার মায়া হচ্ছে না। নয়না এত কঠিন।

এবারকার মতন ক্ষমা কর, এবারকার মতন শোভনকে অব্যাহতি দাও নয়ন! গাছের আড়াল থেকে সোমেনের ডেকে বলতে ইচ্ছে হল। ছেলে-মানুষ। জলপাইগুড়ির মাসির বাড়িতে বসে ওর এসব চিঠিপত্র লেখা ছেলে-মানুষী বৈকি। বোকা ছেলে। মাথা মোটা ছেলে।

সোমেনের চোখের পলক পড়ছিল না।

এবার কি সে ছুটে যাবে।

নয়না ক্রমশ আরও বেশি উগ্র মূর্তি ধরছে না!

—আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করব না। তুমি এত নীচ, এত জঘন্য! নয়না সাপের মতন ফুঁসছে। যেন সাপের ফণা হয়ে তার নিটোল সুন্দর গ্রীবা দুলছে।

আশ্চর্য, নয়নার শরীরে যে এত রাগ সোমেন জানত না। নিশ্চয় শোভনও জানে না।

এবার শোভন ফ্যালফ্যাল করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁস দুটো নিঃশব্দে খেলা করছে।

—কেবল আমাকেই যদি চিঠি লিখে ক্ষান্ত থাকতে, তুমি সোমেনকেও চিঠি দিয়েছিলে। দাওনি?

—সোমেন তোমাকে বলেছে! শোভন ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

—নিশ্চয়। নয়না আর একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। সোমেনের বুক দুরদুর করছে। নয়নের হাতের ছুরিটা তাকে ভাবিয়ে তুলছে। এখনো অবশ্য সেটা আঁচলের তলায় লুকোনো। এখনো শোভন বুঝতে পারছে না। নয়নের কাছে কী সাংঘাতিক জিনিস রয়েছে। আ, কি ভুল করেছি আমি! সোমেন বিড়বিড় করে উঠল। এই অবস্থায় নয়নার হাতে ছুরি দেওয়া ঠিক হয়নি।

বর্মী পোষাক পরা ছুঁড়ি তো পালিয়েই গেল, মাঝখান থেকে।—
ইস্, কী কেলেঙ্কারী না ঘটতে চলেছে কে জানে।

নয়ন, তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো! ও অবুঝ, ও শিশু, ওর চিঠির কোনো দাম নেই, ওর শাসানি ভয় দেখানো কচুপাতার জল, এই জিনিস তুমিও গ্রাহ্য কর না, আমিও গ্রাহ্য করি না, দেখছ তোমার ধমক খেয়ে কেমন শুকিয়ে উঠেছে ছোঁড়া, ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেছে, চোখের পাতায় টলটল করছে জল, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে তুমি ওকে ক্ষমা করতে পার—ফিরে এসো, তুমি চলে এসো……

ভাবতে ভাবতে সোমেন বিমূঢ়স্তব্ধ হয়ে গেল। একী! নয়না কাঁদছে। ইস্ নয়নার চোখে জল। নয়ন তোমার কাঁদার কী হয়েছে!

আগুন-রাঙা দপদপে কালো চোখ দুটো থেকে শ্রাবণ ধারার মতন ঢল নেমেছে।

সোমেনের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল।

না কেঁদেই বা করবে কি। রাগে দুঃখে নয়না কাঁদছে। একটা ধিক্কার এসেছে মনে।

এই স্কাউণ্ডেল! গলা ফাটিয়ে সোমেন যদি বলতে পারত। মিথ্যে সন্দেহ করে আজেবাজে চিঠি লিখে একটি মেয়েকে কেমন ভোগাচ্ছিস, দ্যাখ। তোর মরে যাওয়া উচিত, শোভন এই মুহূর্তে তোর মৃত্যু দেখতে পেলে আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হতাম। হুঁ, আমি তোর বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পৃথিবীতে তোকে সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করছি। একটা মরা ব্যাঙকে মানুষ এত ঘেন্না করে না।

—কি হল, তুমি চুপ করে কেন? সোমেনকে তুমি চিঠি দাওনি। কাঁদতে কাঁদতে নয়না শুধায়।

—দিয়েছি, একটি চিঠি দিয়েছি। ঘাড় নিচু করে শোভন স্বীকার করে।

—আর ঐ একটা চিঠিতেই তুমি তাকে খুন করবে, তার বুকে ছুরি বসাবে এসব লিখেছিলে, তাই না?

শোভন নীরব। আঙুলের নখ খোঁটে।

—তুমি এত জঘন্য, এত পশু! নয়না আবার কাঁদে।

শোভন চোখ তুলে তার কান্না দেখে। তার চোখ থেকেও টপ টপ জল ঝরছে। বড় মজার দৃশ্য!

সোমেনের চোখের পলক পড়ছে না।

—বলছি আমার এই ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি শোভন হাতজোড় করল, আমায় ক্ষমা করো, এবারের মতন ক্ষমা করো নয়না।

—ওফ্, এত অধঃপতন তোমার, যদি জানতাম, আমি কখনো তোমার মতো পুরুষকে ভালবাসি তারচেয়ে একটা বাঁদরকে আদর ভালবাসা দিলে আমি বেশি লাভবান হতাম। ভাঙ্গাচোরা চেহারা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নয়না ঘাসের উপর বসে পড়ল।

আমি আর কোনদিন সোমেনকে এমন চিঠি দেব না, তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি নয়ন! আর কোনদিন—

—এই! তুমি আমার গা ছোঁবে না, আমার গায়ে হাত দেবে না। তোমার হাত নোংরা। নয়না শিউরে উঠল। তার জলভরা চোখে আবার আগুনের ফুলকি।

কেঁচোর মতন শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলল শোভন।

—তোমার এই শাসানির ফলে সোমেনকে এভাবে ভয় দেখানোর ফলে কী হয়েছে জান? কেমন যেন হিসহিস করে নয়না কথাটা বলল।

—কি হয়েছে! কাগজের মতন আবার সাদা হয়ে গেছে শোভনের মুখ।

—তোমায় সে খুন করবে। সাপের ফণা হয়ে নয়নার গ্রীবা আগের মতন দুলে উঠল।

—সে আমার বন্ধু, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কাতর গলায় শোভন বলল।

হলই বা বন্ধু, নয়না আকাশের দিকে তাকাল। তোমার হিংসে তার বুকে হিংসে জাগিয়েছে এখন। রাতদিন সে ছুরি নিয়ে ঘুরছে।

শোভন চুপ। ভাবছে।

নয়না চুপ থাকল না, বলল, হিংসের বীজ থেকে হিংসে তৈরি হয়। যেমন ধান থেকে ধান হয়, গম থেকে গম, তুমি কি জাননা।

—জলের দিকে চোখ রেখে ভাবছিল শোভন, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন করে যেন হাসল। নয়নার দিকে তাকাল।

ও তা হলে এই খবরই তুমি দিতে এসেছ, সোমেন আমায় খুন করবে! তাই না?

—হ্যাঁ। নয়না বড় করে ঘাড় বেঁকাল।

—সোমেন আমায় খুন করলে তুমি সবচেয়ে বেশি সুখী হও, তাই না নয়ন!

—হ্যাঁ। বলতে গিয়ে নয়নার ঠোঁট দুটো আবার কাঁপতে লাগল। থুতনিটা ভেঙ্গে দুমড়ে একাকার হয়ে গেল। দুটো চোখে আবার জলের বন্যা ছুটল।

—ছুরি নিয়ে ঘুরছিল সোমেন, তোমার বুকে এটা বসাতে সে দেরি করছিল, ভীষণ দেরি করছিল তাই অধৈর্য হয়ে তার হাত থেকে এটা ছিনিয়ে নিয়ে আমি ছুটে এসেছি।

আঁচলের তলা থেকে নয়না ছুরিটা বের করল।

চক্‌চকে ধার দেখে শোভনের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। যেন ভয় পেয়ে একটু পিছনের দিকে আর টেনে রইল সে। কিন্তু তখনি আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

—খুব ভাল করেছ নয়ন, খুব ভাল হয়েছে। মেঘডম্বুর শাড়িতে তোমাকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে যেন তোমার শরীরের সবকটা ফুল আজ ফুটে উঠেছে। এত সুন্দর তোমাকে আমি কোনদিন দেখিনি। এমন দিনে তুমি তোমার হাতে আমার বুকে ওটা বসিয়ে দাও, আমি সুখী হব, আমি সুন্দর করে মরতে পারব, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে—এই নাও, বুকের এখানটায় আমার হৃৎপিণ্ডের ঠিক ধার ঘেঁষে—

—কেন, তোমার বুকে এটা বসাব কেন, তোমার বুক ছুঁয়ে আমি হাত নোংরা করব কেন, তারচেয়ে অনেক বেশি সুন্দর জায়গা, অনেক বেশি পবিত্র বুক আছে এটা বেরুনোর এটা সেঁধোবার···

—এই এই করছ কি তুমি! আর্তনাদ করে উঠে শোভন ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু তার আগেই রক্তের ফোয়ারা ফুটিয়ে নয়না ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

হাঁস দুটো এদিকে তাকিয়ে আছে। সাদা সাদা মেঘ নিয়ে আকাশটা থমকে আছে।

গাছের আড়ালে সোমেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল।

রূপকথার রাজা

ভীষণ সুন্দর একটা খোঁপা তৈরি করে ফেলল রূপা। এত সুন্দর হবে জিনিসটা সে ভাবতেই পারেনি। কি করে যেন হয়ে গেল।

অথচ চুল বাঁধার ব্যাপারে, বিশেষ করে খোঁপাটোপা তৈরি করতে তার যা আলসেমী, আর তেমন করে ছাই এসব পারেও না, যেমন তেমন মাথার পিছনে একটা গিট দিয়ে হস্-টেল্ বেণী ঝুলিয়ে রাখতে পারলেই সে সন্তুষ্ট। তাতে যে তাকে খারাপ দেখায় তা নয়। মুখটা তো অসম্ভব সুন্দর।

কাঁধ গলায় আকৃতিও বেশ ধারাল, একটু লম্বাটে গড়ন, ছিপছিপে শরীরটা ঘিরে কেমন যেন একটা তেজালো লাবণ্য সব সময় বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তাই যেমন করেই সে চুল বাঁধুক, শরীরের কি মুখের প্রখর দীপ্তির সঙ্গে তা মানিয়ে যায়। অর্থাৎ তার চুল বাঁধাটা যেন তার নিজস্ব ভঙ্গি।

তেমনি শাড়ি পরা। বা যেমন করে সে চোখে কাজল বুলোয়। অন্য কেউ তার মতন করলে যেন খারাপ দেখাত। আবার অন্য কারো মতন করে রূপা চুল বাঁধলে শাড়ি পারলে,—যা নাকি নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার—কাজল পরা, কুম্‌কুমের টিপ পরা বা মাথায় ফুলটুল গোঁজা—রূপাকে বুঝি একেবারে মানাবে না। রূপার সাজ রূপার নিজের।

সুন্দর খোঁপা তৈরি করে উল্টো দিকের আয়নার মধ্যে দেখতে দেখতে রূপা আজ গুনগুন করে গান আরম্ভ করে দিল।

তার মনটা আজ অসম্ভব ভাল। বাইরের দিকে দেখতে গেলে কিন্তু মনটা ঝিমিয়ে পড়ার কথা। ক'দিন ধরে একটানা বাদলা। কী বিশ্রী ঘোলাটে চেহারা আকাশের। কোনদিন রোদ উঠবে কিম্বা কোনদিন রোদ উঠেছিল কেউ যেন ভাবতেই পারে না।

তবু আজ আকাশের রূপ দেখে রূপার কেমন খুশি খুশি ভাব।

একটা উত্তেজনার মধ্যে কাটাচ্ছে সেই সকাল থেকে। আসলে এই উত্তেজনা, উৎসাহটা কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে।

মীনাক্ষী ফোন করেছিল।

তখন রাত দশটা।

সুব্রতর সঙ্গে মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল রূপা। বাড়ি ফিরে কাপড় ছাড়ছিল, ঠিক তখনই ফোনটা আসে।

মা ধরেছিল। তারপর রূপাকে ডেকে দেয়। গলার আওয়াজটা প্রথম টের পায়নি রূপা। ভেবেছিল, চামেলী, নয়তো স্নিগ্ধা।

বলা কওয়া নেই মীনাক্ষী হঠাৎ তাকে ফোনে ডাকবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

এই তো ক'দিন আগে মীনাক্ষীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সুব্রত ছিল রূপার সঙ্গে। দু'জনে নিউ মার্কেট গিয়েছিল রূপার বড়দির ছেলের জন্মদিনের একটা উপহার কিনতে।

মীনাক্ষীও এসেছিল কী যেন কেনাকাটা করতে। একটা চায়ের দোকানে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছিল ওরা।

শেষ পর্যন্ত সুব্রতর সঙ্গে যে রূপা ঝুলে পড়েছে মীনাক্ষী বুঝি ভাবতেই পারছিল না। দু'জনকে একত্র দেখে প্রথম থেকে এমন টিপে টিপে হাসছিল ও, ভিতরে ভিতরে রূপা তাতে একটু বিরক্তিই হয়েছিল। মুখে অবশ্য প্রকাশ

করেনি। এমন কি খারাপ ছেলে সুব্রত! রূপা যেন সেদিনই প্রথম কথাটা গভীর ভাবে চিন্তা করেছিল। এর আগে সুব্রতকে নিয়ে সে অত শত ভাবেনি মীনাক্ষীর ঠোঁট টেপা হাসি দেখে তার মনে হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে ও যেন কেমন নাক সিটকোচ্ছে। অর্থাৎ রূপার পছন্দ ঠিক হয়নি, ছেলে বাছাই ঠিক হয়নি—

বেশ তো, মনে মনে রূপা যেন তখন কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, এই ভাল —আমার এই ভাল।

সুব্রত গরীব বলে তো মীনাক্ষী এমন করে হাসছে, তাকাচ্ছে?

হোক, টাকা পয়সা দেখছি না আমি; বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারে আমার দরকারও নেই। আমি যাকে চিনি বুঝি যে আমার মন বোঝে, যে আমাকে চেনে তাকেই আমি চিরদিনের সঙ্গী করে নিতে চাইছি—এই নিয়ে কারো আলোচনা, নাক সিঁটকানি, ঠোঁট মোচড়ান, হাসি আমি গ্রাহ্য করব না।

অবশ্য চায়ের দোকানে বসে কথাবার্তা খুব সুন্দরভাবেই হয়েছিল তিন-জনের। পুরানো দিনের সব কথা। কে কোথায় আছে, কার কার বিয়ে হয়ে গেল, কে বা কারা ছেলের মা হয়েছে, কে কে বাবা হয়ে গেছে—এই সব নিয়ে অনেক হাসাহাসিও করেছিল তারা।

মীনাক্ষী তাদের দু-চারজন পুরানো বন্ধু-বান্ধবীর খবর বলল, রূপা হয়ত তাদের খোঁজ রাখে না। আবার রূপা এমন সব ছেলে ও মেয়ের খবর দিল যাদের সম্বন্ধে মীনাক্ষীর কৌতুহল থাকা সত্ত্বেও কোন খবর পাচ্ছিল না।

সুব্রতও দু-একজনের নাম বলেছিল।

সুব্রত চিরদিনই ঘরকুনো পড়ুয়া ছেলে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা তার কম ছিল।

তা হলেও একটা দুটো বন্ধুর কথা সে বলল। মেয়েদের সম্পর্কে কোনো খবরই রাখে না--সে কথাটা শুনে মীনাক্ষী ভুরু পাকিয়ে একটা খোঁচা দিয়েছিল। অর্থাৎ, সুব্রত এখন একটি মেয়ের খোঁজ খবর নিতে সর্বদা ব্যস্ত যে এখন আর অন্য মেয়েদের খবর নেবার সময় নেই তার।

শুনে সুব্রতর মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। তার লজ্জা বাঁচাতে রূপা তাড়াতাড়ি বলেছিল, না রে বাপু, যাকে নিজের হাতে রেশন তুলতে হয়, বুড়ো বাবা-মার সেবা শুশ্রূষা করতে হয়, ছেলে পড়াতে হয়, আবার কলেজেও ছুটতে হয়, তার পক্ষে কারো পক্ষে খোঁজ নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

একথার পর মীনাক্ষী একটু থমকে গিয়েছিল। চুপ করে এক মিনিট

সুব্রতকে দেখেছিল। সুব্রত তখন ঘাড় গুঁজে চামচ দিয়ে পুডিং ভাঙ্গছিল। সুব্রতর আর ভাই বোন নেই, বাবা-মার একমাত্র ছেলে, এখন তাঁদের বুড়ো বয়সে দু'জনেই রোগের আক্রমণে প্রায় শয্যাশায়ী, এক হাতে বুড়োবুড়ির সেবাযত্ন করা, আর এক হাতে বাজার টানা, তার ওপর প্রাইভেট টুইশনি, কলেজের চাকরি—এমন কি মাঝে মাঝে হাতটাত পুড়িয়ে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে সুব্রতকে কলেজ করতে হচ্ছে—এ সব শুনে মীনাক্ষীর চোখ দুটো কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল, আর হাসছিল না। কিন্তু তখনি রূপার মনে হয়েছিল সুব্রত সম্পর্কে এত সব কথা গল গল করে না বললেও হত। মীনাক্ষী নিশ্চয় করুণ চোখ করে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে অনুকম্পাই করছিল। এই জন্য পরে, অর্থাৎ মীনাক্ষী তার প্রকাণ্ড গাড়ি চালিয়ে চলে যাবার পর রূপার ভীষণ খারাপ লাগছিল। বেশ একটু অনুতাপই হয়েছিল যেন।

মীনাক্ষী বড় লোকের মেয়ে, একমাত্র সেইজন্যেই কেউ গরীব শুনলেই মীনাক্ষী তাকে অনুকম্পা করতে আরম্ভ করবে ?

না, কলেজে পড়ার সময় তার মধ্যে, এই ভাব ছিল না। কে গাড়ি করে কলেজে আসছে, কে ট্রাম-বাসে ঝুলতে ঝুলতে এল, কার পকেট খরচই মাসে একশ' টাকার ওপর, কার টিফিন খাবার পয়সা হচ্ছে না—এসব খেয়াল করত না ওই ব্যারিস্টারের মেয়ে। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশেছে হেসেছে, কথা বলেছে, কফি-হাউসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছে, কোনো দিন কাউকে নাক সিঁটকোতে দেখা যায় নি। এখন তার বয়স বেড়েছে, নজর বদলেছে, সংসারের ভাল মন্দ পাঁচটা জিনিসের সংস্পর্শে এসেছে। সুব্রতর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে যাবার সময় রূপা চিন্তা করছিল, এখন বুঝি মীনাক্ষীর মধ্যে ধনী গরীবের তুলনাটা, আসল নকলের তারতম্যটা মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে।

রাতে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে রূপা চিন্তা করছিল, মীনাক্ষীকে সে যা মনে করেছে, আসলে তা নাও হতে পারে। হয়ত আমার মতনই মিশুকে প্রাণ-খোলা ; তা না হলে সুব্রতর সঙ্গে তাকে মার্কেটের ভিতর দেখতে পেয়ে ছুটে এসে সেই আগের মতন রূপার চোখ দুটো চেপে ধরবে কেন ! এটা মীনাক্ষীর একটা সুন্দর অভ্যাস, স্কুলে পড়ার সময় হয়তো এই করত, কলেজে পড়ার সময়ও করেছে। খুব পরিচিত কোন মেয়েকে দেখলেই পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরতো। সেদিনও তাই করল মীনাক্ষী। ভিতরে সরলতা না থাকলে এমনটা করতে যাবে কেন ও।

কাজেই দিনের বেলা মীনাক্ষী সম্পর্কে সে যা চিন্তা করেছিল, রাতে শুয়ে রূপা তার ধারণাটা বদলে ফেলেছিল। মীনাক্ষীকে তখন চায়ের দোকানে বসে ভুল বুঝেছিল সে। মীনাক্ষী নিশ্চয়ই একটুও বদলায় নি। আগের মতনই আছে। সুব্রতর সঙ্গে তাকে ঘুরতে দেখে মীনাক্ষী হয়তো কিছুই ভাবে নি। কলেজের একটি পুরানো বন্ধুর সঙ্গে ঘুরলে ভাববেই বা কি। হয়তো সুব্রতর সঙ্গে মীনাক্ষীর রাস্তায় দেখা হলে সেও সুব্রতকে ডেকে তার গাড়িতে তুলে নিত। দু'জনে গল্প করত।

আসলে সুব্রতকে যে রূপা বিয়ে করতে যাচ্ছে, মীনাক্ষী জানে না, জানবার কথাও না। বাইরের কাউকে এখন পর্যন্ত এই নিয়ে কিছু বলা হয় নি।

কাজেই আসল ব্যাপারটাই যখন মীনাক্ষীর জানা নেই, সেহেতু সে ঠোঁট টিপে হাসবেই। তার সেই হাসির মধ্যে রূপা নাক সিঁটকানো, ঘেন্না অনুকম্পা ইত্যাদি কেন যে আবিষ্কার করতে গিয়েছিল—চিন্তা করে রূপা একলা বিছানায় শুয়ে ভিতরে ভিতরে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। মীনাক্ষীকে এভাবে বিচার করা তার ঠিক হয় নি। ঠোঁট টিপে হাসা মীনাক্ষীর স্বভাব। কলেজেও তো কত দিন রূপাকে স্নিগ্ধাকে দেখে, (কোনো ছেলে যদি না-ও থাকত) ঠোঁট টিপে ও হাসতো। এই হাসির ভিতর সেদিন একমাত্র মন-খোলা মনের পরিচয় ছাড়া অন্য কোন অর্থ-ই থাকত না। কাজেই আজ তার এই হাসির মধ্যে একটা নতুন ইঙ্গিত কিংবা অন্য কোন অর্থ জন্ম নিয়েছে এমন মনে করার কোনো কারণ হয়ত নেই।

রূপা মনে মনে সেদিন ঠিক করে ফেলেছিল, আর একদিন মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হলে তার কাছে সে ক্ষমা চাইবে। কলেজে পড়ার সময় যে-চোখে তাকে দেখত, যে-মন নিয়ে তার সঙ্গে মিশত, ঠিক সেই মন নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে তার সঙ্গে মিশবে এবং মনে মনে বলবে, বন্ধু তুমি আমায় ক্ষমা করো, না জেনে শুনে তোমার ওপর অত্যাচার করেছিলাম।

কাল রাতে হঠাৎ মীনাক্ষীর ফোন পেয়ে এইজন্যই রূপার এত ভাল লাগছিল। আবার তার সঙ্গে দেখা হবার একটা সুযোগ। উহুঁ, এবার আর রাস্তায় দেখা হওয়া নয়। একেবারে মীনাক্ষীদের বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন পেয়েছে রূপা।

বস্তুত এতদিন এক সঙ্গে তারা কলেজে পড়ে এসেছে, অথচ মীনাক্ষীদের বাড়ি একদিন মাত্র গিয়েছিল সে। মেয়েটাকে প্রথম দিন ক্লাসে দেখেই রূপার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল।

অবশ্য পরে রূপা লক্ষ্য করত, মীনাক্ষীর সঙ্গে সকলেই অন্তরঙ্গ হয়েছে। সকলের সঙ্গেই তার আন্তরিকতা রূপার ঈর্ষার ইন্ধনও জুগিয়েছিল।

নিশ্চয়ই মেয়েটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঈর্ষার বস্তু।

বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে ক্লাসের সব কটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে মীনাক্ষী অন্তরঙ্গ হতে পারত না।

মীনাক্ষীকে ভাল লাগার আরও একটা কারণ, মীনাক্ষী তার এক মামাতো ভাইয়ের গল্প রূপাদের কাছে প্রায়ই করত। ভদ্রলোক মিলিটারী কণ্ট্রাক্টার ছিল এককালে। কণ্ট্রাক্টারী করে নাকি প্রচুর টাকা জমিয়েছে। অথচ বিয়ে থা কিছুই করেনি। হুঁ, নামটাও মনে আছে রূপার, 'মোহনলাল', মীনাক্ষী বলত মোহনদা। ভীষণ খেয়ালী মানুষ নাকি। এত পয়সার মালিক হয়েও মনটা একেবারে ছেলেমানুষের মত। বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে কিংবা ডাংগুটি খেলতে প্রায়ই দেখা যেত। শিকার করারও খুব শখ। কত জায়গা থেকে সে বাঘ-হরিণ-বাইসন সব মেরে এনেছে। নিজের শোবার ঘরটা বাঘছাল, হরিণের মাথা আর বাইসনের চামড়া দিয়ে নাকি ভরিয়ে রেখেছে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁরা কেউ আজ আর বেঁচে নেই। একলা একটা বাড়িতে থাকে। মীনাক্ষী বলত, তার মোহনদার বাড়িটা নাকি দেখবার মতন। ব্যারাকপুরের ওদিকে ঠিক গঙ্গার ওপর জাহাজ প্যাটার্নের একটা বাড়ি। অচিনপুর না কি যেন জায়গাটার নাম। জায়গাটাও নাকি ভারি সুন্দর।

রূপা তো ভুলেই গিয়েছিল এই মোহনলালের কথা। কেননা কলেজ ছাড়ার পর মীনাক্ষীর সঙ্গে আর দেখাই নেই, আর এই দু'বছরের মধ্যে তার মোহনদার গল্প শোনারও কোনো সুযোগ হয়নি।

কাল হঠাৎ টেলিফোন করে মীনাক্ষী তার এই মোহনদার কথাই শুধু বেশি করে বলেছে। না মোহনদা তাদের সাদার্ণ এভিন্যুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কাল তাঁরা ওঁর জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে একটা ছোট-খাট পার্টির আয়োজন করতে চায়।

মীনাক্ষী আরও বলেছে, যে তার টেবিলে একটা গ্রুপ ফোটো আছে। রূপারা যখন কলেজ ছাড়ে ক্লাসের কটি মেয়েকে নিয়ে এই ফোটো তোলা হয়, এর মধ্যে ছেলেরা কেউ ছিল না। শুধু মেয়েদের ছবি। রূপা, মীনাক্ষী, মিনি, চামেলী, স্নিগ্ধা, শ্যামলী এবং আরো অনেক মেয়ে। মীনাক্ষীর মোহনদা কাল সকালে ওদের বাড়িতে এসেছে প্রায় চার বছর পরে। বিকেলে চা খেয়ে ভদ্রলোকের কি খেয়াল হল। হঠাৎ মীনাক্ষীর ঘরে ঢোকে। দরজার বাইরে

থেকেই মীনাক্ষীর টেবিলে দাঁড় করান বাঁধান গ্রুপ ছবিটা তাঁর চোখে পড়ে। ভিতরে ঢুকেই সোজা টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ফটোর ওপর আঙুল রেখে, আশ্চর্য, প্রথমেই রূপাকে দেখিয়ে বলে, এটি কে রে মীনু?

যেমনি আমি তোর নাম বললাম, বুঝলি রূপা। টেলিফোনের ভিতর মীনাক্ষীর ভরাট গলা যেন ঢেউয়ের মতন ফুটে উঠেছিল, 'আমার এত ভাল লাগছিল, সকলের আগে তোর দিকেই মোহনদার চোখ গেল, বললাম আমরা এক সঙ্গে কলেজে তিন বছর পড়েছি, ওরা হ্যারিসন রোডে আছে, বাবা ডাক্তার, পাশ করে এখন ও একটা স্কুলে আছে।

'আর কি বলল?' রূপাও খুশি হয়েছিল, তবে হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার শুনে, কেমন যেন বিব্রতও হয়ে পড়েছিল।

তখনও কিন্তু রূপা আসল কথাটাই শোনেনি। 'আর কি বলল' প্রশ্ন করেই উত্তরটা শুনতে সে কেমন যেন কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভারটা ধরে রেখেছিল।

রিসিভারের ওপারে মীনাক্ষী যেন তার স্বভাবসিদ্ধ ঠোঁট টেপা হাসি হাসছিল। বলছিল, 'ভীষণ ভালো তো দেখছি মেয়েটি, চোখ দুটো ব্রিলিয়ান্ট।'

কথাটা শুনে রূপা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় পুরো এক মিনিট আর কোনো কথাই বলতে পারেনি।

মীনাক্ষীও বুঝতে পেরেছিল, একটি পুরুষ সরাসরি তার চেহারার, চোখের প্রশংসা করছিল শুনে রূপা নিশ্চয়ই আইসক্রিমের মতন জমাট বেঁধে গেছে।

তাই যেন তাকে সোহাগ করে আদর করে গরম করে তুলতে মীনাক্ষী বলেছিল, 'শোন, মিনি চামেলী স্নিগ্ধাকেও বলেছি, ঠিকানা খুঁজে পেলে শ্যামলী অতসীকেও বলব, বলতেই হবে, আমরা যে সাতজন ঐ ফোটোতে ছিলাম সকলকে একত্র করতে চাইছি—কাজেই, বুঝতে পারছিস, তোকে আসতেই হবে। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ চলে আসবি। আমি গাড়ি পাঠাব।'

'আবার একটা ফোটো তোলা হবে বুঝি?' একটু হাল্কা সুরে রূপা উত্তর দিয়েছিল।

মীনাক্ষীও রূপার খোঁচাটা বুঝতে পেরেছিল।

'আরে না না, সেসব ব্যাপারই না। জানিস তো, মোহনদা সন্ন্যাসীরও বাবা। নিরামিষ খায়। তাও স্বপাকে। একলা মানুষ। বিয়ে থা করে নি। অচিনপুরের বাড়িটা নাকি আশ্রমের মত করে ফেলেছে। তাঁত-টাত বসিয়েছে। সেখানে সধবা-বিধবা সবাই লাইন দিয়ে কাপড় গামছা বুনছে। একটা নাইট স্কুলও খোলা হয়েছে। গাঁয়ের চাষী ছেলেরা সারাদিন কাজ-কর্ম সেরে রাতে ওখানে

এসে নাকি লেখাপড়া শেখে। দু'জন গ্র্যাজুয়েট মাস্টারও রাখা হয়েছে। হাসপাতালও করা হচ্ছে, তিন বিঘা জমি নিয়ে একটা বাড়ি হচ্ছে। অর্থাৎ মোহনদা এতকাল যা উপায় করেছে, মানুষের উপকারের জন্যই সবটাই খরচ করে ফেলবে বোধ হয়। আরও শুনবি—এখানে এসে রোজ সকালে গীতা পড়ছে।'

একথার পর দুজনেই প্রাণ খুলে হেসেছিল।

হাসি চেপে মীনাক্ষী বলেছিল, সন্ন্যাসী বলতে তুই আবার ভাবিস না যে, খুব শিষ্য-টিষ্য ওঁর আছে, ধূপধুনো জ্বালিয়ে ঠাকুর দেবতার পুজো-টুজো হচ্ছে। কি হলো, তুই এখনো হাসছিস—রূপা যে কেন হাসছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না।

তাই মীনাক্ষী যেন একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'না না, ঐ যে তোর প্রশংসা করেছিল, এটা আসলে কিছুই না, মেয়েদের ওপর লোভ বলে মানুষটার কিছু নেই, আসলে মোহনদার অ্যাসথেটিক্স সেন্সটা খুব বেশি, এই ধরনের মানুষের যা হয়, সৌন্দর্য বোধটা ভীষণ টনটনে। কাজেই তোর সুন্দর চোখ দেখে হঠাৎ এমন উথলে উঠেছে। একটা সুন্দর ফুল দেখলে একটা সুন্দর পাখি দেখলেও মোহনদা এই রকম করে।

রূপা আর কিছু বলেনি। কথাটা শুনে একটু লজ্জাই যেন পেয়েছিল।

'কি হল, চুপ করে আছিস', এবার মীনাক্ষী হাসছিল। 'আসছিস তো?'

'চেষ্টা করব।'

'না না চেষ্টা-ফেষ্টা নয়, আমি গাড়ি পাঠাব। আমি মোহনদার জন্যেই তোকে আসতে বলছি—আশা করি এতবড় মানুষটার ওপর অবিচার করবি না, কাল সন্ধ্যেবেলা আমরা সব কটি আড্ডাবাজ একত্র হব, বুঝেছিস?'

—হুঁ, একেবারে হাড়ে হাড়ে।

মাকে কথাটা বলতে মাও খুব হাসল। মার হাসি আর টেলিফোন ধরে আমার হাসির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। রূপা ভাবে—

আমি হাসছিলাম লজ্জা পেয়ে, কিন্তু মা হাসছিল অতিরিক্ত আহ্লাদে!

কিন্তু বেশি সময় হাসল না রূপা। পরক্ষণেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসল। যেন একটা সমস্যায় পড়ল। এত বড়লোক মীনাক্ষীরা। তার ওপর তাদের মামাতো ভাই মোহনলাল, যার ধন ঐশ্বর্যের গল্প শুনে শুনে আমাদের কাছে মানুষটা প্রায় রূপকথার মানুষে পরিণত হয়েছে। আমাদের কলেজের মেয়েরা বাড়িতে গিয়ে তাদের মাকে মীনাক্ষীর মোহনদার গল্প শোনাত কিনা

জানিনা, আমি এসে মাকে শোনাতাম, সেই থেকে মার চোখেও মানুষটা রূপকথার রাজাটাজার মতন কিছু একটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কাজেই সেই মানুষের জন্মদিন উপলক্ষে মীনাক্ষীদের সাদার্ণ এভিন্যুর জমকালো বাড়িতে প্রীতি সম্মেলন নিমন্ত্রিত হয়ে আমি যাচ্ছি, ভাবতেই মাও যেন কেমন চুপ্‌সে গেল।

সকালেই কথাটা বলেছিলাম। তারপর থেকে যেন মার ভাবনার শেষ নেই। অর্থাৎ কোন্ শাড়িটা আমি পরব, কোন ব্লাউজটা গায়ে চড়াব, কেমন করে চুল বাঁধব, চোখে কতটা কাজল বুলোব, সারাক্ষণ কেবলই এই চিন্তা।

আমার পোষাকের স্যুটকেস তো মা ঘাঁটাঘাঁটি করলই, নিজের ট্রাঙ্ক স্যুটকেসও লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ল। সব শাড়ি জামা টেনে বের করে উল্টেপাল্টে দেখল। আসলে কোনোটাই মার পছন্দ হচ্ছিল না।

এটা সিনেমায় যাওয়া না, পার্কে বেড়াতে বেরোন না, মার্কেটিং করতে বাড়ি থেকে বেরোনও নয়। বা অমুকের বাড়ির বৌভাত কি তমুকের বাড়ির ছেলের মুখে ভাত খেতে যাওয়ার নেমন্তন্নও নয়।

রীতিমত একটা পার্টি।

তা-ও কিনা মীনাক্ষীদের বাড়ি।

তা-ও আবার তাদের সাংঘাতিক বড়লোক ভাই মোহনলালের জন্মদিনের পার্টি।

এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুঝি মা হত না। কিন্তু ঐ যে, মীনাক্ষীর টেবিলে আমাদের গ্রুপ ফোটো দেখে মোহনলাল শুধু আমারই মুখের প্রশংসা করেছে। একমাত্র আমার ছবি দেখেই করল। আর কারো নাম তো করলো না মীনাক্ষী। কথাটা শুনে মার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। আমাকে উর্বশী তিলোত্তমা না সাজিয়ে মায়ের বুঝি শান্তি নেই। তাই আমার সাজ-পোষাক নিয়ে এত ভাবনা।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত শাড়ি ব্লাউজ বেছে ঠিক করা হল। মজা এই যে আমাকে সকাল সকাল চান করে খেয়ে শুয়ে থাকতে বলল মা। অর্থাৎ দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হয়। দুপুর বেলা ঘুমিয়ে উঠলে মুখটা অনেক বেশী নরম নরম দেখাবে।

আমি তাই করলাম।

আজ বিকেলে সুব্রতর আসার কথা ছিল। মা জানত। আমি বলার আগেই মা তাকে ফোনে জানিয়ে দিল, রূপা তার এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে। খুব একটা ব্যস্ততা নিয়ে মা বিকেলে সুব্রতকে আসতে বারণ করে দিল।

আমি বুঝতে পারি, সুব্রতকে আসতে বারণ করে দিয়ে মা যেন খুবই তৃপ্তি বোধ করছিল।

অন্তত একটা দিন সুব্রত রূপাকে নিয়ে বেরোতে পারবে না। রোজ সে এবাড়ি আসছে, আর মেয়েকে নিয়ে বেরোচ্ছে, মনে মনে মার খুবই অস্বস্তি।

মার চোখ মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু মুখ ফুটে মা আমাকে নিষেধ করতে পারে না। সুব্রতকেও না।

মা প্রায় বুঝে গেছে, আমরা দু'জন শীগগীর বিয়ে করছি।

তাই আভাসে ইঙ্গিতে এবং কোনো কোনো সময় বেশ জোর করেই আমাকে বোঝাতে চাইছিল, সামান্য একটা চাকরি, কলেজের প্রফেসারের ভবিষ্যৎ কিছু নেই। যা দুর্দিন। একটু ভালভাবে থাকতে হলে আরো বেশি আয় করা দরকার।

তার মানে মা বলতে চাইছে, রূপার পাত্র বাছাই ঠিক হয়নি। গাড়ি-বাড়ি থাকবে, বড় ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তার, নিদেন পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করে এমন কোনো ছেলেকে আমার ধরা উচিত ছিল।

আমি দু' একদিন মাকে ধমক দিয়েছি। আমার পছন্দটাই এখানে বড়। আমরা গাড়ি চড়ে বেড়াব কি শাক ভাত খাবো সেটা আমরা দেখব। এই নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর তো কারণ নেই।

মা তখন করুণ চোখ করে রূপার মুখটা দেখতে দেখতে বলছে, ছাখ রূপা, সংসারে টাকাপয়সা যে কী জিনিস মানুষ আগে বোঝে না, পরে বোঝে। এক সময় বুঝতে হবেই। যখন ছেলেপুলে হবে, যখন তাদের লেখা পড়া শেখাতে হবে, ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। হয়তো তোদের একটা ছেলে লেখাপড়ায় খুব ভাল হল, তাকে বিদেশে পাঠানো দরকার কিন্তু যখন দেখবি টাকার অভাবে কিছুই করা গেল না তখন এমন কষ্ট পাবি মনে, ভীষণ অনুতাপ করবি।

'বাপ্‌রে বাপ, এত চিন্তা তোমার মাথায়।' কানের গোড়ায় রোজ এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি কত সহ্য হয়। একদিন রূপা অসহ্য হয়ে বলে ফেলেছিল, এখন পর্যন্ত বিয়েই হল না, কবে হবে আমাদের ছেলেপুলে, কবে তারা বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলে বিলেত যাবে—তার জন্যে এখন থেকেই দেখছি তোমার চোখে ঘুম নেই। টাকা পয়সা থেকেও তো দেখা যায় মানুষ অনেক সময় ভাল পাত্রে মেয়ে দিতে পারে না, অথবা বিয়ে দেবার পরে দেখা গেল মেয়ে মার কাছে ফিরে এসেছে, এসব অদৃষ্টের কথা। টাকা পয়সা

নেই, দুবেলা ভাত জোটে না এমন ঘরের ছেলেও লেখাপড়ায় ভাল হয়ে বিলেত যাচ্ছে, তুমি তো রোজ খবর কাগজ পড়, এসব খবর নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়ে। তা ছাড়া মা, তুমি যে ছেলেপুলের কথা বলছ, আমাদের যে সেসব হবেই একথা তুমি কী করে জানলে ?'

—কথাটা খুবই কর্কশ হয়েছিল। রূপা পরে বুঝতে পেরেছিল। মার মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। সুব্রতর চাকরি, সুব্রতর ঘর বাড়ির অবস্থা এমন কি সুব্রতর স্বাস্থ্য নিয়েও কটাক্ষ করতে পর্যন্ত মা ছাড়ছিল না। সুব্রত রোগা কোনোদিনই খুব একটা পরিশ্রম করতে পারবে না, পরিশ্রম করতে না পারলে পুরুষের জীবনে আর উন্নতি কোন্‌দিক দিয়ে হবে ? ইত্যাদি—

কাজেই রূপাকে রুক্ষভাবেই কথাটা শোনাতে হয়েছিল। তিনদিন পর্যন্ত মা তার সঙ্গে কথা বলেনি।

আর সুব্রতর সঙ্গে কথা বলা তো অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এবং এমনও দেখা গেছে, সুব্রত বাড়িতে ঢুকলে মা সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়েছে। সুব্রতকে যে ভদ্রমহিলা এড়িয়ে চলেছেন রূপাকে সেদিন কথাটা সুব্রত বলেওছিল। শুনে রূপা হেসেছে। সুব্রতকে বুঝিয়েছিল, সে তো মার কাছে যাচ্ছে না, যাচ্ছে রূপার কাছে, সুতরাং মার এই অভদ্র আচরণটাকে সুব্রত যেন এড়িয়ে চলে।

আজ রূপার মার মেজাজ অন্যরকম। সুব্রত আসছে না, রূপা যাচ্ছে বড়লোক বান্ধবীর বাড়ি পার্টি খেতে। প্রায় রাজার মতন একটি মানুষের জন্মদিনের পার্টি, যে মানুষ কিনা রূপার চেহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আসলে রূপার মার বড়লোক প্রীতি রূপার বাবাই সৃষ্টি করে গিয়েছিল। ভদ্রলোক একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করত। শিলিগুড়ির ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ছিল। হট করে একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চায়ের ব্যবসা আরম্ভ করে। চায়ের ব্যবসা করে দু' পয়সা জমিয়েছিল। ছোটখাট একটা গাড়ি কিনেছিল। একটা বাড়িও কিনেছিল। তারপর মাথায় কী ঢোকে, ফটকার বাজারে নেমে পড়ল। অর্থাৎ রাতারাতি লক্ষপতি হবার বাসনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসনাটা পূর্ণ হল না। ফটকার ফাঁদে পড়ে গাড়ি-বাড়ি বেচতে হল, হাতে যা ছিল সবই গেল। তখন মনের কষ্ট ভুলতে দেশী মদ খেতে আরম্ভ করল। আগেও একটু আধটু অভ্যাস ছিল। তখন অবশ্য বিলাতী জিনিস খেত, হাতে পয়সা ছিল, এখন পয়সা কোথায় ! কাজেই ক'দিন পরেই লিভারের শক্ত অসুখ। অসুখ নিয়েও মদ্যপান চলল। এভাবে পঞ্চাশ ফুরবার আগেই রূপার বাবা মারা গেল।

রূপার মা কিন্তু স্বামীর মদ খাওয়াটা খারাপ চোখে দেখত না। মহিলার ধারণা, বড়লোক মাত্রেই মদ খায়, অথবা বড়লোক হতে গেলেও ওটা খাওয়ার দরকার পড়ে। কাজেই কোনদিনই স্বামীকে সে এই ব্যাপারে বাধা দেননি।

মদ তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ রূপার মা আজও বিশ্বাস করে না।

মানুষটার আয় ছিল না, না হলে জীবনে অনেক কিছু করতে পারত।

যাই হোক, ঐ যে স্বামী দু'দিনের জন্য গাড়ি চড়িয়ে গিয়েছিল, ভাড়া বাড়িতে না রেখে নিজের বাড়িতে রেখেছিল—সেই দিনের নেশা রূপার মা আজও ভুলতে পারছে না।

এই জন্য যাদের গাড়ি বাড়ি আছে রূপার মার চোখে তারা দেবতার মতন। দেবতারও বেশি।

মীনাক্ষী গাড়ি চড়ে আসে, সাদার্ণ এভিন্যুর ওপর মীনাক্ষীদের কত বড় বাড়ি, কত ঝি চাকর, মীনাক্ষী আজ এই শাড়ি পরে এসেছিল, কাল সেই শাড়ি পরেছিল, মীনাক্ষী এই টিফিন খায় সেই টিফিন খায়—তখন তো আর মাকে এতটা বুঝত না, কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে রূপা মাকে মীনাক্ষীর গল্প শোনাত। মা কান পেতে শুনত। অন্য মেয়েদের গল্প করতে গেলে মহিলা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, যেন সে সব শুনতে তার ভাল লাগত না। মীনাক্ষীর গল্প তাকে মুগ্ধ করত।

যদি এক আধ দিন কলেজ থেকে এসে রূপা মীনাক্ষীর কথা না বলেছে তো রূপার মা নিজে থেকে মীনাক্ষীর কথা জিজ্ঞেস করেছে। হ্যাঁরে! মীনাক্ষী আজ কলেজে এসেছিল?

মুখে বলত না, কিন্তু হাবেভাবে মা রূপাকে বোঝাতে চাইত, রূপা যেন সর্বদা মীনাক্ষীর সঙ্গেই মেলামেশা করে, কেননা তার মতে একেই বলে সৎসঙ্গ, অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা মার মনঃপুত ছিল না, যেহেতু তাদের কারো গাড়ি-বাড়ি নেই।

আর ঐ যে একদিন মীনাক্ষীর সঙ্গে গাড়ি চড়ে রূপা তার কলেজ জীবনের প্রথম অবস্থায় মীনাক্ষীদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, এই গল্প যে মা কত মানুষকে শুনিয়েছে, গল্পটা কাউকে শোনাতে মহিলা রীতিমত গর্ববোধ করত।

তারপর রূপা আর একদিনও, মীনাক্ষীদের বাড়ি গেল না বলে মা ভীষণ দুঃখ করত।

সেই মীনাক্ষীদের বাড়ি আজ রূপা যাচ্ছে। রূপার জন্য মীনাক্ষী গাড়ি পাঠাবে।

মানুষের চাঁদে পৌঁছানোর খবরও বুঝি রূপার মাকে এতটা বিস্মিত ও মুগ্ধ করতে পারত না।

দুপুরে ঘুমিয়ে ওঠার পর মা নিজের হাতে রূপাকে চা করে দিল। তারপর চিরুণি চুলের কাটা ফিতে সব এগিয়ে দিল।

যতক্ষণ রূপা চুল বাঁধল মা কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। চুল বাঁধা শেষ করে মুখে ক্রিম রুজ মাখা থেকে কাজল পরা—এক সেকেণ্ডের জন্যও মহিলা অন্য কোথাও সরছিল না, বা অন্যদিকে চোখ সরাচ্ছিল না, একটা গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েকে দেখল। শাড়ি জামা পরল রূপা। মা একবার পিছনে গিয়ে একবার পাশে দাঁড়িয়ে, আবার সামনে এসে মেয়ের সাজসজ্জা পরীক্ষা করল। পাছে কোনো খুঁত থেকে যায়, পাছে বড়লোকের বাড়ির কেউ রূপাকে দেখে নিন্দা করে।

কিন্তু নিন্দা করার মতন, খুঁত ধরার মতন যখন কিছুই দেখল না রূপার মা, তখন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আর খুঁত ধরবে কোথায়, এমন যার গায়ের রং, এমন যার চুল, এমন যার নাক চোখ ভুরু—লম্বা ছিপছিপে কাঠামো অথচ কেউ রোগা বলতে পারবে না। মেয়েদের শরীরে যেখানে যতটুকু মাংস বা চর্বি থাকা দরকার রূপার সেটুকু আছে। একটু বেশি না, কম না। এদিক থেকে তার রূপলাবণ্যের তুলনা হয় না।

তাছাড়া ছবির মধ্যে যার চোখ দেখে একটি পুরুষ 'ব্রিলিয়াণ্ট' বলতে পারে, তাকে সামনাসামনি দেখলে—

রূপার মা বকবক করছিল, রূপা মাকে থামাতে চাইল। 'তুমি কি শুরু করেছো মা,—আমি ওবাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি, যেহেতু আমরা পুরানো ক'টি বন্ধু একজোট হব—আমার চোখ দেখে কে কী বলেছিল, আর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কী বলবে না বলবে তাই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। সত্যি, দিন দিন তুমি বুড়ি হচ্ছ না যেন কচি খুকী হচ্ছ।'

ধমক খেয়ে রূপার মা একটু সময় চুপ করে ছিল। তখন ছাদের মাথায় রোদ মিলিয়ে গিয়েছিল। রূপার মা ঘন ঘন জানালায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল আর ঘুরে ঘুরে এসে টেবিলের টাইমপীসটা দেখছিল।

প্রায় পৌনে ছটার সময় মীনাক্ষীদের হলদে রঙের জমকালো গাড়িটা এসে রূপাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রূপার মা-ই আগে দেখল। হুড়মুড় করে ছুটে আসছিল মেয়েকে খবরটা বলতে। চৌকাঠে পা আটকে দড়াম করে মেঝেয় ছিটকে পড়ল। রূপা তখন ঘাড় গুঁজে নখে রং লাগাচ্ছিল। ছুটে এসে মাকে টেনে তুলল।

'লেগেছে কোথাও ?'

রূপার মা মাথা নাড়ল। 'তা লাগলেও কি আর তুমি এখন বলবে, এমন ছুটোছুটি করছ। যেন চাঁদে যাবার রকেট এসেছে আমাকে নিতে। আমি তো হর্ণ শুনেই বুঝতে পেরেছি মীনাক্ষীদের গাড়িটা এসেছে।

'না রে সত্যি আমার লাগেনি।' রূপার মা কোমরে ব্যথা নিয়েও সুন্দর করে হাসল। 'নে, আর দেরি করিস নে অনেকটা রাস্তা তো।'

'আমার হয়ে গেছে।' আঙুলের রক্তিম নখগুলির ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রূপা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

এবং যতক্ষণ না রূপা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল, স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা গলি থেকে বেরিয়ে গেল, রূপার মা কাঠের পুতুল হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হচ্ছিল, সত্যি রূপা চাঁদের দেশে যাচ্ছে।

নিচের সিঁড়ি থেকেই গোলাপের গন্ধ টের পেল রূপা। যেন কোথাও রাশি রাশি গোলাপ ফুল এনে জড়ো করা হয়েছে।

ওপরের হলঘরে আসর বসেছে, তা-ও সে টের পেল। টকটকে লাল গালিচা বিছানো সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে গেল। স্নিগ্ধা গান করছিল। তাদের মধ্যে একমাত্র স্নিগ্ধাই গাইতে পারত।

অনেকদিন পর মীনাক্ষীদের বাড়ির পার্টিতে স্নিগ্ধার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে রূপার কেমন হাসি পেল।

স্নিগ্ধার এটা গুণ বলতে হবে।

কেউ একটু বললেই গাইতে আরম্ভ করে দেয়। কলেজে পড়ার সময়ই দেখেছে। এই নিয়ে রূপা ও তার অন্য সঙ্গীরা স্নিগ্ধার আড়ালে কম হাসাহাসি করত না।

নিশ্চয়ই আজ মীনাক্ষী তার মোহনদাকে কথাটা বলেছিল। জানতে পেরে মোহনদা সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধাকে একটা গান করতে বলে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধারও গলা খুলে যায়। রূপা কল্পনা করে নিল।

'আয় আয়!' সকলের আগে মীনাক্ষীই রূপাকে দেখতে পেল। আসন ছেড়ে উঠে এসে চৌকাঠের কাছ থেকে রূপাকে হাত ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরটা ঝলমল্ করছিল। যেন এই জন্যই সব ক'টি মুখকে এত ভাল দেখাচ্ছে। তা ছাড়া সবাই ভীষণ সেজেগুজে এসেছে। কিন্তু স্নিগ্ধার খোঁপাটা দারুণ বড় বড় দেখাচ্ছে। নির্ঘাৎ ফল্‌স লাগিয়ে এসেছে ও, রূপা এক নজর দেখেই সন্দেহ করল।

কিন্তু এই নিয়ে এখন তো কিছু বলা যায় না। এমন একটা পার্টির মধ্যে। কিন্তু পার্টি শেষ হলেই কি আর বলা যাবে। সেই দিন নেই। কলেজের দিন থাকলে সবাই মিলে স্নিগ্ধাকে এতক্ষণ ঠেসে ধরত।

বাপু তোমার নিজের মাথায় যতটা চুল আছে তাই দিয়ে খোঁপা করলে তো তোমাকে খারাপ দেখায় না। তবে কেন আলগা চুল গুঁজে—

রূপা নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল। শ্যামলী কাশ্মীরি সিল্ক পরে এসেছে। চামেলী ঘন করে কাজল বুলিয়েছে।

'কি হল, বোস!' একটা সোফার গায়ে রূপাকে ঠেলে দিয়ে মীনাক্ষী হাসল। 'হাবার মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন।'

লজ্জা পেয়ে রূপা বসে পড়ল। সত্যি কেমন বোকা বোকা ভাব নিয়ে ঘরের মানুষগুলিকে সে দেখতে আরম্ভ করেছিল।

বসবার পর হঠাৎ-ই এক জায়গায় দৃষ্টিটা স্থির হয়ে পড়তে কেমন যেন চমকে উঠল ও।

সেখানে একটিই পুরুষই বসে।

আলাদা একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। গলায় বেল ফুলের মালা। পরনে সিল্কের গরদ। কিন্তু খালি গা।

বুকে অজস্র চুল। রংটা মোটামুটি ফরসা। দুটো কাঁধ ও বাহুর শক্ত পেশী দেখবার মতন। যেন মানুষটা কুস্তিটুস্তি করে। কানের কাছে চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। অথচ মনে হয় কত জোয়ান, চিবুকটা মোটা। নাকটা সরু। কপালটা চওড়া খুবই চওড়া এবং ঠোঁট দুটোও বেশ পুরু। মাথার আকৃতিটা অবিকল একটা তালের মতন।

এই বুঝি মোহনলাল, মীনাক্ষীর মোহনদা। মানুষটার যে এত বয়স হয়েছে রূপার ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন বুঝল, সেই যুদ্ধের আমলে, যা নাকি রূপার জন্মেরও আগে, মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে আসামের জঙ্গল কেটে যে মানুষটা রাস্তাঘাট তৈরি করেছিল তার তো বয়স হবেই। হয়তো পঞ্চাশ হয়ে গেছে। না হলেও কাছাকাছি হবে।

অথচ শরীরের এমন শক্ত বাঁধুনি। এমন একটা কাঠখোট্টা চেহারা। যেন আজও পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা রাখে।

চোখ বুজে স্নিগ্ধার গান শুনছিল।

এদিকের একটা সোফার ওপর শ্যামলী ও মীনাক্ষীর মাঝখানে বসেছে রূপা। এতদিন যার কথা শুনে আসছিল তাকে একটু খুঁটিয়েই দেখতে আরম্ভ করেছিল ও।

কিন্তু দেখা হল না।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল চোখ মেলে তাকাল। রূপার বুক কেঁপে উঠল, হৃৎপিণ্ড ধড়াক করে উঠল।

কেননা চোখ মেলেই মানুষটা অন্য কিছু দেখার আগে অন্য কোনোদিকে তাকাবার আগে সোজা রূপার চোখ দুটো দেখতে আরম্ভ করে দিল, আর সে কী তাকান, যেন রূপার বুকের ভিতর দৃষ্টিটা ঢুকে পড়েছে। আর কী সাংঘাতিক রং সেই চোখের। গোলাপী বড় বড় দুটো চোখ।

সামনে একটা ছোট টেবিলে এত গোলাপ স্তূপ করে রাখা হয়েছে যেন টেবিলের সব ক'টা গোলাপ ওই উজ্জ্বল লাল গোলাপী চোখের কাছে ম্লান মনে হল।

বলতে কি, ঐ দৃষ্টির সামনে রূপা তাকিয়ে থাকতে পারল না। মাথা নিচু করে ফেলল।

'কি হল', মীনাক্ষী তার কাঁধে হাত রাখল। 'আয়, মোহনদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

'থাক থাক, আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছি, সেই মুখ সেই চোখ।' গমগম করছিল মোহনলালের গলা। 'আমি বুঝতে পেরেছি, এই তোর বান্ধবী রূপা।'

নামটা পর্যন্ত জেনে গেছে। রূপার গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। তখনও সে ঘাড় গুঁজে। মীনাক্ষী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে, আস্তে না চেঁচিয়ে বলল, 'আর এই আমার মোহনদা, বুঝলি।'

বলতে কি, কত পুরুষের চোখ দেখেছে, কত পুরুষের গলার স্বর শুনেছে রূপা, কিন্তু এমন চোখ সে কোনোদিন দেখেনি, এমন গলার স্বরও কোনদিন শোনেনি। এই স্বর এই দৃষ্টি তার কাছে অন্য রকম লাগছিল। কি রকম মনে হচ্ছিল তাও ঠিক সে বুঝতে পারছিল না।

মাথার ওপর সব ক'টা পাখাই ঘুরছিল। তবু রূপা ঘামছিল।

একবার চুপ করে থেকে স্নিগ্ধা আর একটা নতুন গান ধরেছে।

মীনাক্ষী তার কাঁধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

এরপর একটু একটু করে রূপা আবার মাথা তুলল। সামনে সোফায় হেলান দিয়ে বসা পুরুষটা চোখের সঙ্গে যাতে চোখ না ঠেকে এমন একটা সতর্কতা নিয়ে সে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে আসরটা দেখল।

যেন এই প্রথম রূপা আবিষ্কার করল, এখানে দ্বিতীয় পুরুষ নেই, অচেনা কোনো মহিলাকেও দেখা যাচ্ছিল না। মীনাক্ষীর মা বা কাকীমাকেও রূপা

দেখতে পেল না। কেবল ক'টি মেয়ে। রূপা মীনাক্ষী আর তাদের পুরোনো সঙ্গীরা, এবং হয়তো মীনাক্ষীর জানাশোনা কি ইদানীং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে এমন আরো তিন চারটি মেয়ে। কারো বিয়ে হয়নি। হয়তো তারা এইখানেই থাকে। তারাও কম সেজেগুজে আসেনি। বড়লোকের বাড়ির পার্টি। কথাটা মনে রেখেই সব এমন সুন্দর হয়ে এসেছে।

স্নিগ্ধা আর একটা গান ধরল।

খুব খারাপ লাগছিল রূপার। চিরদিনই স্নিগ্ধার কেমন কান্না কান্না সুর।

গানের পালা কতক্ষণে শেষ হবে রূপা ভাবছিল।

যেন মনে হল কেউ তার মনের কথা টের পেয়েছে। স্ক্রীন সরিয়ে তখনি মীনাক্ষীর মা এসে ভিতরে দাঁড়াল।

'তোমরা চলে এসো, খেতে দেওয়া হয়েছে।'

মীনাক্ষী সোফা ছেড়ে উঠে, দাঁড়াল, তার দেখা দেখি রূপা ও অন্য সবাই উঠে দাঁড়াল। মীনাক্ষীর মোহনদা তখনও বসে। 'তুমিও এসো, মোহন।' মীনাক্ষীর মা ডাকল।

'আমি কেন পিসীমা?' মোহনলাল উঠে দাঁড়াল।

'আহা তুমিই তো সব। ওদের সবাইকে নিয়ে তুমি খেতে বসবে।' মীনাক্ষীর মা আর একটু হেসে স্ক্রীনের ওপারে অদৃশ্য হল।

'এসো রূপা।' মোহনলাল আর কাউকে ডাকল না, আর কারো দিকে তাকাল না! রূপাকে ডাকল, রূপার দিকে চোখ রাখল।

শ্যামলী, স্নিগ্ধা এবং মীনাক্ষীর অন্য সঙ্গীরা কলকল করে কথা বলছিল।

সব ক'টি মুখ এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। সব ক'টি চোখের দৃষ্টি এদিকে এসে পড়ল। রূপার অবস্থা তখন ভাল নয়। লাল টুকটুকে হয়ে গেল মুখটা। বুকটা আবার ধড়াস ধড়াস করছিল।

আর অন্যদের মুখ? আড়চোখে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে সে বুঝতে পারছিল কেমন যেন কাগজের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সব ক'টি মেয়ে, যেন তাদের সব উৎসাহ চলে গেছে। যেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে তারা সুন্দর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ছেড়ে উত্তর মেরুর কর্কশ আবহাওয়ায় চলে এসে ঠকঠক করে কাঁপছে। তাদের দেখে অন্তত রূপার তাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু পরমুহূর্তে যখন আবার সে চোখ তুলল তার ধারণা উল্টে গেল। ইতিমধ্যে মোহনলাল এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। যেন তার হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে খাবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হাত বাড়িয়ে

দিয়েছে। আর তার ডাইনে বাঁয়ে আগে পিছনে সব কটি মেয়ে এমন কটমট করে দেখছে, যেন চোখের পাতা দিয়ে একসঙ্গে সবাই তাকে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত।···ব্যাপারটা যে কী হচ্ছিল রূপা বুঝতে পারছিল না। তার মাথার ভিতর কেমন যেন এক ঝাঁক পোকা শব্দ করছিল।

ইচ্ছা করে রূপা হাত ধরতে দিল না। মোহনলালও আর চেষ্টা করল না। কিন্তু না করলে হবে কি, রূপা ঠিক মোহনলালের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে ভিতর দিকের প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

প্রকাণ্ড টেবিলে এত ডিশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারি সারি কাচের গেলাসে জল। মাথার ওপর ছুটো পাখা ঘুরছে। গাছের পাকা ফলের মতন মীনাক্ষীর সখীরা টুপ টাপ করে এক একটা চেয়ারে বসে পড়ছিল। রূপা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বোসো, মোহনলাল তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'এই চেয়ারটায় তুমি বোসো।'

আশ্চর্য, যেন রূপার নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। যেন অন্য কেউ তাকে চালাচ্ছে। একটি পুতুলের মতন সে বসে পড়ল, মোহনলাল খুশি হয়ে পাশের চেয়ারটায় বসল।

ঠিক এই সময় রূপা একবার চোখ তুলে মীনাক্ষীকে দেখল। অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে, এতক্ষণ তো মীনাক্ষীকে সে দেখতে পায়নি, অথচ মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গেই আছে। আবার তার পাশেই সে বসেছিল। খাবার টেবিলেও সে তার এপাশের একটা চেয়ারে বসেছে। মীনাক্ষীকে দেখে রূপা খুশি হল কতকটা নিশ্চিন্ত হল। মীনাক্ষীর চোখে সে আগুনও দেখল না, আতঙ্কও দেখল না। ঠোঁট টিপে টিপে মেয়েটি হাসছে।

মীনাক্ষীর মা কাকীমা ছু'জনেই খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। রূপার দিকে চোখ রেখে তারাও মিটিমিটি হাসছে।

'খাও রূপা। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।'

মোহনলাল গোগ্রাসে গিলছে।

'খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করলেই ঠকতে হয়।' রূপাকে উদ্দেশ্য করেই যে মোহনলাল কথাটা বলল সকলেই বুঝল।

শুনে মীনাক্ষী হাসল। তার মা কাকীমাও হাসল কিন্তু বাকি মেয়েরা চুপ করে রইলো। তাদের এক একটি মুখ হাঁড়ির মতন হয়ে আছে। আর ঐ মুখ নিয়ে তারা লুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। রূপার একটু হাসি পেল।

রূপা এটা বুঝতে পারছিল, মোহনদার জন্মদিনের পার্টিটা যেন তাকে নিয়েই। যেন আর একটি মেয়েও যদি সেখানে উপস্থিত না থাকত তো মীনাক্ষী কি তার মা কাকীমার কিছু এসে যেত না। রূপাকে পেয়েই তারা খুশি হত। যেন এখানে রূপাই সব।

অন্য সঙ্গীদের মত রূপার মনে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কোন সন্দেহ নেই।

তবে লজ্জাটা সে এক সময় কাটিয়ে উঠল। তারপর যেটা রইল সেটা নিতান্তই চক্ষুলজ্জা। তাই খেতে খেতে সে শ্যামলীর সঙ্গে স্নিগ্ধার সঙ্গে একটা দুটো কথা বলল।

খাওয়া শেষ হবার পর আর একটি মেয়েও রইল না, সবাই তক্ষুনি চলে গেল।

দেখাদেখি রূপাও বিদায় নিতে চাইছিল।

মোহনলাল বাধা দিল।

'আমি গাড়ি করে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।' হাতের ঘড়ি দেখল মোহনলাল। 'এখনো দশটা বাজেনি।'

শুনে মীনাক্ষী ঠোঁট টিপে হাসছিল, তার মা কাকীমাও হাসছিল।

নতুন করে রূপা লাল হয়ে উঠল।

আর তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই পার্টি। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রূপাকে এ বাড়ি আনা।

'এসো আমরা বাগানে যাই।'

এবার সত্যি মোহনলাল রূপার হাত ধরল। আশ্চর্য, রূপা কিন্তু বাধা দিতে পারল না। যেন মানুষটার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে, তাকে বাধা দিতে কষ্ট হয়। তার কথা ঠেলে ফেলতে কেমন লাগে।

'মীনাক্ষী তুইও আয়।' ঘাড় ফিরিয়ে রূপা ডাকল। মীনাক্ষী মাথা নাড়ল।

'আমি পরে যাচ্ছি। এদিকটা একটু গুছিয়ে নি। তুই মোহনদার সঙ্গে ততক্ষণ একটু খোলা বাতাসে গিয়ে দাঁড়া।'

রূপা বুঝল মীনাক্ষী এড়িয়ে গেল। যেন মীনাক্ষী চাইছে মোহনলালের সঙ্গে রূপা বাগানের অন্ধকারে গিয়ে বসুক।

কিছুটা অনিচ্ছা নিয়েই রূপা মোহনলালের সঙ্গে বাগানে গিয়ে বসল। মোহনলাল আবছা অন্ধকারে শুধু আলাপই করল না, আরও কিছুটা এগিয়ে গেল……

……গাড়িতে আরও একবার মোহনলাল চুমু খেল। ঠোঁটে না, গালে না,

রূপার দুটো চোখের ওপর। 'ব্রিলিয়ান্ট চোখ তোমার।' বাগানে যেমন রূপা বাধা দিতে পারেনি, গাড়িতে বসেও পারল না। তার সমস্ত শরীর কেমন শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

সুব্রতকে তার মনে পড়ল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তার কেবলই মনে হল, সুব্রত কত দুর্বল কত ভীরু। তারা বিয়ে করতে যাচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভাল মানুষ অধ্যাপক রূপাকে চুমু খেতেও সাহস পেল না।

এখনও ভাল করে তার হাত ধরতেই সে সাহস পায় না। ঐ একটু সঙ্গে নিয়ে বেড়ান, সিনেমা দেখা, চায়ের দোকানে বসে চা খাওয়া, গল্প করা, ব্যাস!

আর এই দুর্ধর্ষ পুরুষ একটা সন্ধ্যার মধ্যে রূপাকে যেন জয় করে ফেলল।

বয়স? প্রথমটা যেন তাই বাধা হয়েছিল। কিন্তু পরে রূপা দেখল বয়সটা তার চামড়ার, চুলের, আসলে মোহনলাল বাইশ বছরের একটি যুবকের মতনই তরুণ চঞ্চল।

তখন বাগানে একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে রূপার চুলে গুঁজে দিয়েছিল। 'গোলাপের চেয়েও সুন্দর তুমি—তাই এই গোলাপ তোমাকে উপহার দিলাম।'

শুনে রূপার শরীর কেমন সিরসির করছিল। সে না হেসে পারেনি।

'আপনি তো আগে শুধু আমার চোখের প্রশংসা করেছিলেন।'

'ঐ তো, যার চোখ সুন্দর তার সব সুন্দর। চোখ হল মনের মুকুর, চোখ হল মুখের জানালা। চোখ সুন্দর হলে মানুষটার সব কিছুই সুন্দর হয়।'

এভাবে ক'টা পুরুষ কথা বলতে পারে রূপার জানা ছিল না। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। অথচ সুব্রতও তো কলেজে কীটস্ শেলী বায়রণ পড়ায়। রাতদিন কাব্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু এমন সুন্দর করে রূপাকে কোনদিন কিছু বলতে পেরেছে কি!

কোনদিনই সে পারবে না।

অথচ রূপা তাকে ভালোবেসেছিল।

আর এই যে মীনাক্ষীর মোহনদা। দেখতে কেমন কাঠখোট্টা। সারাজীবন কুলি খাটিয়ে এসেছে। দেখলে মনেও হয় না ভিতরে এক ফোঁটা রস আছে। তার ওপর এত বয়স।

কাজেই মানুষটাকে দেখে রূপার মত মেয়ে প্রেমে পড়বে, এ কথা লোকে শুনলে হাসতে পারে।

অথচ আশ্চর্য, মানুষটাকে তার ভাল লাগল। যেন রূপার সব ইচ্ছা, ভাবনা বাসনা মানুষটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিল।

এইজন্যেই লোকে বলে ভালবাসা কেড়ে নিতে হয়, লুঠ করে নিতে হয়।

সুব্রত যা কোনদিনই পারবে না।

রূপা নিজে থেকে যতটুকু দিয়েছে, তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। জোর করে কিছু আদায় করা তাকে দিয়ে কোনদিনই হত না।

গাড়িতে বসেই ঠিক হয়ে গেল।

অচিনপুর বেড়াতে যাবে রূপা। মোহনলালের আশ্রমটা দেখে আসবে।

'সন্ন্যাসীর আশ্রম। দেখবার কী আছে।' রূপা হেসে উত্তর দিয়েছিল।

গম্ভীর হয়ে মোহন বলেছিল, 'আশ্রম তোমাকে দেখবে—হল তো ?'

'আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।' রূপা একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

'কথা তো তোমার অস্ত্র না—তোমার অস্ত্র ওইখানে। মোটা আঙ্গুলটা রূপার শরীরের দিকে তুলে ধরে মোহনলাল নিঃশব্দে হেসেছিল।

ওফ্, কী ভয়ংকর পুরুষ ! মনে মনে বলেছিল রূপা। গাড়ির অন্ধকারে বসে লাল হয়ে উঠেছিল সে।

সব শুনে হেমনলিনা হতভম্ব।

'সত্যি বলছিস ?'

'হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ,' একটানে রূপা খোঁপাটা খুলে ফেলল। ভীষণ গরম লাগছিল তার। 'একেবারে আমাদের দোরগোড়ায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।'

ফ্যাল ফ্যাল করে আবার একটু সময় মেয়ের মুখটা দেখে হেমনলিনী বলল, 'আমায় একবার ডাকলি না, এতবড় মানুষটাকে একটু চোখে দেখে নিতাম।'

'ধ্যাত্, এভাবে ডাকা যায় নাকি'—রূপা শাড়ি জামা ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'ইচ্ছে হল একবার ঘরে এনে বসাই, কিন্তু কোথায় এসে বসবেন উনি, এই তো ঘরের চেহারা, একটা ভাল চেয়ার পর্যন্ত নেই।

রূপার মা বলল—

'আমিও শুনেছি, একটা গাড়ির শব্দ। কিন্তু ভেবেছিলাম, হয়তো পাশের বাড়িতে কেউ এল। মানুষটা যে একেবারে নিজে গাড়ি করে তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে—'।

ময়লা শাড়িটা শরীরে পেঁচিয়ে নিয়ে ভাল কাপড় জামাটা আলনায় তুলে রাখল রূপা।

'জান মা, আমায় বলল অচিনপুরে বেড়াতে যেতে।'

হেমনলিনীর চোখ গোল হয়ে উঠল।

'তুই কি বললি?'

'কি আর বলব, তোমাকে জিজ্ঞেস না করে কি কোথায় আমার পা বাড়াবার জো আছে।'

'কী বোকা, কী বোকা! এতবড় একটা মানুষ তোকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে—এখানে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করা কি, তুই কি জানিস না এমন সব জায়গায় তুই যত বেশি যাস্, আমি খুশি হই—'?

রূপা চুপ করে রইল।

'কালই ফোন করে দে—বলবি আমার মার কোন আপত্তি নেই, আমি যে কোনো্ দিন যেতে রাজি আছি।' রূপার মা একটু থামল, তারপর আবার বলল, 'না কি এখনই একবার রিং করে দেখবি?'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' রূপা ভুরু কুঁচকোল। 'রাত বারোটা বাজে। ভদ্রলোক হয়তো এখন বাড়ি গিয়ে শুয়েটুয়ে পড়েছে।

'তবে কাল সকালে উঠেই ফোন করে দিবি। মীনাক্ষীদের বাড়ির ফোন নাম্বারটা তোর নোট বইয়ে আছে না?'

'হু।'

'তুই ভুল করেছিস, বলামাত্র তোর রাজী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এসব চান্স্ এলে না করতে আছে।'

এবার রূপা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

'তুমি এমন করছ—ভদ্রলোকের এখন কত বয়স হয়েছে বলো তো?'

'তা আমি কি করে বলব। আমি কি মানুষটাকে চোখে দেখেছি!'

'পঞ্চাশ, তার এদিকে নয়।'

বয়সের কথায় হেমনলিনীর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হাসল। 'পঞ্চাশ! পুরুষের আবার পঞ্চাশ একটা বয়স নাকি! তুই এমন বল্লি ভাবলাম আশি-টাসি বুঝি পেরিয়ে গেছে।'

রূপা আবার বলল, একেবারে সন্ন্যাসীর মতন জীবন, বিয়ে থা করেনি, নিরামিষ খায়, বাড়িটাকেও আশ্রমের মত করে ফেলেছে।' মার চোখ দুটো দেখতে দেখতে রূপা কি যেন ভাবল, তারপর চোখ ঘুরিয়ে হাসল। 'কাজেই তুমি মনে মনে যা আশা করছ আমার তো মনে হয় কোনোদিনও তা হবে না।'

'তাই তো বলি, কবে যে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে। পঁচিশ বছরের ঢেঁকি হতে চললি। শোন—তীর্যক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকাল হেমনলিনী। 'খুব তো বললি সন্ন্যাসীর জীবন—কিন্তু ঐ বয়সের একটা পুরুষ কখন সন্ন্যাসী হয়? হলেও কেন হয় বলতে পারিস?'

'আমি কি করে বলব। আমি সন্ন্যাসীটন্ন্যাসী কিছু দেখেছি কোনোদিন, তুমি বরং বাবার সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন বেড়াতে গিয়েছিলে, তুমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছ—তুমি বলতে পার।'

'তাই তো' হেম মাথা ঝাঁকাল। আমি বলতে পারি। সন্ন্যাসী অনেক রকমের আছে, বুঝলি, যে মানুষটির কথা বলছিস, এখনো নাকি বিয়ে-টিয়ে করল না—আমার তো মনে হয় মনের মতন, যাকে বলে চোখে লাগার মতন আজ অবধি কোনো মেয়ের দেখা পেল না বলে।

'তাই নাকি।' রূপা হি-হি করে হাসল। বেশ, 'মীনাক্ষীর সঙ্গে একদিন দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।'

হেম উষ্ণ হয়ে উঠল।

'মীনাক্ষী কী করে বুঝবে? একটা পুরুষের মনের খবর ও কতটা জানবে! তাছাড়া সম্পর্কে তো মামাতো ভাই, কাছেও থাকে না, কালেভদ্রে তো একবার ওদের বাড়ি আসে—উঁহু, কবে মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হবে আর তুমি সব কথা জিজ্ঞেস করবে—কিসসু দরকার নেই এসবের। যা বলছি শোন্, কাল ঘুম থেকে উঠেই একটা ফোন করে দে।'

'তেমন জানাশোনা নেই, একলা একটা অপরিচিত জায়গায় যাওয়া আমার সাহসে হয় নাকি।' ইচ্ছা করে রূপা নিচের ঠোঁটটা ফুলিয়ে দিল।

'আহা, এখনো জানাশোনার বাকি রইল, মানুষটা নিজে গাড়ি করে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, একসঙ্গে বাগানে বেড়ালি, একসঙ্গে বসে খেলি—আর এমন কি অপরিচিত জায়গা, বলছিস তো ব্যারাকপুরের কাছে, তুই আফ্রিকার জঙ্গলে যাচ্ছিস নাকি যে ভয় করবে।'

এবার রূপা ভিতরে ভিতরে খুশি হল।

'শোন, আমি ভদ্রলোককে বলেছি—যে মা হয়তো গররাজি হবেন না, তবে আমার সঙ্গে মীনাক্ষী বা কেউ যদি যায় তবে ভাল হয়'।

'শুনে কী বলল ভদ্রলোক?'

'ও বাড়ির কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে যাক ওঁর ইচ্ছে নেই।'

'তারপর?' হেম আবার একটা ঢোক গিলল।

'বলেছে, ওদের কেউ থাকবে না। কেবল তুমি থাকবে। তবেই আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করা যাবে। একটু সময় চুপ থেকে পরে আবার বলল, বেশ তো, না হয় তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে চল, উনিও বেড়িয়ে আসবেন।'

'বললেন একথা!' হেমের চোখ চকচকে হয়ে উঠল। 'তুই কী বললি তখন?'

'বললাম, মাকে জিজ্ঞেস করব।'

'তুই কাল ঘুম থেকে উঠেই ফোন করে দে। মা আমার সঙ্গে যাবে। হুঁ, এই ব্যবস্থাই ভাল হবে। সব দিকেই সুন্দর হবে।' যেন হেমের গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগল। যেন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা হল তার।' 'মানে ভদ্রলোক এইজন্য বলেছে, আর কোনো মেয়েটেয়ে সেখানে না যায়। একলা তোকে নিয়ে বেড়াবে-টেড়াবে—আর আমি বুড়ো মানুষ, একধারে পড়ে থাকব—অথচ আমি সঙ্গে গেলে তোর মনে একটু সাহসও থাকবে। হুঁ, মানুষটার মাথা আছে। বোঝা যায় সব দিক খেয়াল রেখে চলে।'

রূপা মনে মনে বলল, তুমি বুড়ি না আরো কিছু, কচিখুকিরও বাড়া।

'হ্যাঁ, কতকাল কোথায় বেড়াতে যাওয়া হয় না রে রূপা, আমার যে কী ভাল লাগবে!'

সে তো আমি বুঝতেই পারি, রূপা নিজের মনে হাসল।

'কিন্তু সুব্রতকে কী বলব, ধর কাল দুপুরের ট্রেনে যদি আমাদের যাওয়া হয়, সেরকম আভাসই দিলেন ভদ্রলোক, কাল শনিবার। সকাল সকাল কলেজ ছুটি হয়ে যাবে। সুব্রত হয়তো দুপুরে এসে হাজির হবে।'

যেন হঠাৎ একটা হোঁচট খেল হেমনলিনী, যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে মেয়ের মুখটা দেখল। তারপর ভুরু কুঁচকোল।

'বলবি মাকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি—'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইবে যখন?'

'আমরা দিল্লী যাচ্ছি, আমরা আফ্রিকা বেড়াতে যাচ্ছি, আমরা মা মেয়ে ভিয়েতনামের লড়াই দেখতে যাচ্ছি, সুব্রত জানতে চাইবে—'

দাঁত কিড়মিড় করে উঠল হেমনলিনীর। কেন অতসত ওর জানবার দরকারটা কী শুনি?'

'আহা, ওর নাম শুনলে এমন রেগেমেগে যাও কেন তুমি—'

কিন্তু হেম আজ একটু বেশি রেগে গেল, যেন সে বুঝতে পেরেছে, মেয়ের ঝোঁক এখন কোন্‌দিকে, তাই সুযোগ পেয়ে বেশ ভাল করে নাক সিঁটকাতে ভুরুকুঁচকোতে সে আর ভয় পেলে না।

হ্যাঁ, আমি ওই ছোঁড়াকে দু' চোখে দেখতে পারি না, এতটা আস্কারা ওকে দেওয়া তোর উচিত হয়নি। ভারি তো একটা কলেজের মাস্টার কী বা তার ভবিষ্যৎ! কতটুকুই বা ক্ষমতা।'

'আহা, আস্কারা দিচ্ছে কে—একসঙ্গে কলেজে পড়তাম তাই আগে যেমন আসছিল, এখনো আসে।'

'বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে আসা—পরিষ্কার বলে দে, এখানে তোমার কোনো আশাই নেই।' একটু থেমে থেকে হেমনলিনী আবার বলল, 'তুই কাল সকালে মীনাক্ষীদের বাড়ি ভদ্রলোককে ফোন করে জানিয়ে দে, আমরা দুপুরের আগে তৈরি হয়ে থাকব। আর ওদিকে ওই সুব্রত ছোঁড়াকে আমি সকালেই টেলিফোন করে বলে দেব, আমরা বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি, ঘরে তালা দিয়ে যাচ্ছি। তোকে কিছু বলতে হবে না—কেমন ভাল হবে না?

রূপা অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল।

'তুই কি আর কিছু খাবি?'

'পাগল এত খেয়ে এসেছি ওবাড়ি—তুমি খেয়ে নাও।'

'আমার খাওয়া হয়ে গেছে'—হেম দাঁত বের করে হাসল। 'জানি তো, বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে গেছিস, ভালমন্দ অনেক কিছু খেতে দেবে তোদের।

কথা না বলে রূপা বিছানায় উঠে পড়ল। দোরে খিল এঁটে হেমনলিনী আলো নিভিয়ে দিল।

ট্রেনে চাপতে হল না, ট্যাক্সি করে মোহনলাল মা ও মেয়েকে অচিনপুরে নিয়ে এল।

আহা, কী আকাশ! কী বাতাস! গাছপালার কী আশ্চর্য সবুজ রং!

রূপা মোহনলালের সঙ্গে কথা বলছিল। আর হেমনলিনী চুপ করে গ্রামের শোভা দেখছিল।

আসবার সময় সারা রাস্তা গাড়ির জানালায় চোখ রেখে মাঠ বন পাখি দেখেছে হেমনলিনী কেননা সারাক্ষণই রূপার সঙ্গে মোহন পিট পিট করে কথা বলছিল। অথচ হেমনলিনী মেয়ের পাশেই বসা ছিল। কিন্তু একটা কথাও তার কানে আসেনি।

তাই হয়। হেম তখন নিজের মনে হেসেছে। বুঝতে দেব না মনে করে দু'জন যদি একটা বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তৃতীয় ব্যক্তির সাধ্য নেই তার

এক বর্ণ কান পেতে শোনে। অবশ্য শুনতে চেষ্টাও করেনি হেম। মেয়ের সঙ্গে আসতে পেরেছে এই যথেষ্ট, তাতেই সে খুশি।

মোহনলাল রূপাকে নিয়ে কথায় মেতে ছিল ঠিকই কিন্তু মাঝে মধ্যে সে ঘাড় ফিরিয়ে রূপার মাকে না দেখছিল তা নয়। আঁটসাট গড়ন মহিলার। বয়স যতই হোক না, এমন সেজেগুজে চলেছে, বয়সটা মোটেই বোঝা যায় না। যেন সাজগোজের দিক থেকে মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে মহিলাটি অভ্যস্ত। মেয়ের মতন খোঁপা করেছে, সেভাবে ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে, গাল দুটোও যেন একটু রং করেছে।

যেহেতু রূপার মা, গুরুস্থানীয়া, গোড়া থেকেই মানুষটাকে সমীহ করে চলছিল মোহন।

দুটো স্যুটকেশ নিয়ে এসেছে তারা।

বিছানা-টিছানা আনতে মোহনই বারণ করেছে। তার বাড়িতে অতিরিক্ত বিছানা আছে।

ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতে মোহন আগে গাড়ি থেকে নামল, তারপর রূপা। রূপার মা নামল সকলের পরে।

বাড়ির চেহারা দেখে রূপার মার চোখের পলক পড়ছিল না। আশ্রমই বটে। চারিদিক ফুলের বাগান, কত রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে বাগান জুড়ে।

ভিতরের উঠোনটা আরও সুন্দর।

গাড়ির শব্দ পেয়ে চার-পাঁচটা মেয়ে উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে।

অবাক চোখে তারা নতুন মানুষ দুটিকে দেখছিল। যেন মানুষ দেখার চেয়ে মানুষ দুটির চুল বাঁধার নমুনা, শাড়ি জামা পরার ঢংটাই বেশি করে দেখছিল।

চাকর এসে স্যুটকেস দুটো তুলে ঘরে নিয়ে গেল।

'এদের কিন্তু চিনতে পারলাম না। হেমনলিনী মোহনলালের দিকে চোখ আড় করে তাকাল। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে মুখ ঢাকা দিয়ে হাসি গোপন করছিল। যেন তারা লজ্জা পেয়েছে। একটি দুটি মেয়ের মুখ লাল হয়ে উঠতেও দেখা গেল।

'এরা আমার আশ্রমে থাকে।' মোহন বলল 'আমার এখানে তো নানারকম কাজ হয়। তাঁতের কাজ, সূঁচের কাজ, পুতুল তৈরি, আরো মেয়ে আছে, পুতুলের ডিপার্টমেণ্ট আজ ছুটি, কাজেই অনেকে এদিক ওদিক বেড়াতে গেছে।' 'চমৎকার তো।' হেম চোখ বড় করে আশ্রমবাসিনীদের আর একবার দেখল।

রূপার তখনই ইচ্ছা করেছিল একটি দুটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে। যেন তারাও সতৃষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল কথা বলার জন্য।

তবে কেমন হাসি পাচ্ছিল। গাঁয়ের মেয়ে, তাই এমন সাজ-পোষাক, চিন্তা করে হাসিটা সে দমন করল। একটু বেশি বয়স যে দুটি মেয়ের এবং রূপার মার বয়সের যে স্ত্রীলোকটি তাদের কারো গায়ে জামাও নেই। তা বলে অশোভনতা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে রেখেছে। সকলেরই খালি পা। রূপা ভাবল। অসহায় অবস্থায় আছে বলে আশ্রমে চলে এসেছে। হাতের কাজ করছে। হয়তো খাওয়া পরাটাও আশ্রম থেকেই পাচ্ছে।

'এঁরা কলকাতা থেকে আশ্রম দেখতে এসেছেন।' মোহনলাল ওদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'কদিন এখানে থাকবেন, তোমাদের হাতের কাজও দেখবেন।'

'খুব আনন্দের কথা।' বয়স্কা স্ত্রীলোকটি প্রথম হেসে কথা বলল। মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেছে দেখে দু' হাত তুলে রূপার মা ও রূপাকে নমস্কার জানাল। দেখাদেখি 'অন্য মেয়েরাও দু' হাত একত্র করে চিবুকের কাছে ঠেকাল।

হেমনলিনী ও রূপা শুধু মাথা নেড়ে পাল্টা নমস্কার জানাবার ভঙ্গি করল।

মোহনলাল ঘাড় নেড়ে দু'টি মেয়েকে কাছে ডাকল।

'কাজল ও মালা, তোমরা দু'জনে এদিকে এসো। এঁদের ঘরটা একটু গুছিয়ে দেবে।'

কাজল ও মালা লাজুক হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দুটিই রূপার বয়সী। মোহনলাল সকলকে নিয়ে একটা ঘরে উঠে গেল।

আশ্রমবাসিনীরা কেউ উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল না। যে যার কাজে চলে গেল।

ঘরের ভিতরটা সুন্দর। খাট টেবিল আলনা সবই রয়েছে। বড় বড় জানালা।

'এখানে তো ইলেকট্রিক নেই।' মোহনলাল হেমনলিনীর দিকে চোখ রেখে অল্প হাসল। 'কাজেই আলো পাখার অভাবটা আপনাদের সয়ে নিতে হবে। কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু……' যেন নিরুপায় হয়ে মোহন থেমে গেল।

'আহা, সে একটা কথা হল!' হেমনলিনী যতবার মোহনলালের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে ততবারই একটু ভ্রূ-ভঙ্গি করেছে। দেখে রূপার এত খারাপ লাগছিল। পুরুষ দেখলেই মা নেচে ওঠে। গোড়ায় সুব্রতকে দেখলে পর্যন্ত এমন করত। কিন্তু সুব্রত বেজায় নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। একবারও হেমনলিনীর চোখের দিকে তাকাত না, তাকাতেই পারত না। যেন বিশেষ

করে সেই থেকে হেম তার ওপর খাপ্পা। মোহনলালের চোখে চোখ রেখে ঠিক একটি বাচ্চা মেয়ের মতন ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে হেম বলছিল, 'সারা গাঁয়ে ইলেকট্রিক পাখা নেই, আলো নেই, সে তো আমরা জেনে শুনেই এসেছি—না-ই বা থাকল পাখা, না-ই বা রইল আলো, এমন সুন্দর ঘর, চার-দিক এত খোলামেলা, এতেই তো প্রাণ ভরে যায়।'

শুনে মোহনলাল খুশি হল।

মালা ও কাজল ধরাধরি করে সুটকেট দুটো একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর তুলে রাখল। খাটটা ঝেড়ে একটা তোলা বিছানা টেনে নামিয়ে সুন্দর করে পেতে দিল।

ড্রেসিং টেবিলে চিরুনি পাউডার তেল স্নো ক্রিম সবই ছিল।

মালা ও কাজল জিনিসগুলি একটু গুছিয়ে দিল মাত্র।

মোহনলাল এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে কাদের যেন ডাকাডাকি করছিল। যেন মাছ দুধের কথা বলছিল। বাড়িতে অতিথি এসেছে। রান্না-বান্না নিয়ে কাকে যেন এটা ওটা পরামর্শ দিচ্ছিল।

সব গুছানো হয়ে যাবার পর মালা ও কাজল হেসে বিদায় নিল। যাবার সময় বলে গেল, 'কিছুর দরকার হলে ডাকবেন, আমরা এখানেই আছি।'

রূপার দিকে তাকিয়ে ওরা কথা বলছিল।

'আচ্ছা।' রূপাও হেসে ঘাড় কাত করছিল।

ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। কলকাতার বাড়ির মতন। তবে এখানে তোলা জল। তোয়ালে সাবান সবই হাতের কাছে রয়েছে। চমৎকার ব্যবস্থা।

মা মেয়ে দু'জনে মুখ হাত ধুয়ে এসে রাস্তার পোষাক ছেড়ে নতুন করে শাড়ি ব্লাউজ পরল। নতুন করে চুল বাঁধল, এবং প্রসাধনও সেরে নিল।

হেম এত বেশি মুখে পাউডার স্নো মাখল এবং রুজ ঘসে গাল দুটো এমন টুকটুকে লাল করল, রূপা না হেসে পারল না।

ইস্, তুমি কি আরম্ভ করেছ মা, মাগনা পেয়ে কৌটো একদিনেই খালি করে ফেললে।'

'কেন?' বাঁকা চোখে হেম মেয়ের দিকে তাকাল। কী এমন বেশি আমি মাখছি, রাস্তার গরমে ধুলোতে মুখের যা হাল হয়েছিল।।

'যাই বলো, তোমার বয়সে ঠোঁটের গালের এমন কড়া রং মানায় না।

'এই জন্যই তো বলি, তুই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু, পেটে ধরেছিলাম কিনা, আমার সাজ গোজ আবার মুখের রং তুই সব সময়েই বেশি দেখিস। আমি একটু সাজতে দেখলেই তোর চোখ টাটায়।'

'আহা, বলছি কি বয়স বলে একটা জিনিস আছে তো।' রূপা না বলে পারল না।

এবার হেমনলিনী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

'কী এমন আমি বুড়ি হয়ে গেছি শুনি? তোর চোখেই আমি বুড়ি, আমার এমন কি বয়স হয়েছে যে আমি একটা ভাল শাড়ি পরব না একটা ব্লাউজ গায়ে দেব না, একটু ঠোটে রং লাগাব না?' একটু থেমে হেম আবার বলল, 'আমি মনে করি আমার দিন এখনো শেষ হয়নি। রাস্তায় বেরোলে পাঁচটা পুরুষ যদি তোর দিকে চোখ তুলে তাকায় তবে আমার দিকেও তাকাবে।'

রূপা আর কিছু বলল না। মার সাজগোজের শখ চিরদিনই। কিন্তু এখানে আসতে না আসতে জিনিসটা এমন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কেন রূপা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

সুটকেশ হাতড়ে রূপার সবচেয়ে চড়া রঙের একটা শাড়ি বের করে পরেছে হেম।

অবশ্য এখানে আসার আগে এভাবেই কথা হয়ে আছে। হেমের দু'চারখানা ভাল শাড়ি জামা আছে ঠিকই। রকমারী ডিজাইনের বেশ ক' খানা শাড়ি ব্লাউজ রয়েছে রূপার। চাকরি করতে আরম্ভ করে রূপা পছন্দ করে নিজের টাকায় এসব কিনেছে। একদিনে না। দু'মাস চার মাস অন্তর একখানা দু'খানা করে কিনতে কিনতে সংখ্যাটা এখন বেড়ে গেছে। হেমের তো আর এদিকে কিছুই প্রায় কেনা হয়নি। স্বামী থাকতে যা কিছু করা হয়েছিল। তাও তো শেষ দিকে রূপার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আয়টায় যখন কমে গেল তখন কেনাকাটা একরকম শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তাই কাল রাত্রেই হেম বলে রেখেছিল, 'নতুন জায়গায় যাচ্ছি, দরকার হলে একখানা দু'খানা শাড়ি ব্লাউজ আমাকে পরতে দিস্ কিন্তু। আর আমার যেটা যেটা তোর পছন্দ হয় পরবি।

রূপা আপত্তি করেনি।

কাজেই দুটো সুটকেসের মধ্যে দু'জনের শাড়ি ব্লাউজ সায়া মিশিয়ে রাখা হয়েছে। এটা মেয়ের বাক্স ওটা মার বাক্স—এখানে এসে সে ধরনের বাঁধাবাঁধি কিছু নিয়ম রাখা হয়নি।

এতে হেমেরই সুবিধা হয়েছে।

আসবার সময় যেমন রূপার ক্যালিকো প্রিন্ট্‌টা পরেছিল, এখন দেখা গেল,

ওটা ছেড়ে ফেলে দুটো স্যুটকেস ঘেঁটে ঘেঁটে হেম রূপার সবচেয়ে সুন্দর ডিজাইনের ঔরঙ্গবাদীটা বের করে পরল।

হেমের নিজের যে দু'চারখানা কাপড় আছে, সেগুলি দামী ঠিকই, কিন্তু বড্ড সেকেলে, আজকাল আর পরা চলে না। কেবল ঐ নাইলন জর্জেটটা ছাড়া। যেটা পরে রূপা মীনাক্ষীদের বাড়ির পার্টিতে গিয়েছিল। কিন্তু মোহনলালের সামনে আবার সেটা পরতে রূপার ইচ্ছা হল না।

নিরুপায় হয়ে সে নিজের একটা মাদ্রাজী হ্যাণ্ডলুম পরেছে।

ইতিমধ্যে মোহনলাল এসে ঘরে ঢুকল। মোহনলালও পোষাক বদলে এসেছে। সিল্কের পায়জামা হাওয়াই সার্ট গায়ে। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। সন্ন্যাসী না, কেমন যেন সিনেমার বয়স্ক নায়ক নায়ক মনে হচ্ছে এখন তাকে।

'একটা কথা মিসেস সেনকে জিজ্ঞেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।'

'সেকি, মনে করার আছে কী।' গাল ছড়িয়ে হেম হাসল। 'একটা কেন, অনেক কথা জিজ্ঞেস করুন। আমি সব কথার উত্তর দেব।'

খুশি হয়ে মোহনলাল একটু হাসল।

'আপনার জন্য কি আতপ চালটালের ব্যবস্থা করব—?'

'না-না হেম মাথা ঝাঁকাল।' কিচ্ছু দরকার নেই। আমার সব চলে। ক'দিন লো-প্রেসারে খুব ভুগছিলাম তো। ডাক্তার আমায় সব খেতে বলেছে।'

'মাছ?'

'হুঁ, মাছ মাংস ডিম কিছুই এখন আর বাদ দিচ্ছি না।' হেমনলিনী দারুণ একটা ভ্রূভঙ্গি করল।

মোহনলাল নিশ্চিন্ত হল। যেন তৃপ্তিই পেল কথাটা শুনে।

'আমার নিজের দীঘি থেকে জেলেরা এই মাত্র একটা প্রকাণ্ড রুই ধরেছে—তাই ভাবলাম একবার আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আজকাল অনেকেই—'

হেমের জিভে যেন তখনি জল এসে গেল।

'তাই নাকি, মাছটা দেখতে হয় তো।'

'আসুন, আমার রান্নার জায়গাটাও দেখবেন। রূপা এসো।'

রূপা এতক্ষণ জানালার কাছে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে মার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। অবশ্য এসব তার মুখস্ত। বাবা মারা যাওয়ার পর দু' এক বছর মা একটু নিয়ম টিয়ম মেনে চলেছিল। তারপর খাদ্যাখাদ্যের আর কোনো বাছবিচার রাখেনি। তা বাড়িতে যা-ই করুক, এখানে একটা নতুন জায়গায় এসে মহিলা এমন নির্লজ্জ লোভী হয়ে উঠবে, ঘেন্নায় রাগে রূপার শরীর রী রী করছিল!

মা ও মেয়েকে নিয়ে মোহনলাল ভিতরের উঠোন পার হয়ে ওপাশের একটা বাতাবী লেবুর ঝোপের পাশে এসে দাঁড়াল। মাছটা সেখানে কাটা হচ্ছিল। এমন জ্যান্ত মাছ, এত বড় রুই বুঝি হেম জীবনে দেখেনি।

একটু দূরেই রান্নাঘর।

মাছ দেখা শেষ করে হেম নিজে থেকেই রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল। রাঁধুনী বামুনকে একবার দেখল। মাছটা কেমন করে রান্না হবে এই নিয়ে যেন বামুনের সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল হেমের।

মোহনলাল বুঝতে পারল। হেম এদিকে চোখ ফেরাতে সে হেসে বলল, 'আপনি যদি দাঁড়িয়ে থেকে বামুনকে একটু বলে-টলে দেন। ঝাল ঝোল কি কি রান্না করতে হবে—'

'আমি কি রান্নার খুব একটা বুঝি—' হেম একটা লাজুক হাসি হাসল। বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে খুবই খুশি। 'আপনি যখন বলছেন তাই হবে, এমন ভাল রুই, পেটির মাছ দিয়ে ঝোল হবে, গাদার পিসগুলো দিয়ে ঝাল করলে ভাল হয়।

'এইজন্যই তো বলছি', হেমের চোখে চোখ রেখে মোহনলাল বড় বড় চোখ করে হাসল। 'আপনি কাছে থাকলে রান্না সুন্দর হবে। নয়তো বামুন পেটি গাদায় গুলিয়ে ফেলবে।'

রূপার দিকে চোখ পড়তে হেম একটু গর্বের সঙ্গে হাসল। এখানে পা দিতে না দিতে একটা সন্ধ্যার মধ্যে এতবড় একটা মানুষের সংসারে প্রায় কর্ত্রীর পদ পেয়ে যাচ্ছে—একি চারটিখানি কথা। মার চোখ দেখে তার মনের ভাবটা বুঝতে রূপার একটুও কষ্ট হল না।

কিন্তু মোহনলাল তখনি রূপার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলছিল, তুমি আমার সঙ্গে এসো রূপা, গয়লাকে দুধের কথাটা আর একবার বলে আসি। একটু বেড়িয়েও আসবে।'

কি ভেবে রূপা মুচকি হাসল। হেম বুঝি বেড়ানোর কথাটা শুনল না। তখনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। চাকর ততক্ষণে মাছ কেটেকুটে ধুয়ে এনেছে। হেম থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে মাছের গাদা পেটি বাছতে ভয়ংকর ব্যস্ত।

মাকে উদ্দেশ্য করে রূপা মনে মনে বলল, 'থাক তুমি মাছ নিয়ে রান্নাঘর নিয়ে।'

এতক্ষণ পর মোহনলালের সঙ্গে একলা হাঁটতে পেয়ে রূপার ভাল লাগছিল।

রূপা বুঝতে পারল, মোহনলাল কৌশল করে হেমনলিনীর কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে।

কিছুতেই রূপার কাছছাড়া হচ্ছিল না হেম! ফলে রূপার সঙ্গে কথাটথা বলতে মোহনের খুব অসুবিধা হচ্ছিল।

রূপাকে নিয়ে মোহনলাল যে গয়লাবাড়ি যাবে না এটা রূপা তখনি বুঝে গিয়েছিল।

বাগান পার হয়ে রূপাকে নিয়ে মোহনলাল সোজা দীঘির ধরে চলে এল। তখন মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। হাসনুহানা ফুটেছিল। ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে গেছে।

ঘাটের সিঁড়ির ওপর দু'জন বসল। বড় নিঃশব্দ নির্জন জায়গা। দীঘির কালো জলে একটা চাঁদ শত চাঁদ হয়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় খেলা করছিল।

রূপার একটা হাত কোলে টেনে নিয়ে মোহনলাল বলল, 'কেমন লাগছে জায়গাটা?'

'ভাল।' রূপা সংক্ষেপে উত্তর করল।

মোহনলাল বলল, 'আমার ইচ্ছে নয় তুমি আবার কলকাতায় ফিরে যাও।'

রূপা কথা বলল না। আহ্লাদে দু' চোখ বুজে আসছিল। তার কপালের একটা চুল সাপের বাচ্চার মতন বার বার ফণা তুলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

মোহন হাত দিয়ে চুলটা সরিয়ে দিল।

'আমার ইচ্ছা এই আশ্রমের ভার তুমি নিজের হাতে তুলে নাও।'

'এই জন্যই বুঝি কলকাতা থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ?' রূপা থুতনিটা তুলে মোহনলালের মুখের দিকে তাকাল।

মোহনলাল কথা বলল না। রূপার থুতনিটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে কচলাতে লাগল।

'কিন্তু এই আশ্রমের ভার যদি আমার হাতে তুলে দাও তখন কি এটা আর আশ্রম থাকবে?' রূপা ঠোঁট কুঁচকে হাসল।

মোহনলাল হাসল না। গম্ভীর হয়ে থেকে একটু সময় দীঘির কালো জলে চাঁদের ছায়া দেখল। তারপর এদিকে চোখ নামিয়ে আস্তে বলল, 'একটা মানুষ কখন সন্ন্যাসী হয়, কখন তার ঘরবাড়ি আশ্রমের চেহারা ধরে বলতে পার?'

'পারি বৈকি', রূপা আর হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'যতদিন পুরুষ মনের

মতন মেয়ের দেখা না পায়, যতদিন একজনকে গৃহিনী করে ঘরে বসাতে না পারে ততদিন সে ছন্নছাড়া বিবাগী সন্ন্যাসী, ততদিন ঘরের শূন্যতা আশ্রয় করে সে তরিয়ে রাখতে চায়।'

'যাক সহজে যে তুমি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ, আমার মনে সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল, এমন কচি বয়স তোমার, আর আমি এমন একটা ভারি বয়সে পৌছে গেছি, কি জানি, এই মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারবে কি না! মীনাক্ষীর টেবিলে গ্রুপ ফোটোর মধ্যে ওই সুন্দর চোখদুটো দেখবার পর সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।'

রূপা বলল, 'চুল চোখ চামড়া দেখে মেয়েরা পুরুষের বয়স বিচার করে না। তারা মন দেখে আসল বয়সটা ঠিক করে নেয়।'

'সেদিন থেকে আমি অবিশ্যি বাইশ বছরের যুবক। এখনো এক কেজি মাংস খেয়ে হজম করতে পারি। এই দীঘিটা চারবার সাঁতরে এপার ওপার হতে পারি। আর যদি মনের কথা বল—, মোহনলাল অল্প শব্দ করে হাসল, 'তোমার মতন একটি কচি মেয়ের চোখ দেখে আমার রাতের ঘুম আজও নষ্ট হয়।

আবেশে আনন্দে মোহনের হাঁটুর ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে রূপা জলের ছলছল শব্দ শুনতে লাগল।

এই পুরুষ যাদু জানে, মনে মনে সে বলল, এতকাল আমার যা ভাবনা চিন্তা ছিল, সব বদলে গেল। সুব্রতকে বিয়ে করব, সুব্রত কলেজে পড়ায় আমি স্কুলে পড়াই, দু'জনে ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আমাদের সুখের সংসার গড়ে তুলব। টাকাপয়সার দিক দিয়ে আমরা সুখী হব না, এই জীবনে আমাদের গাড়ি হবে না বাড়ি হবে না ফ্রীজ হবে না রেডিওগ্রাম হবে না। খেটে খাওয়া দুটি স্বামী স্ত্রী। সুব্রত ট্রামে-বাসে চড়ে কলেজে যাবে, আমিও ট্রামে-বাসে চড়েই কাজ সারব। আমাদের সুখ অন্য জায়গায়। আমাদের সুখ অন্তরের সম্পর্ক। বড়লোক আমরা দু'চোখে দেখতে পারি না। বড়লোক হতে না পারার দুঃখ আমাদের কোনদিনও থাকবে না।

কিন্তু আজ মোহনলাল আমার সমস্ত অতীত, পরশু পর্যন্ত সুব্রতর সঙ্গে এক চায়ের দোকানে বসে যা যা ভেবে রেখেছিলাম, যেমন যেমন প্ল্যান করেছিলাম, সব মিথ্যা করে দিল।

এতবড় একটা মানুষের ঘরণী হব আমি। কতবড় বাড়ি হবে আমার, শীগগীর আমি বলতে পারব, এই দীঘিটাও আমার, এই গাঁয়ের চৌদ্দ আনা জমি আমার। মীনাক্ষী তাই বলত না? একটা ট্র্যাক্টর আছে মোহনলালের,

গঙ্গার বুকে বেড়াবার জন্য একটা সুন্দর বোট আছে। মোহনলালের সঙ্গে আমি গঙ্গার বুকে বেড়াব। হয়তো এই বোটের মধ্যেই আমাদের হানিমুন হবে।

সুখের চিন্তায় বুঁদ হয়ে মোহনলালের কোলে মাথা রেখে আমি চোখ বুজে থাকলাম! হ্যারিসন রোডের একতলা ঘরে ফিরে যাওয়ার চিন্তাটাও যেন কষ্ট দিচ্ছিল।

একটু রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে।

রূপা দেখল হেমনলিনী তখনও রান্না ঘরে উনুনের ধারে বসে বামুন ঠাকুরের রান্নার তদারক করছে। পাকা রুই মাছ ভাজার গন্ধে বাড়ি মাত হয়ে গেছে।

কড়াইয়ের কাছে নাকটা বাড়িয়ে দিয়ে হেম প্রাণভরে মাছের গন্ধ শুঁকছে। উনুনের আঁচ লেগে রং করা ঠোঁট দুটো জলজ্বল করছে। বেছে বেছে পেট-কাটা একটা ব্লাউজ গায়ে চড়িয়েছে হেম চর্বির ভাঁজ পড়া পেটটাও আগুনের আভায় কেমন ফর্সা ধবধবে দেখাচ্ছে। তার ওপর গায়ে ঔরঙ্গাবাদী শাড়ি জড়িয়েছে। সুন্দর লাগছিল হেমকে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে হচ্ছিল মানুষ না, যেন অন্য একটা প্রাণী। মাছ মাংস খেতে খুব ভালবাসে। ভাল ভাল শাড়ি জামা পরতে তার কত না আগ্রহ। সুগন্ধ তেল স্নো ক্রিম পাউডার মাখতে পেলে পৃথিবীতে আর বুঝি কিছু চায় না।

মাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে রূপার মনে কেমন একটা অনুকম্পা জাগল। তাইতো রূপা তখন চিন্তা করল, মাছ মাংস শাড়ি ব্লাউজ সুগন্ধ তেল স্নো পাউডার ছাড়া এই জীবনে আর কী-ই বা কাম্য আছে হেমনলিনীর, এই বয়সে অন্য কী-ই বা সে আশা করতে পারে। আশা করলেই বা পাচ্ছে কোথায়।

রূপার মতন মোহনলালও চোখ আড় করে হেমনলিনীকে তখনও রান্নাঘরে বসা দেখে মিটিমিটি একটু হেসে নিল। তারপর রূপার হাত-ধরে বড় ঘরের বারান্দায় উঠে এল।

রূপার মতন মোহনলালও যে কলকাতার এই মহিলাটাকে ভিতরে ভিতরে কল্পনা করছিল, মোহনলালের চোখ দেখে রূপা টের পেল। অবশ্য এই নিয়ে সে কিছু বলল না। মাকে নিয়ে মোহনের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করতে রূপার লজ্জা করছিল।

নিতান্তই অপরিচিত জায়গা, এবং শত হলেও মোহনলাল নতুন মানুষ, রূপার পক্ষে একা একা আসাটা অশোভন দেখাত। কাজেই মাকে সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তা না হলে কোথায় হ্যারিসন রোডের একতলার স্যাঁতস্যাঁতে একটা খুপরিতে বসে এখন ধূসর চোখ দুটো জানালার বাইরে ধরে রেখে ট্রাম বাস দেখত। সুব্রতকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলে কোনো কোনোদিন ফিরতে রূপার

রাত হত। ততক্ষণ একলা ঘরে বসে তেলেভাজা মুড়ি খাওয়া সেরে হেম হাই তুলত আর, মনে মনে সুব্রতর মুণ্ডপাত করত।

কিন্তু আজ হেমের চেহারা বদলে গেছে। ধূসর চোখ কেমন কালো চকচকে হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় মোহনের বাড়ির যেন দুধের আশায় মোহনের পুকুরের পাকা রুই মাছের আশায় আর মোহনের ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই এত ক্রিম পাউডার স্নো তেলের শিশি হাতে ঠেকবে। তা ছাড়া যখন খুশি ইচ্ছা-মতন রূপার ভাল ভাল শাড়িও যখন তখন পরতে পারছে।

'কিন্তু এই সুখ তোমার ক'দিন থাকবে মা।' রূপা মনে মনে বলল, 'দু'দিন চারদিন, এক হপ্তা, বড় জোর একমাস—তা বলে বছর ভরা মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে এখানে পড়ে থাকবে তা তো হয় না, একদিন তোমাকে হ্যারিসন রোডের বাসায় ফিরে যেতেই হবে। তবে যে-ক'দিন এখানে আছ একটু সুখ করে নাও। আমি আপত্তি করব না।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হেমনলিনীর সে কী পরিতৃপ্তির চেহারা।

তার ওপর এমন ধবধবে বিছানা, এতবড় একটা খাট। জানালার বাইরে চোখ রাখলে তারা জ্বলা আকাশ চোখে পড়ে। মোহনলালের বাগান থেকে ভুরভুর করে এক রকমের ফুলের গন্ধ ঘরে এসে ঢুকছিল।

কাজল কাচের গেলাসে জল রেখে গেছে। এতগুলি বেলফুল এনে মালা মা ও মেয়ের বালিশের কাছে রেখে গেছে। এসব যে মোহনলালের নির্দেশমতন হচ্ছে রূপা ও হেম বুঝল।

বড়লোকের দৃষ্টিভঙ্গিই অন্যরকম।

জানলার দিকে মুখ রেখে হেম খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে বসে রূপার সঙ্গে কথা বলছিল। বোঝা যাচ্ছিল মাছ দিয়ে অতিরিক্ত ভাত খেয়ে হেম আলস্যের হাই তুলছে।

একটু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাজলের সঙ্গে রূপা কথা বলছিল। বড় ভাল মেয়ে। ভীষণ সরল। একটা সন্ধ্যার মধ্যে রূপাকে কেমন আপন করে নিতে চাইছে। কথাবার্তায় বোঝা গেল মেয়েটা এখানে খুবই নতুন এসেছে।

এই মাত্র ওকে বিদায় করে দিয়ে রূপা ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে লাগল।

হেম যেন ভাল করে তাকাতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল এখুনি ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসবে।

কিন্তু মোহনলালের জন্য সে অপেক্ষা করছিল। পাশের ঘরে আলো জ্বেলে মোহনলাল কি যেন হিসাবপত্র দেখছিল।

ছুটো ঘরই পাশাপাশি।

একটা ঘরে মা ও মেয়ের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাশেরটা বুঝি মোহন-লালের খাস কামরা। অথচ এমনও হতে পারে. এই ঘরেই মোহন থাকে, এখন রূপা ও রূপার মায়ের জন্য ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে সে পাশের ঘরে চলে গেছে।

রূপা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে খুলতে অন্য কথা ভাবছিল।

তিনজনেই একটা বড় টেবিলে এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দুধ মাছের দুরবস্থা, এখানকার চাষবাস ও অন্য জিনিস-পত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি নিয়ে হেমনলিনীর সঙ্গে মোহন অনেক কথা বলছিল। রূপা শুধু শুনে যাচ্ছিল। কিছু বলছিল না। তার আর তেমন অভিজ্ঞতা কী। দুজনের প্রায় অর্ধেক বয়স, কলকাতারই বা সে কতটা দেখেছে, আর পাড়া গাঁ সম্বন্ধে তার তো কোনো ধারণাই ছিল না। তবু মা প্রথম জীবনে গাঁয়ে টায়ে নাকি কিছুদিন ছিল।

এবার আলোচনার পর, তখন খাওয়া প্রায় শেষ, হেমের চোখের দিকে তাকিয়ে মোহন হাসিহাসি মুখে বলছিল, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে মিসেস সেন।'

'বলুন! হেম ভ্রূভঙ্গি করে হেসেছিল।

'বলব, বলব' মোহন এই সময় রূপার দিকে একবার চোখ রেখে মুচকি হেসেছিল। রূপা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। কেননা মার সঙ্গে জরুরী কথাটা যে কী তখনই সে বুঝে গিয়েছিল। এই নিয়ে একটু আগে দীঘির ঘাটে বসে মোহনের সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে শুভস্য শীঘ্রং। কাজটা যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় তত মঙ্গল। মোহন আজ রাত্রেই হেমনলিনীর কাছে প্রস্তাবটা তুলবে। এবং ব্যবস্থাটা তোলায় সঙ্গে সঙ্গে যে হেমনলিনী সেটা দু'-হাতে লুফে নেবে তা-ও রূপা জানত। তবু সে কেমন জানি হয়ে উঠল। শিক্ষিত আলোক প্রাপ্ত শহরের মেয়ে হলে হবে কি। বিয়ের নামে আর কুমারীর মতন তারও কেমন ইচ্ছা করছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় গুঁজে ভাতের থালার ওপর আঙুল ঘষতে আরম্ভ করল। 'খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করে নিন, আমি পরে বলব।' হাসতে হাসতে মোহন হেমকে বলছিল। 'আচ্ছা।' খুশি হয়ে হেম ঘাড় কাত করেছিল।

কিন্তু ঐ টুকুন কথায় হেম কি কিছু আঁচ করতে পেরেছিল। মার চেহারা দেখে রূপার মনে হয়েছিল মা তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। কত কি নিয়ে

জরুরী কথা থাকতে পারে—কিন্তু আজ এখানে পা দিতে না দিতেই রূপাকে বিয়ে করার প্রশ্নটা মোহন মার কানে তুলবে—না, এতটা হেম আশা করতে পারছিল না।

যাই হোক, হেমনলিনী এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন মোহন আসবে। ফিতেটা খুলে ফেলে চুলটা সারা পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে রূপা ওদিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌকাঠের কাছে চটির শব্দ হল। হেম ব্যস্ত হয়ে শোয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসল।

মোহন কিন্তু ঘরে ঢুকল না! পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল।

'মিসেস যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না না, সে কি, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আপনি দয়া করে একটু পাশের ঘরে আসবেন।'

'নিশ্চয়।' হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল।

পর্দার ওপারে মুখটা সরিয়ে নেবার আগে মোহন রূপার দিকে তাকাল। রূপাও তখন ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকিয়েছে। দু' জনের চোখাচোখি হল। মোহন আবার একটু মুচকি হাসল। রূপাও হাসল। হাসতে গিয়ে লাল হয়ে উঠল।

হেম তখন আঁচলটা ঠিক করতে ব্যস্ত ছিল। মোহন পর্দা ছেড়ে সরে গেল। হেম হাসিহাসি মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রূপা জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশের চাঁদটাকে দেখতে লাগল!

হেমনলিনী কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ওঘরে রইল। রূপা ছটফট করছিল। অবশ্য এমন একটা জরুরী বিষয়, কথা বলতে সময় লাগবে।

কে জানি বলেছিল, লাখ কথা মাটিতে না পড়লে বিয়ে হয় না।

এখানে অবশ্য লাখ কথা বলার দরকার পড়বে না। মোহনের প্রস্তাব শুনেই বেশ খুশি হয়ে ঘাড় কাত করবে।

তাহলেও তো নানারকম আচার অনুষ্ঠান আছে, লোককে খাওয়ান দাওয়ানর প্রশ্ন আছে, কোন্ পক্ষের কত আত্মীয়স্বজন আছে এবং তাদের কাকে কাকে বলা হবে—একটা বিয়ের সঙ্গে কত কি কথা এসে যায়।

কথা সেরে হেমনলিনী যখন ফিরে এল, তার দু'চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছিল।

রূপারও ঘুম পেয়েছিল।

তবু, যেন সে কিছুই জানে না, মার চোখের দিকে চেয়ে হাসল।

'কেন ডেকেছিল মা ?'

'একটা জরুরী পরামর্শ ছিল।'

আমার বিয়ের ব্যাপার ? রূপা না বলে পারল না।

'এখন আমি কিছুই বলব না।' যেন আহ্লাদে হেমের ঘুম পাওয়া চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে গেল।

'তোমার খুব ঘুম পেয়েছে ?'

'হুঁ।' হেম লাফিয়ে খাটে উঠে গেল। 'তা ছাড়া সারাদিনের ধকল, বেজায় ক্লান্তি লাগছে।

'তবে কাল বোলো। এখন তুমি ঘুমোও।'

রূপা খুশি। কেননা যে কথা হয়ে আছে তা তো নড়চড় হবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই রূপা ভাবল, না কি মা সরাসরি তাকে কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে ? মোহনলালের বয়সটা অনেক বেশী বলে ? অথচ এদিকে রাজার মতন ধন দৌলত মানুষটির।

তবে হয়তো হেমনলিনী দোটানায় পড়েছে, এখনো পাকা কথা দিয়ে আসতে পারে নি।

চিন্তা করে রূপা নিজের মনে একটু হাসল। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে খাটে চলে এল।

'তা তোমার দোমনার তো কিছু যায় আসে না, মা। আমার বিয়ে— কাজেই এখানে আমার মনই সব। তুমিই রাতদিন আমাকে টাকা পয়সার কথা শোনাতে, বড়লোকের কথা বলতে। মোহনকে দেখে আমার সেই নেশা ধরে গেছে। এখন তো আমাকে রুখলে চলবে না।'

কাজলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রূপা মোহনলালের আশ্রমের অনেক কিছু দেখল। একটা ঘরে মেয়েরা তাঁত চালাচ্ছে, একটা ঘরে সুঁচের কাজ হচ্ছে, আর এক জায়গায় পুতুল তৈরি হচ্ছে। সব ক'টি মেয়ের সঙ্গে রূপা কথা বলল।

কেউ লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি। সবাই গরীবের ঘরের সন্তান। কেউ এই গ্রামের মেয়ে, কেউ পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। অনেক দূরের গ্রাম থেকেও ক'টি মেয়ে আশ্রমে এসে হাতের কাজ শিখছে।

রূপাকে সবাই দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখছিল। বি.-এ. পাশ, স্কুলে মাস্টারী করে, কলকাতায় থাকে, কোনোদিন এমন একটি মেয়েকে তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখবে, তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ পরিচয় করতে দেখবে, তারা যেন ভাবতেও পারছিল না।

হেমনলিনী কিন্তু একবারও এসব দেখতে এল না। কোথায় তাঁতের কাজ হচ্ছে, কোথায় পুতুল তৈরি হচ্ছে, কারা সূঁচ সুতো নিয়ে নানারকম সেলাই ফোঁড় করছে, এতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

বরং মোহনলালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে দেখছিল তার গোয়ালে কটা দুধেল গাই আছে, ক'টা ছাগল আছে, মোহনের হাঁস মুরগির সংখ্যাই বা কত।

এসব দেখার পর হেম মোহনের ধানের গোলা দেখল, পাটের গুদাম দেখল, এবার কেমন আলু উঠেছিল মোহনের কাছে তাও জেনে নিল।

তারপর তার পুকুর দেখল, বাগান দেখল, বাগানে ক'টা আম গাছ ক'টা নারকেল গাছ ক'টা লিচু গাছ গুণে গুণে সব কিছুর হিসাব নিল।

মোহনলালের বোটটা দেখে হেম খুব খুশি হল। রৌদ্রের মধ্যে পায়ে হেঁটে গঙ্গার ধারে গিয়ে সেটা সে দেখে এল। অবশ্য হেঁটে মোহনের অতটা পথ যাওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। মোহন আঙুল দিয়ে দিয়ে হেমকে দেখিয়ে দিল এই পরিমাণ জমিতে তার ধান হয়, এই পরিমাণ জমিতে পাট হয়, অতটা জমিতে শুধু লঙ্কা হয়, অতটা জমিতে ফি বছর আলুর চাষ হয়।

সব ঘুরে দেখে এসে হেম মেয়ের কাছে গল্প করছিল। শুনে রূপাও অখুশি হল না।

কানে শোনা আছে মানুষটা বড়লোক, কিন্তু কি দিয়ে সে বড়লোক চোখে তো দেখা হয়নি। তাই হেম ঘুরে ফিরে মোহনের জমি-জমা, ধানের গোলা ছাগল গরু হাঁস মুরগির হিসাব নিচ্ছিল। রূপা আর একবার মনে মনে হাসল। হিসাব নেবার আগে মা বুঝি কিছুতেই মোহনকে পাকা কথা দেবে না।

দুপুরে হেমনলিনীকে নিয়ে ঘোরাঘুরি হয়েছে, কাজেই রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়ার দিকে মোহন তেমন নজর রাখতে পারেনি।

সুতরাং বিকেলে মাংসের ব্যবস্থা করল। দু-দুটো মুর্গি কাটা হল। রোস্ট হবে।

বামুনকে দিয়ে কি আর এই জিনিস হয়। হাসতে হাসতে হেমনলিনী রান্না ঘরে ঢুকল। রূপার বাবা বেঁচে থাকতে রোজ তাঁকে মুরগি রেঁধে খাওয়াতে হয়েছে। সেদিনও চাকরকে দিয়ে মনের মত জিনিসটি হত না। হেমনলিনী নিজের হাতে করত।

শুনে মোহন বেজায় খুশি।

চাকর মুরগি ছাড়িয়ে দিল, বাটনা বেটে দিল, আদা পেঁয়াজ কুঁচিয়ে দিল। আজ আর উনুনের ধারে বসে থাকা না, শুধু কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা না, হাতা খুন্তি নিয়ে হেম মাংস রাঁধতে বসে গেল। আজ তার ঠোঁটে গালে আর একটু বেশি রং, খোঁপাটা আর একটু উঁচু করে বাঁধা এবং দুটো স্যুটকেস ঘেঁটে রূপার সবচেয়ে জমকালো শাড়িটা গায়ে জড়িয়েছে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নতুন রাঁধুনিকে ভাল করে দেখার পর রূপার চোখে চোখ রেখে মোহন মুচকি হাসল। রূপা এই হাসির অর্থ বুঝতে পারল।

'এসো, গয়লাকে আমরা দৈ-এর কথা বলে আসি, মাংসের পর আজ আর দুধ না, দৈ খাওয়া হবে।'

যেন রূপা তৈরি ছিল, পা বাড়িয়ে রেখেছিল। মোহনের কথা শুনে শব্দ না করে হাসল।

হেম মাংস রাঁধতে ভীষণ ব্যস্ত। এদিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই। রূপাকে নিয়ে মোহন দৈ আনতে গেল কি বেড়াতে গেল ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখলও না।

কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে দু'জন কালকের মতন দীঘির বাঁধান ঘাটে এসে বসল।

বলতে কি, সারাদিন রূপা এই সময়টির প্রতীক্ষায় ছিল। হেম সেই সকাল থেকে এমন জোঁকের মতন লেগে ছিল, মোহন একবারও রূপার কাছে আসতে পারেনি, মন খুলে দুটো কথা বলতে পারেনি।

'মাকে কথাটা বললে?' মোহনের হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে রূপা প্রশ্ন করল।

'বলেছি বৈকি।' রূপার চুলে হাত বুলিয়ে দিল মোহন।

'কী বলল মা?'

'এখনো কিছু বলছে না।' মোহন হাসল। কিন্তু রূপা হাসল না। বরং তার গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল।

'তার মানে পাত্রের মুরদ কতটা এখনো মহিলা যাচাই করে দেখছে, তাই না? কি জানি মেয়ে যদি বিয়ের পরে রাণীর হালে থাকতে না পারে এই দুশ্চিন্তা?'

মোহন হঠাৎ চুপ করে রইল।

'কি হল, কথা বলছ না কেন?' মোহনের ডান হাতটা বুকের কাছে টেনে নিল রূপা।

আমি তো কথা বলেই রেখেছি।' রূপার চোখের ভিতর তাকিয়ে থাকল মোহন।

'আজ রাত্রেও আমি অপেক্ষা করব, যদি মা তোমাকে পাকা কথা না দেয়। আমি কাল সকালে মাকে বলব, আমার বর ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'সেই ভাল, তোমারটা তুমি দেখবে—তোমার মা এখানে কিছু না।'

মোহনের আশ্বাস পেয়ে রূপা চোখ বুজল। একটু দেরি করে চাঁদ উঠল। দীঘির কালো জল এক সময় ঝলমল করে উঠল।

খেয়ে উঠে বিছানায় বসে হেমনলিনী আজ আর আলস্যে গা এলিয়ে দিল না। বরং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে খোঁপা বাঁধল। ঠোঁটে গালে আর এক পোছ রং লাগাল। তারপর রূপার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি একটু ও ঘরে যাই, জরুরী কথাটা শেষ করে আসি।'

রূপা চুলের ফিতে খুলছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

'আজকের মধ্যে, কথাটা পাকাপাকি করে এসো।'

'হ্যাঁ, রে হ্যাঁ।' হেমনলিনী গাল ছড়িয়ে হাসল। 'তুই আমার পেটে হয়েছিস না কি আমি তোর পেটে হয়েছি, তোর বিয়ে নিয়ে আমার গরজ যে অনেক বেশি রে ছুঁড়ি।'

হেম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

না জানি কত রাত পর্যন্ত একলা এঘরে চুপ করে রূপা বসে থাকত। কালকের মতন আজও সে অনেকক্ষণ দু'জনে কথা বলবে। কথায় বলে বিয়ে, লাখ কথা মাটিতে না পড়লে প্রজাপতি স্থির হয়ে বসতে চায় না। কাজেই রূপা ছটফট করত সময় আর কাটতে চাইত না, পা টিপে টিপে সেই কাজল নামের মেয়েটি ঘরে ঢুকতে সে খুব খুশি হল।

'এসো ভাই।' আদর করে রূপা ডাকল।

কাজল জলের গ্লাস দুটো টেবিলে নামিয়ে রেখে ঢাকা দিয়ে রাখল।

'আজ যে সেই মেয়েটিকে দেখছি না, কাল ফুল নিয়ে এসেছিল?' রূপা সুন্দর করে হাসল।

'মালা।' কাজল কাছে সরে এসে বলল, 'হঠাৎ ওর শরীর খারাপ করছে। সন্ধ্যেবেলা ফুল তোলা আর বেচারাকে দিয়ে হল না।

'থাক গে, রোজ কিছু বিছানায় ফুল রাখতে হবে এমন কি কথা, তুমি বসো।'

কাজল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার কি ওদিকে আরো কাজ বাকি আছে?'

'কাজ আমাদের দিনের বেলায়ই করতে হয়।' স্থঁচের কাজ করে কাজল। 'রাত্রে নিজের রান্নাবান্না ঘর গুছান ছাড়া আর কিছু কাজ থাকে না।'

'তবে আর কি, বসো দু'জনে একটু গল্প করা যাবে।'

'গিন্নীঠাকরুণ কোথায় ?'

মার কথা বলছে কাজল।

'পাশের ঘরে বাবুর সঙ্গে কথা বলছে।' রূপা আস্তে বলল।

'তবে একটু বাইরে আসুন। হাওয়াটা বড় মিষ্টি।'

রূপা খুশি হল। ওঘর থেকে মার বেরিয়ে আসতে এখনো অনেক দেরি।

'তাই ভাল, বাইরে আমরা হাওয়ায় বসে গল্প করব।'

কাজলের সঙ্গে রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাথার ওপর ঝকঝক করছিল অগুনতি তারা। গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। তবু দিনের বেলা এদিক ওদিক মেয়েদের কথাবার্তা শোনা যায়। তাঁতের ঠকঠক শব্দ হয়। হাঁস মুরগি ডাকে, গরু ছাগল শব্দ করে। কিন্তু রাত হলে আশ্রমটা বড় বেশি ঝিমিয়ে পড়ে। কেবল চাপা নিঃশ্বাসের মতন গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে এক একটা দমকা বাতাস বয়ে যায়। অন্যরকম চেহারা ধরে বাড়িটা তখন।

এদিকটা একেবারে নীরব। ওদিকে টিম টিম করে কটা ঘরের আলো জ্বলছিল। তাও যেন সব ঘরে জ্বলছিল না। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর রেঁধেবেড়ে খেয়ে মেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

উঠোনের একপাশে একটা আমগাছের নিচে রূপা ও কাজল এসে দাঁড়াল।

'মালার হঠাৎ অসুখ করল। কাজল আবার বলল।

'অসুখটা কী ?'

'এই এমনি।' কাজল খুব পরিষ্কার করে কথাটা বলল না।

কিন্তু রূপায় মাথায় যে অন্য চিন্তা। কাজেই জিনিসটা সে খুব বেশি মাথায় নিল না।

'তুমি কতদিন এখানে এসেছ ?' আবছা অন্ধকারে কাজলের মুখটা দেখল সে 'দিন দশেক হবে।'

রূপা অবাক হল।

'তবে তো তুমি এখানে খুবই নতুন।'

কাজল চুপ করে রইল।

'কিন্তু নতুন এসেছ, তুমি এখানকার সব জানলে কি করে, তখন ঘুরে ঘুরে

আমাকে আশ্রমের কোথায় কি কাজ হচ্ছে সব দেখালে, আর কটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে?'

'ঐ তো কদিন মালার সঙ্গে থেকে থেকে সব কিছু দেখেছি, সকলের সঙ্গে ও আমায় পরিচয় করিয়ে দিলে।'

'মালা বুঝি এখানে অনেকদিন?'

'না না, কাজল মাথা নাড়ল। 'এই তো মাস ছয় এসেছে ও।'

রূপা চুপ করে রইল। মা কি এখন ওঘর থেকে বেরিয়েছে, ভাবছিল সে। আজ যদি মোহনের সঙ্গে পাকা কথা বলে না আসে তো মার সঙ্গে সে হয়তো রাত্রেই ঝগড়া করবে।

'মালাকে একবার দেখতে যাবেন?' কাজল বলল। রূপা একটু ইতস্তত করল।

'কোথায় ওর ঘর?'

'ঐ তো।' কাজল আঙুল দিয়ে ওদিকের একটা ঘরের টিমটিমে আলো দেখাল। 'আসুন, আপনাকে দেখে ও খুশি হবে।'

কাজলের সঙ্গে রূপা হাঁটতে লাগল।

'মালার সঙ্গে বুঝি তোমার খুব ভাব?'

'ঐ আর কি।' ক্ষীণ গলায় হাসল। 'এখানে এসে প্রথম যখন ওকে দেখলাম, কেমন যেন ভাল লেগে গেল।'

রূপা কথা না বলে হাঁটছিল।

'একজনের একজনকে হঠাৎ ভাল গেলে যায়, তাই না?' কাজল এদিকে ঘাড় ফেরাল।

রূপা ঘাড় কাত করল। কথাটা মিথ্যা কি! যেমন এখানে এসে এই মেয়েটিকে প্রথম রূপার ভাল লাগল।

মালা কাজল দুজনেই গরীব। হয়তো খুবই অসহায় অবস্থায় ছিল। তারপর ওরা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। ওদের দু'জনের মধ্যে চট করে ভাব হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি কে, আমি এখানে কেন এসেছি তুমি তো জাননা মেয়ে, কাজলকে উদ্দেশ্য করে রূপা মনে মনে বলল। মনে মনে হাসলও সে একটু। তা হলে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

সত্যি, রূপা চিন্তা করল, কাজল এবং কাজলের মতন এখানকার সব কটি মেয়েই ধরে নিয়েছে, মায়ের সঙ্গে রূপা আশ্রম দেখতে এসেছে, বেড়াতে এসেছে। কিন্তু শীগ্‌গীরই যখন তারা জানতে পারবে, চোখের ওপর সব দেখবে, সেদিন তারা যে কী ভীষণ অবাক হবে।

ভাবনাটার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ ছিল। গাছের পাতার ছায়া ও জ্যোৎস্না গায়ে মেখে কাজলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে রূপা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

মা যদি আজ পাকা কথা না বলে আসে, রূপা কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে তার ইচ্ছার কথা সঙ্কল্পের কথা পরিষ্কারভাবে মাকে জানিয়ে দেবে। এখানে হেমনলিনীর কোনো আপত্তিই টিকবে না।

মালার ঘরের কাছে এসে কাজল থামল। দরজাটা ভেজান। একটা ছোট জানালা দিয়ে আলো আসছে। বোঝা গেল মেয়েটা জেগে আছে। কাজলের পিছনে রূপা দাঁড়িয়ে রইল।

কাজল একটু ইতস্তত করল।

পাশের ঘরে আর একটি মেয়ে চৌকাঠ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। লম্বা ছিপছিপে শরীর। তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কেমন যেন একটা উদাস ভাব ফুটে উঠেছিল। যেন একমনে আকাশের তারা দেখছিল সে। কাজল এবং রূপাকে দেখে মেয়েটি চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল।

'এস কাজলদি।' মেয়েটি ডাকল। কাজল বারান্দায় ওঠার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রূপাকে ডাকল। 'আপনিও আসুন।'

কাজলের সঙ্গে রূপা বারান্দায় উঠে গেল। সরু বারান্দা সামনে রেখে এক সারি ঘর। বোঝা যায় প্রত্যেকটা ঘর একই রকম। একই সাইজ। একটি করে দরজা একটা করে জানালা। কোনো কোনো ঘরের জানালায় পর্দাও আছে।

'মামা কেমন আছে শান্তি?'

শান্তি অর্থাৎ ছিপছিপে রোগা মেয়েটি কাজলের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে রূপার মুখটা এক পলক দেখল তারপর আস্তে বলল, 'বমিটা কমেছে, তলপেটে একটু যন্ত্রণা হচ্ছে বলল।'

'ও কি ঘুমোচ্ছে?'

'মনে হয়।' এ পাশের বন্ধ দরজাটার ওপর চোখ রেখে শান্তি চুপ করে রইল।

'তবে আর ভেতরে যাব না।' কাজল বলল, 'ঘুমোক ও।'

'আমার ঘরে একটু যাবেন না?' শান্তি ঠিক হাসল না, হাসির মতন মুখটা করে এক সঙ্গে কাজল ও রূপাকে দেখল।

'এখন না ভাই, পরে আসব।' এবার রূপার হাত ধরল কাজল। রূপাকে নিয়ে সে বারান্দা থেকে নেমে এল। দুজন কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

'এই মেয়েটি কবে এসেছে?'

'শান্তি ? এক বছর হয়ে গেল।' একটু চুপ করে থেকে কাজল আবার বলল, 'ও তো পুতুল ডিপার্টমেন্টে কাজ করে।'

'হুঁ, এখন আবার মনে পড়েছে।' দুপুরে কাজলের সঙ্গে বেরিয়ে রূপা মেয়েটিকে পুতুল তৈরি করতে দেখেছিল। 'বেশ মিষ্টি চেহারা।' রূপা আস্তে বলল।

'এখানকার প্রায় সবকটি মেয়ে মোটামুটি দেখতে ভাল।'

'তাই তো দেখছি।' রূপা আগে হাসল। 'তুমি, তোমার সখী মালা,—তোমাদের মুখও খুব মিষ্টি, নাক চোখ ভুরু সবই সুন্দর।

নিজের রূপের প্রশংসা শুনে কাজল যেন একটু লজ্জা পেল। পরে হেসে বলল, 'যাই বলুন, আপনার রূপের কাছে আমরা কেউ না, যেমন গায়ের রং নাক চোখ, তেমনি শরীরের গড়ন। আপনার মা-ও খুব সুন্দরী।'

'হুঁ,' রূপা আস্তে বলল, 'এই বয়সেও এত রূপ বড় একটা দেখা যায় না।'

'এখানে একটু বসবেন ?' একটা চাঁপা গাছের নিচে কাজল দাঁড়াল। তলাটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান। যেন আশ্রমের মেয়েদের বসবার জন্য মোহনলাল এটা তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু রূপা তখন ভাবছে, মা এখন মোহনের ঘর থেকে বেরিয়েছে কি। লাখ কথা হলেও এতক্ষণ তা শেষ হওয়া উচিত।

কাজলের পাশে রূপা বাঁধান বেদীর ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। চাঁপা ফুলের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল।

দু'জন চুপ করে থেকে গাছের পাতার শব্দ শুনল। একটু পরে কাজল বলল,—'আপনাকে একটা কথা বলব, এই জন্যেই এখানে ডেকে এনেছি।'

'বলো।' রূপা কাজলের দিকে চোখ ফেরাল।

কিন্তু তখনই কাজল কথাটা বলল না। ঘাড় গুঁজে আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল।

'দরকারী কথা কি ?' রূপা অধৈর্য হচ্ছিল মার কথা ভেবে।

চোখ তুলে কাজল বলল, 'মালার জন্য মনটা খারাপ লাগছে।'

'অসুখটা কি, বমি করছে ?' রূপা একটা ঢোক গিলল। কাজল এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, ওর বাচ্চা পেটে এসেছে ; ও অন্তঃসত্ত্বা !

'মালা !' ভীষণ চমকে উঠল রূপা। 'ওর তো বিয়ে হয়নি, কুমারী তাই না ?'

'হুঁ, এখানে এসে এই অবস্থা হয়েছে।'

রূপা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

'আপনি শুনলে অবাক হবেন', কাজল আবার বলল, 'এখানে এসে আরো

ক'টি মেয়ের এই অবস্থা হয়েছিল, দু' একজন নার্সিং হোম থেকে ঘুরে এসেছে। ওই যে শান্তিকে দেখলেন, তাকেও নার্সিং হোমে যেতে হয়েছিল।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' রূপা কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল। 'ভীষণ নোংরা ব্যাপার! জানতাম এটা আশ্রমের মতন—অসহায় গরীব মেয়েরা আশ্রয় পেয়ে হাতের কাজ টাজ শিখছে—'

'অসহায় গরীব বলেই তো মোহনলাল তার সুযোগ নিচ্ছে, একটি একটি করে সবকটি মেয়ের সর্বনাশ করছে।'

'মোহনলাল!' আর্তনাদের মতন একটা শব্দ বেরোল রূপার গলা দিয়ে? অন্ধকার না থাকলে দেখা যেত কাগজের মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখটা।

'অথচ মজা এই যে,' কাজল কেমন করে জানি হাসল, 'এখানে আসবার আগে একটি মেয়েও বুঝতে পারেনি তাদের অদৃষ্টে এই ছিল। কেননা যখনই একটি মেয়ের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে, মোহনলাল বলেছে—'মুখখানা ভারি মিষ্টি, চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর—আমি তোমাকেই বিয়ে করব—'

'থাক, আমি আর শুনতে চাই না। পা দুটো কাঁপছিল রূপার। উঠে দাঁড়াল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। 'তুমি? তোমারও বুঝি এই অবস্থা?' গলার স্বরটা বিকৃত হয়ে গেল রূপার।

আর হাসল না কাজল, ভীরু ফিসফিস গলায় বলল, 'এখনো হয়নি, কিন্তু ভয় হচ্ছে হবে, আজ না হোক কাল আমারও এই দশা হবে, আমি লোভে পড়ে চলে এসেছিলাম, রাজার মতন তার ধন দৌলত, আমায় বলেছিল হরিণীর মতন কেমন ডাগর চোখ দুটো তোমার, এমন চোখই আমি চেয়েছি। সারা জীবন এই চোখের মেয়েই খুঁজেছি—'

রূপা আর দাঁড়াল না। ছুটতে লাগল।

তার মনে হচ্ছিল, দূরে কাছে ডাইনে বাঁয়ে, যেখানেই একটা গাছ আছে একটু ঝোপেঝাড়ের মতন আছে, কেমন যেন ভূতের মতন কী সব দাঁড়িয়ে আছে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'এমন করছিস কেন?'

'না, না, কাল সকালের ট্রেনেই চল, এখন হয়তো গাড়ি পাওয়া যাবে না।'

'কী মুস্কিল, এমন ছেলেমানুষী করছিস কেন!' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ফিতা বাঁধছিল হেমনলিনী। ছাই হওয়া মেয়ের মুখটা দেখল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে রূপার, চোখের তারা গোল হয়ে গেছে। যেন কোথা থেকে ভয়

পেয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেছে মেয়ে। হেম বিরক্ত হল অবাকও কম হল না। 'আমায় বলবি তো কি হয়েছে।'

'পরে বলব, এখন না, সুটকেস দুটো এখনি গুছিয়ে ফেল, অন্ধকার থাকতে আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

'কী আব্দার' খামখেয়ালী কথা যত, এত তোড়জোড় করে আসা হল, আজই কিনা চল।' আয়নার দিকে ঘুরে দাঁড়াল হেমনলিনী। 'তোর ইচ্ছে হয় তুই চলে যা, আমি এখানে থাকব।'

'কোথায় থাকবে, কার কাছে থাকবে?'

'শোন্,' হেম আবার এদিকে ঘুরল। 'আমি ওকে পাকা কথা দিয়ে এসেছি।'

'না না না।' রূপা জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'কিসের পাকা কথা দিয়ে এসেছ, কার জন্যে?'

'আমার জন্য রে রূপা, আমার জন্য।' হেম দাঁত ছড়িয়ে হাসল। 'আমাদের দু'জনের মধ্যে আমাকেই ওর ভাল লেগেছে বেশি। এই মাত্র সব কথা পাকা-পাকি করে ওঘর থেকে এলাম।'

দুঃখে ঘেন্নায় অপমানে রূপার চোখে জল এসে গেল। খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, ধপ করে বসে পড়ল।

'ওফ্, এত জঘন্য তুমি মা, একটা লম্পটকে একটা শয়তানকে তোমার ভাল লাগল!'

'এই বয়সে এর চেয়ে ভাল পাব কোথায়!' মুখ ঘুরিয়ে হেম খোলা চুলে চিরুণি চালাতে লাগল। 'ওর অনেক টাকা পয়সা, কাজেই ওর সম্পর্কে অন্য কোনো কথা আমি শুনব না।'

রূপার মনে হচ্ছিল, এখন আর বাইরে অন্ধকার ঝোপে ঝাড়ে নয় ঘরের মধ্যে ভূত দেখছে, একটা পেত্নী তার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।